নীললোহিত সমগ্র

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
শ্রাবণ ১৩৬৭
আগস্ট ১৯৬০

প্রকাশক
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশন
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক :
জয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ
১৯, গুলু ওস্তাগর লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

পঁচিশ টাকা

১

*****

'আমি আপনার চোখ চাই না। কিন্তু, আপনার সঙ্গে একবার চোখাচোখি দেখা করার সুযোগ পেতে পারি কি?' এই চিঠিটা লিখেছিলাম একটি বিজ্ঞাপনের উত্তরে। ইংরেজী দৈনিকে একজন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর একটি চোখ দান করতে চান। যার দরকার সে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পাবে। বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল বক্স নাম্বারে, উত্তর পেলাম একজন বাঙালীর কাছ থেকে। শনিবার সন্ধ্যাবেলা আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

দক্ষিণ কলকাতার নব্য-ধনী এলাকার একটি চারতলা বাড়িব একেবারে চারতলার ঘবে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন। দীর্ঘ সুঠাম চেহারা, বয়স পঞ্চাশের বেশী নয়, দেখলেই লোকটিকে বেশ রাশভারি মনে হয়। ঘরে একটি শ্বেতপাথরের টেবিল, একটি চেয়ার ও খাট ছাড়া কোনো আসবাব নেই। সব কিছুই সাদা। সাদা বিছানার চাদব, সাদা জানলার পর্দা, ধপধপে সাদা দেয়ালে একটি ছবি বা ক্যালেণ্ডারও নেই। অত সাদা রং চোখকে পীড়া দেয়। ঘরটা দেখেই আমার অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়লো, কবি ইয়েটস্ নাকি সব সময় কালো রং ব্যবহার করতেন, কালো পোশাক, কালো পর্দা—এমনকি চা খেতেন কালো কাপ-ডিসে, পাশে একটি কালো বিড়াল নিয়ে।

এই লোকটির সঙ্গে আমি কেন দেখা করতে এসেছি জানি না। ঝোঁকের মাথায় চিঠি লিখেছিলাম। এখন, লোকটিকে এক-ঝলক দেখেই মনে হলো— আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন চলে গেলেই হয়। কিন্তু কি করে চলে যাবো, হঠাৎ? আমি চুপ করে বসে রইলুম নাম ও পরিচয় বিনিময়ের পর। চাকর এসে চা দিয়ে গেল, তবু অস্বস্তিকর নীরবতা। বিষম অনুতাপ হতে লাগলো আমার, কেন হঠকারিতায় এসেছি এখানে। মানুষের মুখ থেকে আমার

কিছুই জানার নেই। এই লোকটি কেন তার চোখ দান করে যেতে চান—তা জেনে আমার কি দরকার? আমি চোখ নিচু করে টেবিলে আঙুল দিয়ে অদৃশ্য ছবি আঁকতে আঁকতে প্রতীক্ষা করতে লাগলুম, লোকটিই আমাকে প্রশ্ন করবেন। একবার মুখ তুলে দেখি, ভদ্রলোক আমার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই আমার মাথায় একটি প্রশ্ন খেলা করে গেল। কোন্ চোখটা? ডানদিকের না বাঁদিকের কোন্ চোখটা তিনি দান করতে চান? বেশ টানা-টানা সুন্দর চোখ ভদ্রলোকের। যুগ্ম ভ্রূ।

—আপনি কি বেঁচে থাকতেই চোখটা দিয়ে যেতে চান?

—হ্যাঁ।

—এত অল্প বয়সে? আপনার তো মৃত্যুর সময় হয় নি। এর মধ্যেই একটা চোখ হারাতে আপনার কষ্ট হবে না?

—আমার লাং ক্যান্সার আছে। আমি দু'এক বছরের বেশী বাঁচবো না, জানি।

—আপনার পরিবারের কেউ আপত্তি করছেন না?

—আমার পরিবারে কেউ নেই।

খুব কাটাকাটা উত্তর ভদ্রলোকের। সব সময় একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কথা বলছেন। যারা চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে—সেই সব লোক সাধারণত সত্যবাদী হয়, সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী। লোকটি তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ক্রমশ আমার উপর প্রভাব বিস্তার করছিলেন। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি ওঁর আত্মবিশ্বাসে আঘাত করতে চাইলুম। জিজ্ঞেস করলুম, মানুষের উপকার করার হঠাৎ এরকম ইচ্ছে হলো কেন আপনার?

—মানুষের উপকার?

—এই চোখ দিয়ে যাওয়া? সব লোকই তো দুটি চোখ সমেত মারা যায়।

—আমার একটি ছেলে জন্মেছিল। জন্মান্ধ। সে মারা যাবার পর এই কথাটা আমার মাথায় আসে।

—দুটো চোখই তা হলে দিয়ে যাচ্ছেন না কেন?

—একটা রেখে দিচ্ছি, বাকি যে কটা দিন বাঁচবো—সে কটা দিন কাজ চালাবার জন্য। তা ছাড়া, মৃত্যুর পর কি আছে জানি না। যদি তখন কাজে লাগে, মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরকে যদি কিছু দেখার দরকার হয়, তাই একটা রেখে দেওয়া ভালো।

কোন্‌টা ?

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। তারপর এই প্রথম মুখটা ফেরালেন। আমি খেলাচ্ছলে ওঁর মুখের সামনে হাতটা নিয়ে গিয়ে বললুম, কোন্ চোখটাকে আপনি বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে চান ?

তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম একটু নিষ্ঠুরের মতো, ডান দিককরটা না বাঁ দিকেরটা, কোন চোখটাকে আপনি বেশী ভালোবাসেন ?

ভদ্রলোক বললেন, আপনি অলৌকিকে বিশ্বাস করেন ?

অবাক হয়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, অলৌকিক ?

—হ্যাঁ, আপনার তো বয়েস অল্প। কিন্তু তবু, কোনোরকম অলৌকিকে বিশ্বাস করেন ?

—অলৌকিক বলতে ঠিক কি বলতে চাইছেন ? যদি ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার হয়, এখনও নির্ভয়ে বলতে পারি, না, করি না। কিন্তু, রাত্রের দিকে খানিকটা ভূতটুতে বিশ্বাস করি এখনো।

এই প্রথম ভদ্রলোক মৃদুভাবে হাসলেন। বললেন, না, তা নয়। মাসখানেক আগে ঠিক করেছিলুম, বাঁ চোখটা দান করবো। মনস্থির করে ফেললুম। তারপরের কয়েকটা দিন হঠাৎ বাঁ চোখটায় ব্যথা করতে লাগলো। জল ঝরতে লাগলো অনবরত। তখন ভাবলুম, এ চোখটা বোধ হয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, অসুখ হয়েছে কোনো। ডাক্তার দেখাবার আগেই ঠিক করলুম, ঐ খুঁতধরা চোখটা তা হলে আর দেবো না, ডান চোখটাই দেবো। আমার বাকি কটা দিন ঐ খারাপ চোখটাতেই চলে যাবে। তারপর···ভদ্রলোক আমার দিকে আবার তীব্র চোখে তাকালেন। বুঝতে পারলুম, তিনি সত্যি কথা বলেছেন।

তারপর, আমার বাঁ চোখটা হঠাৎ সেরে গেলে। কিন্তু, এবার ডান চোখটা ব্যথা করে জল ঝরতে লাগলো। মনে হলো, ঐ চোখটা একা একা কাঁদছে সব সময়। রাত্তিরে শুয়ে মনে হত, ঐ চোখটা অনবরত কেঁদে কেঁদে আমাকে কিছু বলতে চাইছে। যেন মিনতি করছে করুণভাবে। —আমাকে নয়, আমাকে নয়, আমি কি দোষ করেছি যে আমাকে আপনি বিদায় করে দেবেন! শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কি আলাদাভাবে প্রাণ আছে? ওদের আলাদা ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে ? নইলে, যখনই যে চোখটাকে দান করবো ভাবি, তখনই সেটা থেকে জল পড়ে কেন ? একে আপনি অলৌকিক বলবেন না ? যাই হোক,

তখন ঠিক করলুম, আগে থেকে আর ভাববো না। অপারেশনের ঠিক আগের মুহূর্তে বেছে নেবো। এখন দুটো চোখই ভালো আছে।

—আপনার চোখদুটি ভারী সুন্দর।

—আমার দৃষ্টিশক্তিও খুব উজ্জ্বল। জানলা দিয়ে দেখুন, লেকের দক্ষিণ পাড়ের ঐ দোকানটার সাইনবোর্ড এখান থেকে পড়তে পারেন? আমি এই বয়েসেও পারি। ঐ যে দেখুন না, কমলা স্টোর্স—নিচে ছোট হরফে লেখা সর্বপ্রকার স্টেশনারী···

আমি মনে মনে একটু হাসলুম, বুঝতে পারলুম, লোকটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। খসে যাচ্ছে গাম্ভীর্য। নইলে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে এমন ছেলেমানুষী গর্ব করতেন না। সরকারী বন বিভাগের এই প্রাক্তন কর্মচারীটি, অরবিন্দ রায়চৌধুরী, একা বসে পেসেন্স খেলা যার একমাত্র ব্যসন, পনেরো বছর আগে স্ত্রী বিয়োগ হবার পর যিনি আর দারপরিগ্রহ করেন নি—এতক্ষণ তাকে একটা কঠিন, অবাস্তব মানুষ বলে মনে হচ্ছিল—এবার আমি তাঁর শরীরে শিরা ও স্নায়ু দেখতে পেলাম। এমন কি পেটের মধ্যে ক্যানসারের ঘা পর্যন্ত। চোখ দান করা নিয়ে কোনো অহংকার করছেন না, কিন্তু এত নিরাসক্ত হবার মত অহংকার তিনি কোথায় পেলেন? বললুম, আপনি অপারেশন করে চোখ তুলে, দেবার এক মাস পরেই যদি ক্যানসারের ওষুধ বেরিয়ে যায়? তা হলে আপনি বাকি জীবন এক চোখে বাঁচবেন?

—আপনি বেশী আশাবাদী।

—যে-কোনো মুহূর্তেই তো বেরুতে পারে।

—তা হোক। একটা চোখই আমার যথেষ্ট।

—আপনি যাকে চোখ দেবেন, তাকে নিজে দেখে যেতে চান?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। না হলে তো আমি 'আই ব্যাঙ্কে' দান করতে পারতুম। আমি একটি বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে যেতে চাই।

—কেন?

—এমন একজন স্বাস্থ্যবান শিশুকে দিতে চাই—যে বহুদিন বাঁচবে। কারণ—

ভদ্রলোক একটু লাজুকভাবে হাসলেন। আমি এমনভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম—যার একমাত্র মানে হয়, বলুন না!

—এ জীবনটা কেটে গেল, কিন্তু কি দেখলাম? রাস্তায় বেরুলে এখন কি দেখি? জানেন, যখন জঙ্গলে থাকতুম, আমি গুলি খেয়ে হরিণকে ছটফট করে

মরতে দেখেছি, নেকড়ে বাঘের মুখে খরগোশের বাচ্চাকে মরতে দেখেছি—কিন্তু তার কিছুর সঙ্গেই তুলনা হয় না—এখন পথে বেরুলেই যে লক্ষ লক্ষ না-মরা, অর্ধ-জীবন্ত মানুষ দেখি। কি রকম নিরাশ কালিমাময় মুখ! উঃ! মানুষের মুখ একরকম হয়? আগে মফস্বলে থাকতুম, পালিয়ে এসে শহরের চারতলায় আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু এ শহরেই বা কি দৃশ্য! এত অসংখ্য মানুষ, এদের মুখ দেখলে শিউরে উঠতে হয়। কোনো আশা নেই, উৎসাহ নেই, দাবিও নেই। কোনো রকমে বেঁচে আছে। এর নাম জীবন? আমি মরে যাচ্ছি, কিন্তু আমার চোখটা এমন একজনকে দিয়ে যাবো—যে অনেক দিন বাঁচবে, ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবী দেখে যাবে।

ভদ্রলোক যে শেষ পর্যন্ত অতি সাধারণ মানুষের মতই কথা বললেন—তাতে নিশ্চিন্ত হলাম। একটা তা হলে স্পর্শসহ যুক্তি আছে। সেইটাই আমার জানার দরকার ছিল—কেন একটা লোক হঠাৎ চোখ দিতে চায়। নেহাত মানুষের উপকার করবার জন্যই নয় তাহলে! নিজের একটা শখ মেটাবার জন্য মৃত্যুর আগে সকলেই ভবিষ্যতের কথা ভাবে—ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবীর কথা। একশো বা দু'শো বছর আগে যারা মারা গেছে—তারাও ভেবেছিল। ভেবেছিল যে তাদের মৃত্যুর দু'দশ বছর পরই পৃথিবী সুন্দর হয়ে যাবে। শুধু তারাই দেখে যেতে পারলো না। আমার ঠাকুরদা একথা ভেবেছিলেন, আমার বাবাও হয়তো ভেবেছেন মরার আগে। সকলেই ভেবেছেন, ইস্, একটুর জন্য ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবীটা দেখে যেতে পারলুম না!—এরকমই চলবে!

আমি এখনও বাঁচবো বেশ কিছুদিন, এরকম আশা আছে, তাই ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবী-টৃথিবীর কথা আমার একবার ভুলেও মনে পড়ে না।

ওঠার আগে আমি আর একবার ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকালাম। হঠাৎ মনে হলো, ওঁর চোখ দুটির আলাদাভাবে- স্বাধীনভাবে অন্যকিছু বলার আছে হয়তো। হয়তো, আমার চোখদুটি ওদের স্বজাতির ভাষা বুঝেছে। কিন্তু আমি পারি নি।

২

✵✵✵✵✵

আমি রাস্তার এ পারে, রাস্তার ওপাশে একজন অল্পচেনা লোককে দেখতে পেলাম। যথোপযুক্ত ভঙ্গিতে অল্প হেসে জিজ্ঞেস করি, ভালো আছেন? তারপর আবার চলতে শুরু করেছিলাম, লোকটি ওপার থেকে কী যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। ঠিক লক্ষ করিনি, ভদ্রলোক আবার বেশ চেঁচিয়ে বললেন, না, ভালো নেই।

দাঁড়াতেই হলো। লোকটি রাস্তা পেরিয়ে কাছে এসে হাসি হাসি মুখে বললেন, না, ভালো নেই! বুঝতে পারলেন, আমি ভালো নেই?

এবার আমি কী বলবো, বুঝতে না পেরে চুপ করে ছিলাম। তা ছাড়া যাঁরা ভালো থাকেন না, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভালো-না-থাকার কথা শত মুখে বলবেন জানি'। লোকটি কিন্তু একটু সামান্য হেসে বললেন, বিশেষ কিছু না, 'ভালো আছি' শুনলেই তো চলে যেতেন, তাই 'ভালো নেই' বললাম। তবু একটু দাঁড়াবেন।

এবার আমিই হাসলাম। কিন্তু মুশকিল এই, লোকটির নাম আমার মনে পড়ছে না, কোথায় আলাপ কিছুই মনে পড়ছে না, মুখখানা সামান্য চেনা চেনা। এরকম চেনা লোক পথে-ঘাটে অসংখ্য থাকে। পরিচয়ের গাঢ়তা অনুযায়ী সম্ভাষণ হয়। যেমন প্রাথমিক স্তরে ভ্রূনৃত্য। এই স্তরের লোকদের সাধারণত দূর থেকে দেখতে পেলে অন্যমনস্ক হবার ভঙ্গি করতে হয়, অত্যন্ত উদাসীনের মতো পথের পোস্টার পড়তে পড়তে দু'জনে দু'জনকে অতিক্রম করে যাই। দৈবাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে ভুরু দুটো একবার নাচানো।

এরপরের স্তরের সঙ্গে দেখা হলে ভ্রূ-দ্বয়ের ছুটি। সেখানে চোখ ও মুখে মোনালিসা ধরনের সুপ্ত হাসি এঁকে একবার তাকানো, বড়জোর অস্ফুটভাবে বলা, ভালো! —এর উত্তর শোনার জন্য থামতে হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর আসে না।

তৃতীয় স্তরের সম্ভাষণই সবচেয়ে বিপজ্জনক। সেখানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, কী খবর? —এই চলে যাচ্ছে আর কি! সত্যি, যা গরম পড়েছে! ও, তাই নাকি! আচ্ছা, চলি!—এসব লোকের সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই মনে পড়ে না, লোকটির সঙ্গে আগে 'তুমি' কিংবা 'আপনি' কোনটা বলতাম। তখন ভাববাচ্যের আশ্রয় নিতে হয়। —কী করা হয় আজকাল? কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কলকাতার বাইরে থাকা হয় বুঝি? কথা বলার সময়েই মনে মনে হিসেব করতে হয়, যথেষ্ট ভদ্রতাসূচক সময় ব্যয় করা হয়েছে কি না এর সঙ্গে!

এর পর যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে কোনো না কোনো সূত্রে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকার কথা, অথচ মনে নেই, মুখেও বিশেষ কিছু বলার নেই। আত্মীয় বা বন্ধুর বন্ধু বা প্রেমিকার অন্য প্রেমিক। এঁদের সঙ্গে দেখা হলে যথেষ্ট উল্লাসের ভঙ্গিতে বলতে হয়, আরে কী খবর! দেখাই নেই যে! চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি! —তারপর, অমুক কেমন আছে? ওখানে আর গিয়েছিলেন?—এই সব কথা বলার সময় এমন ভাব করতে হয় যেন ওঁকে দেখে আমি সমস্ত বিশ্বসংসার বিস্মৃত হয়েছি। তারপর সূক্ষ্মকোণী চোখে হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে বলে উঠি, আরেঃ তিনটে বেজে গেছে! ইস্ একটা বিশেষ কাজ আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম। চলি। আবার দেখা হবে। অ্যাঁ?—এরপর অত্যন্ত দ্রুতভাবে কিছু দূর গিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়তে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।

টাকা ধার করি নি, চুরি করি নি, ঝগড়া করি নি, কোনোরূপ অন্যায় করি নি, তবু অনেক লোককে দূর থেকে দেখেই রাস্তার ছায়ার ফুটপাথ ছেড়ে রোদ্দুরের ফুটপাথে চলে যেতে হয়। এই এড়িয়ে যাবার কারণ আর কিছুই না, অকারণে বাক্যব্যয় বা ভুরু নাচানোর অনিচ্ছা। এক-এক সময় হয়তো আমার মেজাজ খারাপ বা মন বিষণ্ণ, তবু হঠাৎ কারুকে দেখে জোর করে মুখে হাসি ফোটাতে গা রি-রি করে।

অবশ্য এর উল্টোটাও আছে। কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি বা উচ্চপদস্থ লোক আমাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে পথের শোভা নিরীক্ষণ করছেন বা সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়েও না-চেনার ভান করছেন, তখন আমাকে নিজেকেই এগিয়ে যেতে হয়, নমস্কার ঠুকে বিগলিত হাস্যে বলতে হয়, আমাকে চিনতে পারছেন? তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় অতি আন্তরিকভাবে, শব্দ নির্বাচন করতে হয় অতি সাবধানে, যাতে প্রতিটি বাক্যই হয় প্রচ্ছন্ন স্তুতি। আর,

অন্তরীক্ষ সঙ্গীতের মত সর্বক্ষণ তো বিগলিত হাস্য আছেই। পুরো দৃশ্যটির এক কথায় সারমর্ম এই : সময়কালে যেন আপনার কৃপার ছিটেফোঁটা পাই!

সবচেয়ে অস্বস্তিকর লাগে যদি পনেরো কুড়ি বছর পর হঠাৎ কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। হয়তো স্কুলে ক্লাস সিক্স-সেভেনে সে ছিল আমার প্রাণের সুহৃদ, সে আমাকে টিফিনের সময় অসুখের ভান করে ছুটি নেওয়া শিখিয়েছিল, সে আমার জন্য সিনেমায় ছ' আনার লাইনে জায়গা রাখতো। তার সঙ্গে বদলা-বদলি করে যতরাজ্যের রগরগে গোয়েন্দা গল্প, পরে অশ্লীল বই পড়তে শুরু করি, আমার ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেবার সময় সে টিপ্‌নি ধরতো। তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে, কেউ কারুর খবর রাখি না, পরস্পরের জীবন এখন কোথায় বেঁকে গেছে কেউ কিছু জানি না। গলার আওয়াজ বদলে গেছে, চেহারা বদলে গেছে। দেখা হলে কথা বলার কিছুই থাকে না। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে সেই হজের ও গেঞ্জি পরা খালিপায়ের বাল্যকাল, পরস্পরের সেই চেহারা আমরা দেখি নিঃশব্দে। যদিও আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি দুজন ভদ্র সভ্য, পুরো-প্রস্থ পোশাকপরা পুরুষ, কী কথা বলবো জানি না, দেখা হলেও তো আর বাল্যের কথা শুরু করা যায় না, সেই ঘুড়ির মাঞ্জা কিংবা শেষপাতা-ছেঁড়া গোয়েন্দা-গল্পের কথা। আমরা চুপ করে থাকি, দু-একটা মামুলি কথা বলে বিদায় নেই। অমন একদা-প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে গলা জড়িয়ে একটাও কথা বলা হলো না দেখে ভিতরটা হাহাকার করে।

অবশ্য বহুদিন পর দেখা সব ছেলেবেলার বন্ধুই এমন বাল্যে ফিরে যায় না। অনেকে ঘোরতর সংসারী হয়ে গেছে, ওসব কিছুই মনে নেই হয়তো, পান চিবুতে চিবুতে যাচ্ছেতাই সব প্রশ্ন করে। বিশেষ করে একটি প্রশ্নের জন্য আমি সব সময় শঙ্কিত থাকি। শুনলেই রাগ হয়, বিশেষত সে প্রশ্নের উত্তর জানি না বলেই। বহুদিন পর ক্ষণিকের জন্য দেখা, আবার বহুদিন দেখা হবে না, তবু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই আমাকে অত্যাচার না করলে যেন ওদের আশা মেটে না। যেমন, একথা সে-কথার পর ওরা জিজ্ঞেস করবেই, এখন কী করছিস?

উত্তরে আমি বলি, এখন? এখন একটু মানিকতলায় যাবো।

—না, না, কোথায় আছিস?

—দমদম।

এতেও ওরা একটুও দমিত হয় না। তাকায় না আমার নিষেধ-আঁকা চোখে। এর পরেও জিজ্ঞেস করে, কোথায় গেলে তোর সঙ্গে দেখা হবে? আমি বলি, একদিন দমদম আমার বাড়িতে আয় না।

কিন্তু এসব শুনে তৃপ্তি হয় না ওদের। ওদের যেন জীবন মরণ নির্ভর করে একটা বিশেষ কথা জানার ওপর। এরপর বলে, কী কাজ করছিস ?

তখনও এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমি উদাস ভঙ্গিতে বলি, জীবনের সত্যিকারের কাজ এখনও কিছুই শুরু করি নি ভাই! কিন্তু ঐ নিরেটের দল তখন প্রায় ক্ষেপে উঠে জিজ্ঞেস করে, কোথায় চাকরি করছিস বল না!

'বেকার' শব্দটা আমি মোটেই পছন্দ করি নি। কোথা থেকে ঐ অবাঙালী শব্দটা বাংলা ভাষায় জুড়ে বসলো কে জানে। অথচ এর আর কোনো প্রতিশব্দও নেই। 'চাকরি করি না', বলবো ? উঁহু, এতেও কাজ হয় না, বলে দেখেছি। তাতেও ঐ থান ইট দিয়ে তৈরি করা মাথারা জিজ্ঞেস করে, ও, বিজনেস করছিস বুঝি ?

এরপর অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়ে চলে যাই।

মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে এসব ঝঞ্ঝাট নেই। অধিকাংশ মেয়েই পথে দেখা হলে চিনতে পারে না। মেয়েদের একটা বিচিত্র সীমাজ্ঞান আছে। যে-মেয়ের সঙ্গে তার বাড়িতে আলাপ, অথবা কোনো-না-কোনো ফাংশনে, সে শুধু তার বাড়িতে বা ঐ ধরনের কোনো ফাংশনেই চিনতে পারবে, অন্য কোথাও নয়। এ ছাড়া, বিয়ের আগে যার সঙ্গে পরিচয়, বিয়ে হয়ে যাবার পর তাকে তো আর চিনতে পারার রীতিই নেই। আরেক ধরনের মেয়ে আছে যারা মুখোমুখি পথে দেখা হলে চোখ নামিয়ে নেবে সঙ্গে সঙ্গে, তারপর একটু পরে আরেকবার তাকাবে স্থিরভাবে এক সেকেণ্ড, তারপর আবার চোখ নামিয়ে হাঁটতে শুরু করবে। ভাবখানা এই, আমি যদি আগে কথা বলি, তা হলেই তিনি দয়া করে আমাকে চিনতে পারবেন। এসব ক্ষেত্রে আমি কথা বলি না। না, আগে লক্ষ করি, মেয়েটির মুখে চেনা-হাসি আছে কিনা।

আর একদল মেয়ে পথে সামনাসামনি দেখা হলে একদম চিনতে পারে না, কিন্তু চলন্ত গাড়ি, বাস বা ট্যাক্সি থেকে দেখলে চেনামুখে হাসে, অনেক সময় হাত নাড়ায়। কিন্তু কখনো থামে না। তারা দ্রুত চলে যাবে বলেই এক মুহূর্ত চেনার ভান করে। জীবনে একবার মাত্র একটি মেয়ে আমার সমীপে জীপ গাড়ি থামিয়ে বলেছিল, একী আপনি এখানে ? আসুন আমার সঙ্গে।

যে মেয়েরা দেখা হলেই হাসিমুখে চিনতে পারে তাদের সঙ্গে কথা খোঁজার কোনো সমস্যাই নেই। তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাস স্টপে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায়, অথবা চায়ের দোকানে, অথবা বাড়ি পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত। দু'জন পুরুষ বন্ধুতে দেখা হলে আড্ডা হয় না, খোঁজ পড়ে তৃতীয়ের বা চতুর্থের কিন্তু

একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলে কথা বলতে পারে দীর্ঘক্ষণ, প্রেম না করেও, কী কথা কে জানে।

এই সমস্ত অলিখিত নিয়ম আছে সম্ভাষণের, এই কলকাতা শহুরে। প্রত্যেকটি চেনা লোক বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা। এদের জন্যে কোনো লিস্ট বানাতে হয় না, দেখা হলেই মনে মনে তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে যায়—শুধু ভ্রূ-নৃত্য, না হাসি, না এক মিনিট, না চায়ের দোকান পর্যন্ত। প্রতিদিন একরকম, কোনো নড়চড় নেই। যার সঙ্গে শুধু 'কী খবর' বলেই চলে যেতে হয়, কোনোদিন তার সত্যিকারের খবর শোনার আগ্রহ হয় না।

আজ আমার শুকনো 'ভালো আছেন ?'—প্রশ্নের উত্তরে লোকটির রাস্তা পেরিয়ে আসা এবং এসে বলা, 'না ভালো নেই', শুনে আবার অবাক না হলে চলে না। কী আশ্চর্য, লোকটি কি সভ্য সমাজের লোক নয় ? জানে না যে, লোকটি সত্যিই ভালো আছে কি না সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, খারাপ থাকা বিষয়ে তো নয়ই।

আমি ঠোঁটে হাসি এঁকে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে দাঁড়িয়ে থাকি। লোকটি বলে, জানেন, রমলা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। না, না, আসলে, আমিই রমলাকে ছেড়ে চলে এসেছি ! ভালো থাকবে কী করে বলুন।

লোকটির নাম আমার কিছুতেই মনে পড়ে না। তা ছাড়া, রমলা বিষয়ে তো আমি কিছুই জানি না। কে রমলা ? কোথাকার রমলা ? কে তাকে ছাড়লো, কেনই বা…। না, রমলা নামের কারুকে আমি চিনি না। এই লোকটাকেই বা কি ভাবে চিনি ? মনের প্রতিটি কোণে আমি তখন ওয়ারেণ্ট নিয়ে জোর তল্লাস চালাচ্ছি—হঠাৎ মনে পড়লো, লোকটি একটি ওষুধ কোম্পানির সেলসম্যান, বছর তিনেক আগে চিনতাম—কথার মধ্যে মধ্যে চশমার ব্রিজটা হাত দিয়ে টিপে ধরার অভ্যেস দেখে লোকটির পরিচয় আমার মনে পড়লো, লোকটির ব্যক্তিগত জীবন তো আমার জানার কথা নয়।

লোকটি আমার কাছাকাছি সরে এসে বললো, খুব খারাপ আছি, বুঝলেন ! আপনি পুলিসে চাকরি করেন না তো ?

আমি বিস্মিতভাবে 'না' বলি।

—যাক্। আমাকে পুলিসে খুঁজছে। সব সময় স্পাই ঘুরছে আমার পিছনে। জীবনটা অতিষ্ঠ করে দিলে।

—কেন ? হঠাৎ—

—আর বলবেন না ! ওদের ধারণা আমি রমলাকে পাচার করে দিয়েছি।

হেঃ! আমি রমলার কে মশাই? আমি তো তাকে ছেড়ে চলে এসেছি। দেখুন না, মোটরগাড়িও চড়ি না আজকাল। মাছ-মাংস খাই না। রাত্তিরে আসে যদিও। রোজ রাত্তিরে বিরক্ত করতে আসে। গায়ে সেই কালোরঙের কটকী শাড়ি, পায়ে আবার বাঈজীদের মতো নূপুর, সারারাত ধরে ঝম্‌ঝম্‌ ঝম্‌ঝম্‌, ঝম্‌ঝম্‌ ঝম্‌ঝম্‌ ঝম্‌—

যাক্‌। লোকটা পাগল হয়ে গেছে! আমি ভেবেছিলাম, কী না কী। সভ্যসমাজ বুঝি বদলে গেল। 'ভালো আছেন।'—এর উত্তরে 'ভালো নেই' বলা শুরু হলো বুঝি। তা নয়, সভ্য সমাজ ঠিকই আছে, ভ্রূ-নৃত্য আর স-দাঁত হাসি। এ লোকটাই শুধু আলাদা, নেহাত একটা পাগল।

৩



বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় শুনতে পেলাম দূরের একটা বাড়িতে যেন একসঙ্গে অসংখ্য কাঁসার বাসন ভাঙা হচ্ছে—সেই ঝন্‌ঝন শব্দ। একটু মনোযোগ দিতেই বুঝতে পারা গেল, কাঁসার বাসন নয়, অনেকগুলি স্ত্রী-কণ্ঠের চিৎকার। ক্রমাগত, একটানা সেই স্বর কিছুক্ষণ চললো। কান্নার না আনন্দের, দূর থেকে মেয়েদের কণ্ঠ শুনে আমি কোনোদিন বুঝতে পারি না।

কিন্তু ধ্বনি বেশ প্রবল, আশেপাশের বাড়ি থেকে একসঙ্গে বহুলোক ছুটে গেল সেদিকে। বেলা আন্দাজ এগারোটা, সুতরাং ভিড় তেমন উপযুক্ত হলো না —অধিকাংশই বৃদ্ধ ও অপর মেয়েরা, বাচ্চার দল, কয়েকটি বেকার ছোঁড়া। প্রথমে গণ্ডগোল কিছুই বোঝা গেল না, আমার বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু ঠিক শ্রবণ-দূরত্বে নয়। আমি খুব কৌতূহলী ছিলাম না। কিছুটা অলস চোখেই তাকিয়ে ছিলাম, এ সমস্ত লোকাল কোলাহল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব লঘু কারণে হয়।

একটু পরেই একটা কালো প্যাণ্টলুন-পরা ছোকরা এগিয়ে এসে, তার তিনতলা বাড়ির রান্নাঘরে কড়াই চাপানো উনুনের কাছ থেকে সরে-আসতে-না-পারা উদগ্র ব্যগ্রতাময়ী বউদির উদ্দেশে চেঁচিয়ে জানালো যে, ও বাড়ির একতলার ভাড়াটে আত্মহত্যা করেছে।

খবরটা আমিও ওর মুখ থেকেই জানতে পারলাম, এবং জেনে চমকে উঠতেই হলো।

আত্মহত্যা? বেলা এগারোটায়? ব্যাপারটার মধ্যে বিশেষত্ব আছে সন্দেহ নেই। প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করি নি। আত্মহত্যা তো রাত্তিরের কারবার, চিরকাল সেই রকমই হয়ে আসছে। কিন্তু এই কাঁচা দুপুরে? সুতরাং আমার মনে হলো, হয়তো উনুন থেকে হঠাৎ কাপড়ে আগুন লেগে ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কিন্তু, না। জনতার উচ্চগ্রাম থেকে জানা গেল ভদ্রমহিলা বিষ খেয়েছেন, পাশেই 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়!'

কয়েকজন সশব্দে ছুটে গেল থানা ও অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েই তৎক্ষণাৎ ভেবে দেখলাম, ভদ্রমহিলাকে আমি কখনও দেখেছি কিনা। হয়তো না, দেখলেও ওঁর মুখ আমার মনে নেই, কিংবা ঠিক কোন্ ভাড়াটে বউটি, তা আমি জানতে পারি নি। আমি তখনও বারান্দাতেই দাঁড়িয়েছিলাম।

মাস ছয়েক আগের ঘটনা। আমি তৎক্ষণাৎ যে বারান্দা থেকে নেমে ছুটে যাই নি জনতার মধ্যে, তার কারণ ছিল খুবই সামান্য। আমার চটি জোড়া একেবারে ছেঁড়া ছিল—আমি পা-জামা পরে দাঁড়িয়েছিলাম খালি পায়ে। এক-জোড়া শু সম্বল। পাজামার সঙ্গে তো আর শু পরে রাস্তায় বেরুতে পারি না। অথবা, একজন ভদ্রমহিলা মারা গেছেন শুনে—সেই মুহূর্তে আমি পোশাক বদলে প্যান্ট-শার্ট পরে সেজেগুজে তবে পথে বেরুবো, এটা কেমন দৃষ্টিকটু লাগে। অথবা খালি পায়েই দ্রুত ছুটে—কিন্তু কলকাতা শহরে খালি পায়ে? অসম্ভব, জামা-কাপড় পরে খালি পায়ে—ঐ ভদ্রমহিলার জন্য আমার অশৌচ শুরু করার কোনো কারণই নেই। আমি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

হয়তো, ছুটে না যাবার আর একটা গুপ্ত কারণ আমার ছিল। আমি কোনো মরা-মেয়ের মুখ দেখতে চাই না। একবার দৈবাৎ দেখে ফেলেছিলাম, একটি অচেনা যুবতীর মরা-মুখ, একঝলক, কিন্তু সেই থেকে সে মুখ আমার মনে গেঁথে আছে, কিছুতেই তাড়াতে পারি না। আমি আমার বান্ধবীদের মুখ অনেক সময় ভুলে যাই, কিন্তু কখনও ভুলতে পারি নি সেই মৃত মেয়েটির মুখ। আমি আর একটি ওরকম মুখ বাড়াতে চাই না। আমার বুকের মধ্যে কয়েকটি মরা মেয়ের মুখের প্রদর্শনী থাক্, আমি চাই না।

তা ছাড়া, অলস ভঙ্গিতে আমি দাঁড়িয়েছিলাম, সেই ভঙ্গি বদলে ব্যস্ত হবার আমার কি-ই বা প্রয়োজন। রেডিওতে বিবিধ ভারতীর কু-সঙ্গীত হচ্ছে, ওরা তো এই মৃত মহিলার সম্মানে গান বন্ধ করে নি, এমন কি অনেক বাড়িতে রেডিও পর্যন্ত বন্ধ হয় নি—দূরে ট্রাম ও বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি—কেউ থামে নি, একটি মহিলার মৃত্যুতে কোথাও কিছু বদল হয় নি—সবই একরকম চলছে, শুধু এই গলিটুকুতে ছাড়া।

ততক্ষণে এই গলিপথ ভর্তি হয়ে গেছে মানুষে, কি করে এত মানুষ এত দ্রুত

খবর পায় জানি না। মানুষ মরার গন্ধে শকুন আসে না, মানুষই আসে। আমি সেই জনতাকেই লক্ষ্য করছিলাম।

সেইদিনই আমি আবিষ্কার করেছিলাম, জনপ্রিয় লেখকদের জনপ্রিয়তার রহস্য। তাঁরা জীবন বা মৃত্যুর সমগ্রতার সম্পর্কে কিছু লেখেন না, একটি লাইনও না, কারণ, কেউ তা শুনতে চায় না। ওঁরা শুধু লেখেন জীবন ও মৃত্যুর গল্প। মাত্র গল্পটুকু। দুঃখ, বেদনা, মমতা—বিশেষ করে মমতা এড়িয়ে যেতে হয় অতি সন্তর্পণে, মমতা শব্দের অর্থ 'আমারও যদি এরকম হয়' এই বোধের বেদনা। কেউ তা চায় না, নিজের কথা মিলিয়ে নিতে চায় না। আমি সেদিন দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে প্রতিটি মানুষের মুখে, চোখে, ভুরুতে, চশমার কাচে, আঙুলের ডগায়, ছাতার বাঁটে, জামার হাতায়—একটিমাত্র প্রশ্ন লেখা আছে—কেন, কেন, কেন, কেন? অর্থাৎ গল্পটা কি? গল্পটা? গল্পটা? জীবন ও মৃত্যু ঐ ভদ্রমহিলার জীবনে কতখানি খেলা খেলেছে কেউ জানতে চায় না, সবাই জানতে এসেছে শুধু সেই ক্রূর ঘটনাটুকু মাত্র—কেন মরলো? কেন?

নির্লজ্জের মতো সরবে অনেকে অনেক রকম থিওরি দিচ্ছিলো, অর্থাৎ প্রত্যেকের এক একটি আলাদা গল্প—ব্যর্থ-প্রেম, মানসিক অসুখ, স্বামীর অবহেলা, ক্যান্সার, স্বামীই মেরে রেখে আত্মহত্যার মতো সাজিয়ে রেখে গেছে—এই সব। প্রত্যেকটা গল্পই কাঁচা, সবাই যেন অপেক্ষা করছিল একজন পাকা ঔপন্যাসিকের —যে এসে সব কিছু নিখুঁতভাবে জুড়ে দেবে। কেউ কেউ বলছে, এই সরু গলিতে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবে?—অর্থাৎ তখন গল্পের নায়িকার চেহারাটা ভালো করে দেখা যাবে তো? পুলিস আসতে এত দেরি করছে কেন?—অর্থাৎ পুলিস এসে যদি সেই মুহূর্তেই গল্পটা আবিষ্কার করে ফেলে!

ফ্ল্যাশব্যাকে ভদ্রমহিলার পূর্ব-পরিচয়ও আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েই শুনতে পেলাম। সুন্দরী। চার বছর বিয়ে হয়েছে—কিন্তু এ পাড়ার ভাড়াটে হয়েছেন দেড় বছর। স্বামী কাস্টমসে কাজ করেন। ভদ্রমহিলা বি-এ পাস, কিন্তু কি আশ্চর্য, ভালো সেলাইও জানেন। কুমারী মেয়েরা ওঁর কাছে প্রায়ই দুপুরবেলা ডিজাইন তোলা শিখতে যেতো। সাবুর পায়েস রান্না উনিই এ পাড়ায় প্রবর্তন করেছেন। ওঁর স্বামী একবার পাড়ার স্পোর্টসের পুরস্কার-বিতরণীতে সভাপতি হয়েছিলেন মূল সভাপতির অনুপস্থিতিতে। প্রেম করে বিয়ে কিনা, তাই এখনও ছেলেমেয়ে হয় নি। স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে প্রায়ই সন্ধেবেলা সিনেমা দেখতে যেতো। আত্মীয়স্বজন তো বেশী দেখা যায় নি, প্রায়ই আসতেন ভদ্রমহিলার মা, স্বামীর অফিসের বন্ধুরা! আর আসতো মাঝে মাঝেই একজোড়া

৪

*****

হার্মাদ! হার্মাদ! দূর সমুদ্রে হয়তো দেখা গেছে কয়েকটি জাহাজের পাল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কারুর চোখে পড়েছে কঙ্কালচিহ্ন আঁকা পতাকা, অমনি বাংলাদেশের উপকূলবর্তী গ্রামে গ্রামে রব ওঠে, হার্মাদ! হার্মাদ! পর্তুগীজ জলদস্যু আসছে বাংলাদেশের গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে! লুঠতরাজ করতে, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী নিয়ে যেতে। চোখের নিমেষে গ্রামের নারী-পুরুষ-শিশুরা হাতের সামনে যা কিছু সম্বল টপাটপ তুলে নিয়ে ছুট, উধাও। সহস্র কণ্ঠে ভয়ের চিৎকার, হার্মাদ! হার্মাদ!

অথবা,

নর্দমায় ভন্‌ভন্‌ করছে অযুত সংখ্যক মশা। কালো জলের ওপর সরের মতো ভাসছে মশাদের শিশুসমাজ। বেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, হঠাৎ কোনো দুরন্ত বালকের হাত নর্দমায় একটা ঢিল ছুঁড়লো। অমনি পিন্‌পিন্‌ শব্দে ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে উঠলো কয়েক নিযুত মশা। পিন্‌পিন্‌ শব্দে ওরা কি বলে তা অবশ্য এখনও জানি না।

অথবা,

আর একটা দৃশ্য মনে পড়লো। চাইবাসার অসমতল মাঠে দেখেছিলাম একটা মরা কুকুরীর শরীর ছিঁড়ে খাচ্ছে বিশ-পঞ্চাশটা শকুন। অতগুলি বৃহৎ ও বিকট পক্ষী জানোয়ারকে মাটির উপর কাছাকাছি আগে দেখি নি কখনও। একটা টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা কয়েকজন দেখছিলাম, শকুন মানুষের চোখ ঠুকরে খায়—এ রকম একটা ভয়ও ছিল। এমন সময় দেখলুম, আর একটা অমিততেজা কুকুর। কুকুরটা খুব বড় নয়। ভয়ঙ্করও না, কিন্তু ওর ঐ দুঃসাহসীভঙ্গীতে তীব্র গতিতে ছুটে আসা দেখে মনে হচ্ছিল কোনো দীপ্ত অশ্বারোহী ছুটে আসছে পাহাড় থেকে, নারীকে উদ্ধার করার জন্য কোনো মধ্যযুগের নাইট। প্রত্যেকটা শকুনের

চেহারাই কুকুরটার চেয়ে বড়, কিন্তু তবু ওকে অমনভাবে ছুটে আসতে দেখে এক সঙ্গে অতগুলো শকুন ক-র-র-র, ক-র-র-র শব্দ করতে করতে উড়ে গেল। ঢালু জায়গা থেকে নেমে আসার জন্যেই বোধ হয় কুকুরটার ছোটার একটা মোমেণ্টাম এসে গিয়েছিল, সহজে থামতে পারলো না, থামলো বহু দূরে গিয়ে। ততক্ষণে শকুনগুলো আবার নেমে আসছে। দূরে দাঁড়িয়ে কুকুরটা একটা চাপা গর্জন করে পিছনের দু'পা দিয়ে মাটি আঁচডালো, তারপর সেই রকম ভীমবেগে আবার ছুটে এলো, আবার উড়িয়ে দিল শকুনগুলোকে!

অসংলগ্ন এই দৃশ্য তিনটি মনে পডলো কলকাতার সন্ধেবেলা খুব একটা পরিচিত দৃশ্য দেখে। সন্ধেবেলার আলো ঝলমল নগরী, পথে পথে অংসখ্য মনোহারী দ্রব্যের মেলা। ফিরিওয়ালাদের প্রত্যেকের কি সুন্দর সুরেলা গলা, প্রত্যেকের আলাদা ভঙ্গী, সেফ্‌টি-পিন্‌, বোতাম, কলম, রেডিমেড জামা, কাগজের কুমীর, চটি জুতো, ন্যাপথালিন, অদৃশ্যকালি—হঠাৎ রব উঠলো, হাল্লা! হাল্লা! এক নিমেষে লেগে গেল হুটোপুটি, যুদ্ধক্ষেত্রের মতো ব্যস্ততা—সে-সব জিনিস গুটিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তা ফর্সা করে দিয়ে। কোথায় দেখা গেছে জাহাজের পালের মতো লাল পাগডীর ঝিলিক, কিংবা নাকে এসেছে কালো গাডির পেট্রলের গন্ধ—অমনি চাপা-গলায় চালাচালি হযে যাবে, হাল্লা! হাল্লা! কেউ কেউ ছুটে যাবে, পাশের অলিগলিতে, দু' একজন আবার উঠে দাঁড়াবে সামনের কোনো বাড়ির রকে। রকে উঠে দাঁডালেও নিরাপদ, ফুটপাথটুকু ছাডতে হবে শুধু। অর্থাৎ, সেই যে গল্প শুনেছিলাম—এক মাতালকে রাত্তির-বেলা পুলিসে তাডা করেছে, ছুটতে ছুটতে মাতাল হঠাৎ রাস্তায় একটা চাপাকল দেখতে পেয়ে—সেখানেই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পডে জলে হাত রেখে বলেছিল, এখন আর তুমি আমাকে ধরতে পারছো না বাওয়া, এখন আমি জল-পুলিসের আণ্ডারে। সেই রকম কোনো ফুটপাথের ফেরিওলা একবার কোনোক্রমে কোনো বাড়ি বা দোকানের সিঁডির এক ধাপে বা রকে উঠে দাঁডাতে পারলেই আব হাল্লা জুজুকে ভয় নেই।

সাত দু'গুণে চোদ্দর চার নামলো, হাতে রইলো পেন্সিল। আমার হাতে পেন্সিল রয়ে গেল। এক বান্ধবীর দুটি ছোট ভাইবোনকে খুশী করার জন্য দুটি ডট্‌পেন্সিল কিনছিলুম। দাম চেয়েছিল একটাকা, অনেক কষাকষি করে চোদ্দ আনায় নামিয়েছি—এমন সময় হঠাৎ লোকটা ফুটপাতে বিছানো চাদরের চারটে খুঁট একসঙ্গে ধরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চোদ্দর চার-ও আমাকে নামাতে হলো না,

দুটো পেন্সিল হাতে আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবো বুঝতে পারলুম না। দাম না দিয়ে চলে যাবো? কিন্তু বিবেকে পিঁপড়ের কামড় অনুভব করলুম। আজকাল ধর্মবোধের সঙ্গে আমাদের বেশ ভালো রকম একটা কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে। এই পেন্সিল দুটোর দাম যদি একশো টাকা হতো, তবে দাম না-দেবার সুযোগ পেলে বিনাদ্বিধায় তদ্দণ্ডেই টুক্ করে পাশের গলিতে সট্‌কাতুম নিশ্চিত। কিন্তু মাত্র চোদ্দ আনা বলেই বিবেকবোধ পাদ্রীর মতো জেগে উঠেছে। তা ছাড়া একটি মেয়েকে খুশী করার মতো শুভকাজের শুরুতেই অধর্ম করা উচিত নয় ভেবে আমি দাম দেবার মহৎ বাসনায় দোকানদারটির উদ্দেশ্যে এদিক-ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করলুম। দেখলুম, আমার মহাজনটি সেপাইর হাতে ধরা পড়েছেন। আইনের প্রবল হাত তার কলার শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

আমি আস্তে আস্তে ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালুম। ওকে পেন্সিল দুটি ফেরত দেওয়া কিংবা দাম মিটিয়ে দেওয়া সেই অবস্থায় ওর কেসের আরও বিপক্ষে যাবে কিনা বুঝতে না পেরে একটু ইতস্তত করতে হলো। সেই সময় বেশ চিত্তাকর্ষক সংলাপ বিনিময় শুনতে পাওয়া গেল।

—এ সেপাইজী, কি হচ্ছে মাইরী। তুমি কাল আমাকে ধরেছিলে, আবার আজ ধরছো কেন?

—চল না, তোর সঙ্গে একটু গপ্‌সপ্ হবে।

—না, ওসব ইয়ার্কী ভালো লাগে না! পরপর দু' দিন ধরবে, চালাকি নাকি? আজ তো জগাকে ধরার কথা!

—তা, আমি অত আস্তে আস্তে আসছিলুম, তুই পালালি না কেন? আমি তো বহুৎ টাইম দিয়েছি।

—আমাকে তো আজ ধরার কথাই ছিল না!

—জগাকে তো দেখতে পেলাম না!

—তা বলে জগার পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবে?

—তোকে একবার ধরে ফেলেছি, আর ছাড়ি কি করে?

—কাঁধ থেকে হাতটা তুলে নিলেই হয়!

—গাড়িতে ইন্‌সপেক্‌টার সাহেব বসে আছে।

—চলো তোমার ইন্‌সপেক্‌টারের কাছে, আমি মুকাবিলা করিয়ে দিচ্ছি।

সেপাই সমেত আমার ফিরিওলা গেল অদূরে প্রতীক্ষমাণ কালো গাড়ির সামনে। ড্রাইভারের পাশে বসে ইন্‌সপেক্‌টার সাহেব হাঁটু দোলাচ্ছিলেন, সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আবার এসেছে!

ফিরিওলাটি বেশ চড়াগলায় ধমকের সুরে বললো, স্যার, একি অবিচার, আমাকে পরপর দু'দিন ধরবে ?

ইন্‌সপেক্‌টার মুচ্‌কি হেসে বললেন, তুমি ধরা পড়তে গেলে কেন ?

—অন্যমনস্ক ছিলুম। তা ছাড়া, আজ তো আমাকে ধরার কথাই ছিল না !

—ধরা পড়েছই যখন, উঠে পড়ো, আর কি করবে !

—আমার মাসে পনেরো টাকা ফাইন দেবার কথা, এ মাসে আমার পনেরো টাকা হয়ে গেছে। আবার এ কি অন্যায় ?

—আচ্ছা মুশকিল, তুই ধরা পড়লি তো আমি তার কি করবো ? এখন তো উঠে পড, পরে দেখা যাবে।

—না স্যার, তা হয় না, এ মাসে আমার পনেরো টাকা পুরিয়ে দিয়েছি। আর বেশী হলে অবিচার করা হবে, স্যার। আজ জগাকে ধরার কথা।

—জগা কোথায় ?

—ঐ ঘড়ির দোকানের রকে উঠেছে।

—হুঁ, জগা আজ ধরা দিল না কেন ? ওর খুব বাড় বেড়েছে দেখছি। বড্ড বেশী চালাক হয়ে গেছে, না। আচ্ছা পরে ওকে মজা দেখাবো। আজকে তুই-ই চল। আজ আমার দশটা কেস্ নিয়ে যাবার কথা।

—তা দশটা নেবেন, কলকাতায় কি ফিরিওলার অভাব ? পরপর দু' দিন একজনকে কেন ! আপনারও তো স্যার দয়ামায়া আছে, পুলিশ হলেও তো স্যার, আপনিও তো মানুষ।

—আচ্ছা ঝঞ্ঝাট তোদের নিয়ে। আচ্ছা, ওর কাঁধটা ছেড়ে দে। শোন্, তুই সেপাইর হাত ছাড়িয়ে চোঁ-চা ছুট দিবি পাশের গলিতে। নিধিলাল তোর পেছুনে পেছুনে ছুটবে তাড়া করে। তুই জোরে ছুটবি কিন্তু। ওর থেকে জোরে ছোটা চাই। নিধিলাল যদি তোকে আবার ধরে ফেলে—তা হলে কিন্তু তোর আজ আর ছাড়া নেই। যা দৌড়ো !

তারপর দৃশ্যটা বেশ সুন্দরভাবে অভিনীত হলো। পোঁটলাটা কাঁধে নিয়েই ফেরিওলাটি বেশ জোরে সেপাইর হাত ঝট্‌কা দিয়ে ছাড়িয়ে ছুটলো এঁকেবেঁকে। সেপাইটি পিছন পিছন খানিকটা তাড়া করে গেল, তারপর অবিকল ভগ্নোৎসাহের ছাপ মুখে নিয়ে ফিরে এলো। কালো গাড়িটা হুস্ করে ছেড়ে চলে গেল অন্য কোথাও হাল্লা করতে

দৃশ্যটি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে আমি অপরোনাস্তি সুখী হলুম। গত পনেরো বছর ধরেই দেখে আসছি বিকেলের দিকে ফুটপাতের হকার ফেরি-



ওয়ালদের মধ্যে অকস্মাৎ পুলিশের আবির্ভাব। তক্ষুনি ছুটোছুটি, বেড়াল ইঁদুর ছানা ধরার দু-একটি ছবি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পথের দোকানদারি একটুও কমে নি, ববং বেড়েই চলেছে। রঙ-বেরঙেএব সওদায় রাস্তার শোভা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে ক্রমশ। এখন কলকাতায় এমন শিকড়হীন দোকানীর সংখ্যা অন্তত পাঁচ হাজার এবং সস্তায় এদের কাছ থেকে ছোঁক-ছাঁক জিনিসপত্রের ক্রেতার সংখ্যা প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। অর্থাৎ ফুটপাতের ফেরি কলকাতার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান এখন। সুতরাং মাঝে মাঝে আমার ভয় হতো, ফুটপাত থেকে এদেব যখন তোলাই যাচ্ছে না, তখন পুলিশ হয়তো নিরুৎসাহ হয়ে এদেব বিরক্ত করার আইনটাই তুলে নেবে। এবা সুবেলা গলায় নিজেদের জিনিসেব গুণগান গাইবে নিঃশঙ্কভাবে। আমরা আর হাল্লার অমন চমৎকার দৃশ্য মাঝে মাঝে দেখতে পাবো না।

আজ বুঝতে পারলুম, সে ভয় নেই। ও আইন তোলা হবে না। ও আইনটা রাখা উচিত পুলিশের রিক্রিয়েশনের জন্য। পুলিশেব নীরস জীবনেও তো মাঝে মাঝে খেলাধুলো, আমোদ-আহ্লাদের দরকার। হাল্লা গাড়ি নিয়ে এসে সেই আনন্দটুকু ওঁরা পান। পুলিশেরও তো মাঝে মাঝে চোর-পুলিস খেলতে ইচ্ছে হয়।



✻✻✻✻✻

—এখানে মোক্ষদা কোথায় থাকে বলতে পারেন ?

—কোন্ মোক্ষদা ? নান্তির মা, না তকাইর দিদিমা ? দু'জন আছে এখানে। আপনি কোন্ জনকে চান ?

মুশকিলে পড়লুম। বাড়ির ঝি বিনা নোটিসে চার দিন আসছে না। একরাশ এঁটো বাসন ডাঁই হয়ে গেছে। বাড়ির তাড়নায় গ্রে স্ট্রীটের এক বস্তিতে ঝির খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। ঝিকেই চিনি, তার সন্তান-সন্ততিদের ইতিহাস আমার জানার কথা নয়। সুতরাং কোন্ মোক্ষদাকে চাই তা বলতে পারলুম না।

খাটিয়ায় বসে থাকা বুড়ো লোকটি বললো, একজন মোক্ষদা থাকে ঐ ডান দিকের নিমগাছের পাশের ঘরটায়। আর একজন পেছনের সেই অয়েল মিলের কাছে।

নিমগাছের তলায় খাপরার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলুম।

—কে ?

—মোক্ষদা আছে ?

—এখন হবে না !

কি কথার কি উত্তর ! কিন্তু ঐ দুর্বোধ্য উত্তরেও আমার কোনো অসুবিধে হলো না। গলার আওয়াজেই বুঝতে পারলুম, উত্তরদাত্রী আমার উপলক্ষিত মোক্ষদা নয়। আরও বুঝতে পারলুম, ঐ কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীর নিমগাছের তলায় বাস করা সার্থক !

দ্বিতীয় মোক্ষদার সন্ধানও একটু চেষ্টা করতেই পাওয়া গেল। বস্তির পিছনে পানের দোকানে খোঁজ করতেই দেখিয়ে দিল। শুনলাম, সেই মোক্ষদার মায়ের দয়া হয়েছে। সামনের মাঠকোঠার দোতলায় থাকে। আমার উদ্যমের ওখানেই

ইতি হওয়া উচিত ছিল। মনে মনে ও-ঝিকে তখুনি আমি বরখাস্ত করে দিয়েছিলাম। অতএব, তারপর আর ঐ নোংরা বস্তিতে সময়ক্ষেপ করার কোনো দরকার ছিল না। তবু কি রকম কুমতি হলো। অনেক সময় যেমন আমাদের ডান দিকে যাবার দরকার, তবু বাঁ দিকের রাস্তায় হাঁটি, অথবা টুথপেস্ট কিনতে বেরিয়ে সেটা না কিনে সেই পয়সাতেই এক দোয়াত কালি কিনে আনি, সেই-রকমই কোনো যুক্তিতে সম্ভবত ভাবলুম, মোক্ষদাকে একবার দেখে যাই।

পানওলা হাঁক দিয়ে বললো, ছেদীলাল, এ ছেদীলাল, বাবুকে উপরে মোক্‌সদার কুঠিতে লিয়ে যা।—একটা বারো কি তেরো বছরে ন্যাংচা ছেলে আমাকে বললো, আসুন!

জিজ্ঞেস করলুম, মায়ের দয়া কবে থেকে হয়েছে রে ওর।

—দু'চার দিন। আপনি এখেনটায় জুতো খুলে আসুন। ওসব জায়গায় জুতো পরে যেতে নেই।

আমি বললুম, থাম্ থাম্, তোকে আর উপদেশ দিতে হবে না। আমার এটা রবারের জুতো।

নড়বড়ে হাতলহীন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চকিতে একটা কথা মনে পড়লো। অপ্রাসঙ্গিক যদিও। মনে পড়লো, দয়া আর কৃপা শব্দ দুটির মানে প্রায় এক জানতুম, কিন্তু আসলে ও দুটো কত আলাদা। মা ষষ্ঠীর কৃপা আর মা শীতলার দয়া, এই দুটো কথায় জমা-খরচের দুটো দিকই বুঝিয়ে দেয়।

দরজার কাছেই বসে ছিল, মুখ ফেরাতেই চিনতে পারলুম মোক্ষদাকে, মুখে খুব বেশী গোটা ওঠে নি। আমাকে দেখে তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে আসতে যেতেই পাশের ঘর থেকে একজন বললো, ও কি মাসী, বেরিও না, বেরিও না, শেষে কি বাড়িসুদ্ধ সবাইকেই মারবে নাকি? আমিও বললুম, 'থাক্, থাক্।'

দূর থেকেই উঁকি দিলুম ঘরের মধ্যে। দরজার কাছের মাথা রেখে আর একটি যুবতী মেয়ে শুয়ে আছে, তার পাশে একটি আট-ন বছরের বাচ্চা। মোক্ষদা প্রায় কেঁদে ফেলে বললো, আমার কিছুই হয় নি। দাদাবাবু, আমার মেয়ে বগলাবই হয়েছে বড্ড বেশী গো। আমার সোমথ রোজগেরে মেয়ে।

বগলা একটু নড়ে-চড়ে উঠলো তারপর একেবারে উঠে বসে বললো, মা একটা বিড়ি দে তো।

—না, এখন খেতে নেই।

—একটা দে।

—বলছি তো, কটা দিন বিড়ি খেতে নেই।

—দে না, তক্ক করিস কেন ?

একটা বিড়ি মুখে দিল, তারপর পর পর ক'টা কাঠি ভেঙে আগুন ধরালো। মেয়েটার সারা মুখ ফোস্কায় ভরে গেছে। গলার আওয়াজটা তবু অহংকারী। বস্তিতে ঢুকেই একটু একটু সন্দেহ করেছিলুম, এখন এই মেয়েটির চোখ, এলো চুল, কাপড় পরার ধরন দেখেই মনে হলো, ও নিশ্চয়ই মায়ের মতন ঝি-গিরি করে না। ওর পেশা ওকে অহংকারী করেছে।

মেয়েটার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আমার বুকটা ধক্ করে উঠলো। আমি ডাক্তার নই, কিছুই না, কোনো অলৌকিক ক্ষমতাও নেই, জ্যোতিষীও জানি না, তবু, মেয়েটার মুখ দেখে এক মুহূর্তে আমার মনে হলো, ও আর বাঁচবে না। মাত্র দু-এক দিন। মৃত্যু ওর কপালে তারিখ লিখে গেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলুম, ডাক্তার দেখিয়েছো ?

—না গো। আমাদের কি সে ক্ষমতা আছে। তা ছাড়া মায়ের দয়ায় ডাক্তার কি চিকিচ্ছে করবে ? বাবাঠাকুর এসে মায়ের চন্নমের্ত দিয়ে গেছে আর ঝেড়ে দিয়ে গেছে।

—টিকে নিয়েছিলে ?

—বাবাঠাকুরের দয়ায় ওসব আমাদের লাগে না।

বস্তুত কোনো রকম উপদেশ ঝাড়াব ইচ্ছে আমার ছিল না। চলে আসবার আগে তবু জিজ্ঞেস করলুম, 'ও বাচ্চাটারও কি হয়েছে নাকি ?'

—না, ওর হাম হয়েছে।

—কি করে বুঝলে ?

—আমাদের এখানে কোনো বাচ্চা ছেলেমেয়েব কখনো মায়েব দয়া হয় নি। বাবাঠাকুর বলে গেছেন, ওর কোনো ভয় নেই।

আমি বললুম, তা বটে। অনেক পুণ্য করলে মায়ের দয়া পাওয়া যায়। ও আর এমন কি করেছে যে, মা ওকে দয়া করবেন।

বগলা বললো, মা, বাবুর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা চেয়ে নে। তোর মাইনের আগাম। বাবাঠাকুরকে আবার পাঁচ সিকে দিতে হবে পুজোর জন্য।

মোক্ষদা বললো, কোন্ মুখে চাইবো ? এই তো এমাসের মাইনে নেবার দুদিন পরেই জ্বরে পড়লুম। আমার কি আর কিছু পাওনা হয়েছে ?

বগলা আমার উপস্থিতির একটুও সম্মান না দিয়ে গলায় ঝঙ্কার তুলে বললো, তুই চা না, বাবুদের কাছে দু' পাঁচ টাকার আবার দাম কি।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল প্রায়, 'টাকা তো সঙ্গে আনি নি!'

কেননা যে দু'দিন পরেই মারা যাবে তার জন্য টাকা খরচ করে, কি লাভ ? কিন্তু পাঁচটা টাকা আমি পকেট থেকে বার করে চৌকাঠে তবু ছুঁড়ে দিলাম ; কারণ, একটা যুক্তি সেই মুহূর্তেই মাথায় এলো। মনে পড়লো, কালী পুজোর সময় যখন বাজি পোড়াই—তখন তো জেনে-শুনেই টাকাগুলো খরচ করি যে, একটু পরেই বাজিগুলো আর থাকবে না। এ-ও না হয় একরকম বাজি পোড়ানো !

মোক্ষদা কুণ্ঠিত মুখে টাকাটা নিতে যাচ্ছিল, তার আগেই বগলা ছোঁ মেরে তুলে নিল। যেন, ও বুঝে নিয়েছে টাকাটা ওবই প্রাপ্য। আমি মৃত্যুর কথা ভেবেই দিয়েছি। কি জানি, আমি যে বুঝতে পেরেছি বগলা আর বাঁচবে না—সেটা বগলাও বুঝতে পেবেছিল কি না !

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি ছেদীলালের দুটি বাহুই ওর অলক্ষ্যে দেখে নিলুম। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাহুতে যে গোল গোল দাগগুলো আছে—ছেদীলালেব তা নেই। যাক্, একটা সমস্যা মিটলো। আমার ধারণা ছিল দুনিয়ার সব লোকেবই হাতে ঐ বিচ্ছিরি পেঁচাব চোখেব মতো দাগগুলো আছে।

এক প্যাকেট সিগাবেট কিনে জানতে পারলুম, ঐ পানওলাই মাঠকোঠাটা এবং আদ্দেক বস্তির মালিক। জিজ্ঞেস করলুম, টিকে দেবার ব্যবস্থা করোনি কেন ? বস্তি যে এবাব তোমার উজাড় হয়ে যাবে ! টিকে তো বিনে পয়সায় দেয়।

—খবব দিলেও আসে না।

—গিয়ে তো নিয়ে আসতে পাবো ?

—কি হবে বাবু ! একবাব এই বস্তিতে একজন ডাক্তার এসেছিল। তারপর দিনই রুগীটা মাবা যায় ! ডাক্তাব চাবটাকা ফিস ভি নিল, রুগীও নিল। আর আমবা এখানে ডাক্তাব বোলাই না। আমাব বউ-এবও তো মায়েব দয়া হয়েছে, বাবাঠাকুব দেখছেন।

—বাবাঠাকুরেব চিকিৎসায় বুঝি কেউ মবে না ?

—যার যখন নিয়তি টানে। কালকেই তো দুটো গেছে।

—বাবাঠাকুর থাকেন কোথায় ?

—ঐ তো খালপারে মন্দির। আর আধা ঘণ্টা বাদেই বাবাঠাকুর এসে যাবেন। আজ সকলে আলাদা করে পুজো দেবো।

আমার হাতে অনেক কাজ ছিল। আর ওখানে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না। বরং অন্য জায়গায় গিয়ে নতুন ঝি-ঠাকুরের খোঁজ নেওয়া উচিত।

কিন্তু বাবাঠাকুরটির সঙ্গে একবার দেখা করার অদম্য ইচ্ছে হলো। এদের দেখলুম কারুরই কোনো ক্ষোভ নেই, বাবাঠাকুরের ওপর অসীম নির্ভরতা। সুতরাং একবার সেই মহাপ্রভুকে চাক্ষুষ না দেখলে চলে না। বললুম,' আমি ঐ চায়ের দোকানে আছি, বাবাঠাকুর এলে ছেদীলালকে দিয়ে কষ্ট করে আমায় একবার ডেকে পাঠাবে ? আমি ওঁকে একবার প্রণাম করে যাবো।

বড রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানে বসলুম। আমার টিকে নেওয়া আছে, সুতরাং আমার ভয় নেই, তা ছাড়া চা তৈরি হয় গরম জলে। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে আমি ভিয়েৎনাম এবং কঙ্গোর সমস্যায় খুবই বিচলিত এবং মগ্ন হয়ে পড়লুম।

খানিকটা বাদে ছেদীলালের সঙ্গে বাবাঠাকুর নিজেই এলেন। মাটির ভাঁড়ে চা খেতে তাঁর আপত্তি নেই, সুতরাং দুজনে দুভাঁড় চা নিয়ে বসলুম। লোকটির চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। রং কালো কিন্তু বেশ লম্বা। গলার আওয়াজ কর্কশ, খুব গম্ভীরভাবে তাকাতে জানেন। সারা কপালে চন্দনের ছাপ, বুকে পিঠেও আছে কিনা বুঝতে পারলুম না; কারণ শীতের জন্যই বোধ হয়, ফুলহাতা সোয়েটার পরে তার ওপর নামাবলী জড়িয়েছেন। বললুম, আপনাকে ওরা সবাই খুব মানে দেখছি।

—আমাকে মানে না। ঠাকুর-দেবতাকে মানে।

—তা আপনি ওদের টিকে নিতে বারণ করেছেন কেন ?

—দেখুন, একটা কথা বলি। টিকে নিলে কিংবা ডাক্তারি ওষুধ খেলেই যে সব লোক বাঁচবে এ জোর করে বলতে পারেন ? আপনাদের ও চিকিৎসা করলেও অনেক লোক বাঁচে অনেক লোক মরে। চরণামৃত খেয়েও অনেক লোক মরে আবার অনেক লোক বেঁচেও যায়। সুতরাং কোনটা ঠিক আপনি তা কি করে বলবেন ?

—তা ঠিক। তবে পৃথিবীর অনেক দেশ আছে জানি, যেখানকার লোকেরা চরণামৃত একেবারেই খায় না, পায় না আর কি, বসন্ত রোগেও কেউ মরে না।

—কথায় কথায় পৃথিবীর কথা তুলবেন না। আর কোন্ দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা চলে ? কোথায় এমন—

—থাক্, থাক্। আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু আমি বলছিলুম টিকের কথা। ওটা তো আর কোনো ওষুধ নয়। ওটা হচ্ছে, মানে, কি বলে, অসুখটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা। ঠাণ্ডা না লাগাবার জন্য যেমন আপনি গলায় মাফলার

জড়ান। অসুখটা হবার পর তো চিকিৎসার কথা। তার আগে অসুখটা না হবার ব্যবস্থা করাই কি উচিত না ?

—ন্যায্য কথা। আমি কি বারণ করেছি ? আমি মশাই আপনাদের ওসব টিকে-ফিকে বিশ্বাস করি না। কিন্তু ওরা যদি নিজেই নেয়, তবে আমি বারণ করবার কে ? কিন্তু দেয় কে ? আপনি কি ভেবেছেন কলকাতার সব বস্তিতে করপোরেশনের লোক এসে টিকে দিয়ে যায় ? মোটেই না। ও-সব আপনাদের জন্য। এদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে টিকে দেবার গরজ কারুর নেই ! টিকে দিলেও যে বাঁচবে তার অবশ্য কোনো মানে নেই, অন্য অসুখে মরবে। কর্মফল যাবে কোথায় !

—মরতে তো আপনাকেও হবে। নাকি আপনার মরার ভয় নেই ?

—কাজ ফুরোলেই মরবো। তার আগেও না, পরেও না।

—আপনার মনের জোর আছে দেখছি। আপনি যে এসব পক্সের রুগীদের ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, আপনার ভয় করে না ?

— ভয় করলেই ভয়। কে কিসে মরবে তা তো কপালে লেখা হয়েই আছে !

—আপনি হাত দেখতে জানেন ?

—না। আমরা পূজারী ব্রাহ্মণ। সাতপুরুষ ধরে কলকাতা শহরে মা শীতলার পূজারী। ওসব হাত দেখার কাজ আমরা করি না। কেন হঠাৎ ?

—আমি একটু একটু জানি। দিন আপনার আয়ু বলে দিচ্ছি।

আমি ভদ্রলোকের ডান হাতটা টেনে নিলাম। তারপর প্রায় জোর করেই পুরো হাত-ঢাকা সোয়েটারটা ঠেলে অনেকখানি ওপরে তুলে দিলাম। হাতে সদ্য টিকে নেবার দাগ। হয়তো গতকালই নিয়েছেন, একটু একটু পেকে উঠেছে। আমি চোখের দিকে তাকিয়ে বললুম, সত্যিই আপনি গুণী লোক, পায়ের ধুলো দিন।

বিষম অপ্রস্তুতভাবে বাবাঠাকুর বললেন, কি করবো বলুন। আমি নিজেও মরতে চাই না, ওদেরও মারতে চাই না। কিন্তু ওরা যে মরতেই চায়।



৬

*****

নববর্ষের রাত্রে আমরা কয়েকজন শ্মশানে ছিলাম। না, মড়া পোড়াতে যাই নি। কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এমনিই।

গত বৎসরটাকে শ্মশানে পুড়িয়ে এলাম—এমন ছেলেমানুষী ধারণাও ছিল না আমাদের। সারা রাত ঘুরতে ঘুরতে কখন শ্মশানে পৌঁছে গেছি জানি না। কেউ কোনো পরামর্শও করি নি। হয়তো, শ্মশানের পাশে ভোর দেখতে ভালো লাগে, এমন গোপন অন্তর্নিহিত ইচ্ছে ছিল।

সেইখানে, ঐ জীবন্ত মেয়েটিকে দেখতে পাই। আলো ফোটে নি কিন্তু গরম জিলিপি ভাজা শুরু হয়ে গেছে। 'জয় হোক মহারাজ', বলে শিবপ্রতিম সাধু, ভিখারী হয়ে দাঁড়ালো। পাশে ষণ্ড। শ্মশানবন্ধুরা গাঁজা খেয়ে চোখ লাল করে সিনেমার গল্প নিয়ে হাসাহাসি করছে। স্নান সেরে শীতে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে ছুটে যাচ্ছে কয়েকজন। একজন চিৎকার করে গেয়ে উঠলো 'যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে—'। বাংলাদেশের ভোরবেলার একমাত্র গান।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা দুর্বোধ্য শব্দ শুনতে পাচ্ছিলুম। অন্ধকারে শব্দের মানেও ভালো করে বোঝা যায় না। একটু আলো ফুটলে যেন মনে হলো একটি কচি মেয়ের গলা, আর একটি বৃদ্ধের। দুটোই খুব অসহায়! আশেপাশে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলাম না। নতুন বছরের প্রথম দিনের সূর্যটাও ভালো করে উঠতে পারলো না, এমন কুয়াশা।

জিলিপির পর চা। চিনির বদলে আখের গুড়ের তৈরি হলেও অমৃতের মতন স্বাদ। কেননা, ঐ ভাঁড়ের সোঁদা গন্ধ। কেননা, অমন শীতে শুকনো হয়ে আসা ঠোঁটে আগুন আগুন গরম্ তাপ। বিশ্ববিখ্যাত হোটেলগুলিতে সারা রাতব্যাপী যে নববর্ষ উৎসব হলো, তার চেয়ে আমাদের উপভোগ কম ছিল না, ঐ শেষ রাত্রির ভাঁড়ের চায়ে।

‘আপনাদের মড়া পুড়েছে ?’ একজন জিজ্ঞেস করলো আমাদের।

—না, একটু বাকি আছে।

—কতক্ষণ ?

—ঠিক জানি না। কখন মরবে তা তো বুঝতে পারছি না।

লোকটি বুঝতে না পেরে বিরক্ত মুখে চলে গেল।

সিগারেট কিনতে চায়ের দোকানের উত্তাপ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে সেই দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। একটি আট-ন’ বছরের মেয়ে। লোকটির সারা কপালে চন্দনের ছাপ, স্নান করার পর তখনও ভিজে কাপড়, অসম্ভব ভয়ার্ত মুখ। মেয়েটির দিকে হাত জোড় করে সে বলছে, হামাকে ছেড়ে দে, হামাকে ছেড়ে দে। মেয়েটি খুঁ-খুঁ করে নিচু গলায় কাঁদছে।

দুষ্কৃতির গন্ধ পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম। একটু ভারিক্কি গলায় আমরা প্রশ্ন করলুম, ‘কি ব্যাপার ?’

লোকটি ব্যাকুলভাবে আমাদের দিকে ফিরে বললো, বাবু হামাকে রক্ষা করো। হামি বে-ঝঞ্ঝাট মানুষ।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলুম। কি অসাধারণ সুন্দর মেয়েটা। এমন রূপ, যার দিকে পাপী থেকে সাধু যে-কেউ একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারে না। যেন এইমাত্র ভোরবেলা একটি ফুল ফুটে উঠল। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ফেটে পড়ছে রং, ঝরনার জলের মতো টলটলে দুটো কালো চোখ। সামান্য একটা সুতীর জামা পরে শীতে কাঁপছে, শীর্ণ হাতের মুঠিতে চেপে ধরেছে লোকটির কাপড়।

এমন দৃশ্য চট্ করে চোখে পড়ে না। আমরা ঘটনাটা জানবার জন্য তখুনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়লুম। অবাঙালী বৃদ্ধটি বলল যে, সে ভোর চারটের সময় রোজ গঙ্গাস্নান করতে আসে। আজও আসছিল, এমন সময় দেখতে পেলো পাশে পাশে ঐ মেয়েটি আসছে। সেই চিৎপুর থেকে সঙ্গে সঙ্গে এলো একটাও কথা না বলে। তারপর সে যখন কালী মাঈজীর সেবার জন্য বাতাসা কিনতে দাঁড়িয়েছিল, মেয়েটিও তখন দাঁড়িয়েছে। অমন লছমীর মতো সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে তার মায়া হয়েছিল, সে খোকিকে নাম জিজ্ঞেস করেছিল। মেয়েটি কোনো উত্তর দেয় নি, শুধু শীতে কেঁপেছে। সে তখন দুটো মেঠাই কিনে দিয়েছে ওকে। তারপর স্নান সেরে মন্দিরে এসে মা-কে প্রণাম করে শিবের মাথায় জল দিয়ে এসে দেখে মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে। ওকে দেখা মাত্র মেয়েটা এসে ওর পাশে আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধটি তখন মেয়েটার থুতনি ধরে একটু আদর করে বলেছে,

'খোঁকি, আপনা বাবা-মার কাছে যাও, একেলা ঘুরসো কেন ?' মেয়েটি তখনও কোনো উত্তর দেয় নি। তখন তার মনে হয়েছে, আ-হা, মেয়েটা বুঝি বাপ-মা হারা। নইলে কেউ শীতের রাতে ছেড়ে দেয়। সে তখন দয়া করে মেয়েটাকে একটা চৌয়ান্নি দিয়েছে। কিন্তু, তার পর থেকে মেয়েটা আর তার সঙ্গ ছাড়ছে না। 'হামার কি বিপদ বাবু, হামি একে নিয়ে কোথায় যাবো ?'

বৃদ্ধের কথা শুনতে শুনতে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। আমার মনে হচ্ছিল, তখুনি আমার ও-জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। হারানো ছেলেমেয়ে-দের মুখ দেখতে আমার বিষম অস্বস্তি হয়। রাস্তায় দুর্গা-পূজার প্যাণ্ডেলে, একজিবিশনে—কোথাও কোনো হারানো ছেলেমেয়েদের কথা শুনলেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। ঐ হারানো মুখ আমি দেখতে চাই না। তা হলে সারাদিন ঐ মুখ আমার মনে গেঁথে থাকে, কিছুতেই ভুলতে পারি না। ঐ সব হারানো ছেলে-মেয়েরা বাড়িতে সত্যিই কখনো আবার পৌঁছয় কিনা জানি না। অন্তত আমাদের সাধ্য নেই ওদের ফিরিয়ে দেবার। খবরের কাগজের হারানো-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশও কখনও পড়ি না আমি। কাগজে শুধু নিরুদ্দেশ সংবাদই থাকে—কখনো ফিরে আসার খবর থাকে না। মা-কে মৃত্যু শয্যায় ফেলে বাবা কিংবা দিদিমার অন্নজল ত্যাগ করিয়ে ঐ যারা নিরুদ্দেশ হয়, তারা আবার সত্যিই কোনোদিনই ফিরে আসে কিনা তা না জানতে পেরে এমন তীব্র অস্বস্তি হয় আমার। তার চেয়ে ওসব কথা না জানাই ভালো।

কিন্তু এখানে আর উপায় নেই। এখানে মেয়েটির মুখ দেখে ফেলেছি। অমন এক-বিশ্বের মায়া-মাখানো মুখ। আমরা জিজ্ঞেস করলুম, 'খুকি, তোমার নাম কি ?'

মেয়েটি একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ আঁ—আঁ শব্দ করল। মেয়েটি কালা এবং বোবা। বিপন্নভাবে দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে আছে লোকটার কাপড়। ভোরবেলার হাওয়ায়, আমাদের তখন খুবই শীতের কাঁপুনি লাগার কথা—কিন্তু মেয়েটার গায়ে শুধু একটা পাতলা জামা দেখে আমরা শীত অনুভব করতে ভুলে গিয়েছিলুম। আমাদের কারুর গায়ে আলোয়ান ছিল না। মেয়েটির জন্য কিছু একটা করা দরকার। কিন্তু কি করবো আমরা বুঝতে পারলুম না। ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে মেয়েটি চাইছে একটা আশ্রয়, একটা ঘরের ভিতরের তাপ।

বৃদ্ধটি বললো, 'হামিকে বাঁচান বাবু। এ আমার কি বিপদ হলো। আভি গিয়ে মালিকের দুকান না খুললে মালিক খেঁচাখেঁচি করবে। লিকিন, একে জোর করে ছাড়িয়ে কি করে যাই। সকালবেলা, একি মায়া ভগবানের।'

আমরা বললুম, এতো তোমার সঙ্গেই যেতে চায়।

—'না, বাবু, হামি একলা মানুষ, দুকানঘরে মাথা গুঁজরে থাকি। একে কোথায় নিয়ে যাবো ?' লোকটার গলায় নিষ্ঠুরতা ছিল না, ছিল অসহায়তা।

—যাও না, মেয়ের মতো মানুষ করবে।

—এ বাঙালীর মেয়েকে নিয়ে কোথা যাবো।

—বোবা আবার বাঙালী কি ?

—না বাবু, হামার উপায় নেই।

তারপর সে মেয়েটির দিকে ফিরে কাকুতি ভরা গলায় বললে, হামাকে দয়া কর্ মা। ছেড়ে দে। এই নে আর একটা চৌয়ান্নি। সকালবেলা হামাকে অধর্ম করাস নি।

মেয়েটির জন্য আমরাও অনুভব করছিলুম। কিন্তু আমাদেরও ঔদার্য এত বেশী নয় যে, একে নিজের দায়িত্বে সঙ্গে নিতে পারি, বা নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। রাস্তায় তখন কিছু লোক চলতে শুরু করেছে। কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখে যেতো লাগলো। 'আহা, এমন ফুটফুটে মেয়েটা কাদের গো, হারিয়ে গেছে বুঝি ?'

আমরা জনে জনে অনুনয় করতে লাগলুম, কেউ মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় কি না। কেউ রাজী নয়। মায়া সবারই আছে—কিন্তু আজকাল আর দয়া-মায়ার আবেগে সামর্থ্য-চিন্তা ছাড়িয়ে যায় না।

অত ভোরবেলা মেয়েটির জন্যে কি করা সম্ভব আমরা ভেবেই পেলাম না। বিশেষত যে-মেয়ে কোনো কথা বলতে পাবে না। বাবা মার ঠিকানা খুঁজে বার করার উপায় নেই—চেহারা দেখলে মেয়েটিকে ভালো ঘরেরই মনে হয়। অব্যক্ত-ভাবে আমরা সকলেই একথা ভাবলুম যে—এবাব আমাদেরও আস্তে আস্তে সরে পড়তে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে কি এই মেয়েটার বোঝা আমাদের ঘাড়ে চেপে যাবে ? মেয়েটি কি বুঝলে জানি না, সে বৃদ্ধটির কাপড় ছেড়ে হঠাৎ এসে আমার হাত চেপে ধরলো। কি ঠাণ্ডা আর নরম হাত, ঐ হাত ছাড়িয়ে যাবার শক্তি পৃথিবীর কারুর নেই বোধ হয়। বুঝতে পারলুম, মাড়োয়ারীটি কেন এতক্ষণ এমন অসহায় বোধ করছিল। মেয়েটি হঠাৎ ওকে ছেড়ে আমাদের এসে ধরলো। বোবা হলে কি মনের ভাষা বুঝতে পারা যায় ?

আমার হাত ধরা মাত্র তখুনি আমার মনে পড়লো পুলিসের কথা। পুলিসের হাতে তো হারানো ছেলেমেয়েদের সঁপে দেওয়া যায়। তাহলে তো মেয়েটিও বাঁচবে, বাঁচবে আমাদেরও বিবেক নামক গোলমেলে পদার্থটি।

মেয়েটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললুম আমাদের সঙ্গে, ওর ভাষা তো জানি না আমরা কেউ। মেয়েটা অনবরত গলা দিয়ে খুঁ-খুঁ করে কান্নার মতো আওয়াজ করছে। ওর চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললুম, ভয় নেই। কি বুঝলো ও-ই জানে।

থানা পর্যন্ত যেতে হলো না। কাছেই একটি কনেস্টবলকে দেখতে পেলাম। হয়তো সে সারারাত এই শীতে জেগে পাহারা দিচ্ছে। সারা মুখে মাথায় ফেট্টি বাঁধা, কান জড়ানো, শুধু চোখ দুটি আর নাকের আগাটুকু খোলা। আমরা সদলে এর সামনে দাঁড়ালুম। সারা রাত জেগে যারা একলা পাহারা দেয়—তারা সব সময় কি ভাবে, এ সম্বন্ধে আমার অনেক দিনেরই কৌতূহল। কি করে ওরা ঘুম তাড়ায়? কার যেন উপন্যাসে পড়েছিলুম, সম্ভবত দুমার, বাস্তিলের নিশ্চিদ্র অন্ধকার কারাকক্ষে একজন কয়েদী পাগল হয়ে যাবার হাত থেকে নিজেকে কি ভাবে রক্ষা করেছিল, কি ভাবে সব সময় নিজেকে ব্যস্ত রাখতো। সে ছটা আলপিন ছুঁড়ে দিয়েছিল সেই অন্ধকার ঘরে—তারপর, দিনের পর দিন ব্যগ্র হয়ে খুঁজতো সেইগুলো. অন্ধকারে, কয়েক মাস পর খুঁজে পেলে, সবকটা আলপিন আবার ছড়িয়ে দিতো; আবার খোঁজা। কলকাতার একটি পুলিস কনেস্টবল একদিন মধ্যরাত্রে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সেদিন কি তিথি। হয়তো সে প্রত্যেক রাত্রেই সে রাতের তিথি নিয়ে গণনা-গবেষণা, নিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে কাটাতো। কিন্তু, আজ যে পুলিসটির দেখা পেলুম, এর মতো দার্শনিক পুলিস আমি কখনো দেখি নি। সে অল্পক্ষণেই আমাদের চোখ খুলে দিল।

তার সামনে পুরো ঘটনাটি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বিবৃত করে আমরা তাকে অনুরোধ করলাম, মেয়েটিকে থানায় নিয়ে যেতে। পুলিসটি একটি কথাও বললো না। সোজা চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো। যেন একটি পাথরের মূর্তি। আমরা রেগে গেলাম। কড়া গলায় বললুম, 'কি, কথা কানে যাচ্ছে না?' লোকটি ধীরে সুস্থে কান থেকে তিন ফেট্টি মাফলার খুলে ফেলে বললো, 'আবার বলুন!' অর্থাৎ সত্যিই তার কথা কানে যায় নি। এবং সে বাঙালী। গোড়া থেকে আবার বলতে হলো। পুলিসটি একটুও বিচলিত না হয়ে ঠাণ্ডা গলায়, যেন একটু ব্যঙ্গের সুরে বললো, আপনারা তো যা করার করেছেন, এবার বাড়ি যান।'

—কেন? ওকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা আমরা দেখতে চাই।

—কোনো লাভ নেই।

—তার মানে?

—কি দরকার থানায় নিয়ে গিয়ে?

নম্র, সুন্দরী, অপ্রগলভা। পড়াশুনো ছাড়া মাস্টারমশাই'র সঙ্গে আর যে দু-চারটি কথা হয়, সেগুলি সরল কৌতুকের, কেউ কারুর সীমান্ত আক্রমণ করে না। বাড়ি, বুঝতেই পারা যায়, ধনী পরিবারের, এবং যুবতী কন্যার জন্য যুবক শিক্ষক নিয়োগ করা থেকে অনুমান করা যায়, আধুনিক উদার রুচিবান।

অমন হঠাৎ আলো নিবে যেতেই কিছুক্ষণ দু'জনে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। একটু পরেই মাস্টারমশাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, এখন তাঁর কী করা উচিত কিছুতেই ঠিক করতে পারলেন না। এখন কী তাঁর চলে যাওয়া উচিত? কিন্তু, যদি পাঁচ মিনিট পরেই আলো জ্বলে ওঠে? তিনি এসেছেনও মাত্র দশ মিনিট আগে। হয়তো একটু অপেক্ষা করে দেখা উচিত, আলো জ্বলে ওঠে কি না। অথচ অন্ধকার ঘরে একটি যুবতীর সঙ্গে বসে থাকা শোভন কিনা বুঝতে পারলেন না। অন্ধকার আমাদের দেশে ট্যাবু, আলাদা ঘরে যুবতী ছাত্রীকে নির্জনে পড়ানো যায়, কিন্তু অন্ধকারে বসে থাকা? ওঁর কি উচিত উঠে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ানো, অথবা বাইরে গিয়ে, অথবা মেয়েটিকে বলা, তুমি একটু বাইরে যাও! কিন্তু মেয়েটি চুপ করে বসে আছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না, একটুও টের পাওয়া যাচ্ছে না তার চোখের ভাষা। যখন দু'জনের মনেই কোনো পাপ নেই, তখন, শুধু এই অন্ধকারের জন্যই মেয়েটিকে বলা, 'তুমি একটু বাইরে যাও'—যদি খুব বিশ্রী শোনায়, যদি মনে হয় মাস্টারমশাইয়ের মনে পাপ ছিল বলেই এ কথা বললেন! যদি ওঁরা ভাবেন, লোকটা লেখাপড়া শিখেও বর্বর, সংস্কৃতিহীন, নইলে অমন ইঙ্গিত করে? শুধু বসে থাকায় কী দোষ? আমার তো কোনো দোষ নেই, মাস্টারমশাই ভাবলেন, কিন্তু এরকমভাবে বসে থাকাটাই দোষের কিনা আমি কী করে জানবো? দারুণ অস্বস্তিতে লাজুক মাস্টারমশাইর মাথা ঝিনঝিন করতে লাগলো। চেয়ারে বসে থাকা খারাপ, না উঠে যাওয়া খারাপ দেখাবে, না মেয়েটিকে উঠে যেতে বলা খারাপ—এই সংশয়ে তিনি পাথর হয়ে গেলেন।

মেয়েটি চুপ করে বসে ছিল। একবার তার চেয়ার সরাবার শব্দ হলো। চেয়ারটা সামনে টেনে আনার না পিছনে সরিয়ে নেওয়ার, তা বোঝা গেল না। মেয়েটি কী ভাবছে কেউ জানে না। হয়তো সে কৌতুকে হাসছে মিটিমিটি অথবা অনার্সের যে প্রশ্নটির নোট লিখছিল, সেটাই ভেবে যাচ্ছে মগ্ন হয়ে। মুখ দেখলেও মেয়েদের মনের কথা জানা যায় না, আর অন্ধকারে? তা ছাড়া, সমুদ্র ও অন্ধকার—এই দুই বিরাটের সামনে মেয়েরা সম্পূর্ণ বদলে যায়। অত্যন্ত চেনা মেয়েও যখন সমুদ্রে স্নান করতে নামে, তখন আর তাকে চেনা যায় না,

যেন শরীরে খেলে যায় অসংখ্য বিদ্যুৎ, অসীম রহস্যের সঙ্গে অসীমা হয়ে খেলা করে। পুরুষেরা জলে নামলেও পুরুষ, কিন্তু যে-কোনো মেয়ে জলে নেমেই জলকন্যা। তেমনি অন্ধকার। অন্ধকারে মেয়েরা কী ভাবে কেউ জানে না। সব মেয়েকেই সকালবেলা একরকম দেখতে, বিকেলবেলা আরেকরকম, কিন্তু অন্ধকারে মেয়েদের কী রকম দেখায়, আরও রূপসী না হঠাৎ খুব কুৎসিত—আজ পর্যন্ত কোনো পুরুষ জানতে পারে নি। মেয়েটি একবার শুধু বললো, উঃ কতক্ষণে যে—। মাস্টারমশাই একটা অস্ফুট শব্দ করলেন। আবার দু'জনে চুপ।

মেয়েটির মা রেফ্রিজারেটারে পুডিং জমেছে কিনা দেখছিলেন, এমন সময় আলো নিবে যেতেই তিনি ভাবলেন, শুধু কি এ-বাড়ি? তৎক্ষণাৎ শুনতে পেলেন সমস্ত পাড়া জুড়ে অন্ধকারের মধ্যে একটা সোরগোল। আজকাল যা হয়েছে কথা নেই বার্তা নেই—এই ভেবে তিনি গাড়িবারান্দার ওপরে এসে দাঁড়ালেন। উনি এখনও ফেরেন নি, এর মধ্যে এসে যাওয়ার কথা, কিন্তু গাড়ি নিয়ে যদি বেরিয়ে পড়ে থাকেন, তবে এই অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি চালানো! কিন্তু একটু বাদেই তিনি বুঝতে পারলেন, ঠিক স্বামীর জন্য চিন্তা করছেন না তিনি। অন্য একটা কী বিষয়ে যেন তিনি উদ্বিগ্ন, কিন্তু সেটা মনে পড়ছে না। কিছুতেই মনে আসছে না। ও-হো। হঠাৎ মনে পড়লো, রেবা মাস্টারমশাই'র কাছে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গেই আর কিছু না ভেবে চলে এলেন রেবার ঘরের দিকে। দরজার কাছে এসেই কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন। রেবার ঘরের দরজা খোলা, কিন্তু ভারি পরদা ঝুলছে। ভিতরে অন্ধকার, কোনো শব্দ নেই। এ সময় কী তাঁর ঘরে ঢোকা উচিত? ওদের পড়বার সময় তিনি কোনোদিন ও-ঘরে ঢোকেন না, আজ অন্ধকার হয়েছে বলেই তিনি ঢুকলে কী ওরা ভাববে না যে একটা কুৎসিত সন্দেহ এসেছে ওঁর মনে। ছি ছি। নিজের মেয়ে রেবাকে তিনি চেনেন, সেদিক দিয়ে কোনো রকম দুশ্চিন্তা নেই। আর, যে পড়াতে আসে, সেই শুভেন্দু. গরীবের ছেলে হলেও বেশ ভদ্র, কোনোদিন মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না। অন্ধকার হয়েছে বলেই ঘরে ঢুকে পড়াটা সত্যি খুব খারাপ হবে। তবু মন থেকে অস্বস্তি গেল না। তিনি তো খারাপ ভাবছেন না একটুও। কিন্তু চাকর-বাকর কিংবা পাড়া-প্রতিবেশী যদি অন্ধকার ঘরে মাস্টার আর ছাত্রী বসে আছে এই নিয়ে আড়ালে হাসি-ঠাট্টা করে! ভাবতেও তার শরীর জ্বলে গেল। একবার ভাবলেন, মেয়েকে বাইরে থেকে ডাকবেন। কিন্তু সেটা আরও খারাপ দেখাবে, ওরা ঠিক বুঝতে পারবে, ওরা কি ভাববে না যে তার মনটা নোংরা? একটা উপায় ছিল, যদি একটা মোমবাতি নিয়ে

ওদের ঘরে দিয়ে আসা যেত! সেটা খারাপ দেখাতো না। কিন্তু, পর পর ক'দিনই আলো নিবছে, রোজই মোমবাতি কেনার কথা ভাবছেন, অথচ, দিনের বেলা মনেই পড়ে না। এজন্য নিজের ওপরই রাগ হলো তাঁর। কী করবেন না ভাবতে পেরে একটু সরে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি।

খানিকটা পর মাস্টারমশাই বললেন, আর একটু দেখি, যদি না জ্বলে, আমি তা হলে চলে যাবো। মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। মাস্টারমশাই আবার বললেন, আমি এখানে সিগারেট খেলে তোমার অসুবিধে হবে ?

—কী আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরান নি কেন ? এই কথা বলে ছাত্রীটি খিলখিল করে অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগলো।

ফস্ করে দেশলাই জ্বলে উঠলো। কাঠিটা যতক্ষণ জ্বলে, ধরে রেখে, তারপর সেটা ফেলে দিলেন চায়ের প্লেটে। তারপর সিগারেট টানতে গিয়ে মাস্টারমশাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, তাঁর হাত কাঁপছে। আশ্চর্য তো, কোনো কারণ নেই, তবু। তারপরই তিনি ভাবলেন, রেবাকে এই সামান্য কথাটা জিজ্ঞেস করায় এতক্ষণ ধরে হাসছে কেন ?

৮

*****

আমাদের বাড়িতে একটা বিড়াল আছে। বিড়াল ঠিক নয়, বিড়ালী। বছর বার-চোদ্দ বয়েস হবে। এই ক'বছরে ওর বাচ্চা হয়েছে আশী থেকে একশোটা। এই বাচ্চাগুলো গেল কোথায় ? আমাদের বাড়িতে একটাও নেই।

বিড়াল অনেকে ভালবাসেন, আবার অনেকেই বিড়াল দেখলে চেয়ার-টেবিলে উঠে নৃত্য করেন। ঐ আত্মসুখ-সর্বস্ব জন্তুটাকে দেখলে আগে আমারও ঘৃণা হত। ছেলেবেলায় গুল্‌তি দিয়ে টিপ্ করা কিংবা কালীপুজোর সময় ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দেওয়া ছিল আমার প্রিয় খেলা।

আমাদের বিড়ালটা আমাদের বাড়িতে এসেছিল অদ্ভুতভাবে। রাত্তির বেলা হঠাৎ দেখি ঘরে ঢুকে আছে। তখন খুবই বাচ্চা—আমরা সকলে তাড়া করছি বার করে দেবার জন্য, একটা সাদা উলের বলের মতো বিড়ালটা ছুটোছুটি করছিল। হঠাৎ একসময় ঘরের মাঝখানে এসে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত দুখানা তুলে এমন জুল্‌জুল্ করে তাকালো যে আমরা তৎক্ষণাৎ হেসে ফেললাম। মা বললেন, থাক্, থাক্, আজ আর তাড়াতে হবে না। আমার মা বিড়াল পছন্দ করতেন না কখনও. কিন্তু বাচ্চাটা তারপর দু-তিন দিন মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরে অবলীলাক্রমে মায়ের আদর কেড়ে নিলে। বাবা ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর এবং রাশভারী। আমরা সবাই ভয় করতুম। মাঝে মাঝে বাবা জলদকণ্ঠে বাচ্চাটাকে ধম্‌কে দিতেন। কিন্তু তবুও বাচ্চাটা যেদিন নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে বাবার ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা করে বাবার থালা থেকেই ইলিশ মাছের মুড়ো তুলে নিল— সেদিন আমরা যথার্থই খুশী হয়েছিলাম। সেই থেকে বিড়ালটা আমাদের বাড়িতে রয়ে গেছে।

এক বিখ্যাত ফরাসী লেখকের উপন্যাসে পড়েছিলাম, মানুষ জন্তু-জানোয়ার পোষে নিজের অহংকারে সুড়সুড়ি দেবার জন্য। প্রত্যেক মানুষই অন্য কোনো

একজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। যাকে সে খাওয়াবে, আদর করবে এবং দরকার হলে পদাঘাত করবে। আগে ক্রীতদাসের উপর এ-রকম করা যেত। ক্রীতদাসপ্রথা উঠে যাবার পর অনেকে তখন স্ত্রীর উপর এই বীরত্ব ফলাতেন। এখন স্ত্রীরাও স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা জেনে গেছেন। বরং এখন পুরুষদেরই ক্রীতদাস বানাবার চেষ্টা তাঁদের। সুতরাং এখন জন্তু-জানোয়ারের উপরই এই ইচ্ছেটা মেটানো যায়। অনেকে মহা আহ্লাদে কুকুর বেড়াল পাখি পোষে। কুকুর পোষা তো প্রায় সামাজিক প্রথার মতো দাঁড়িয়েছে।

আমার এক বন্ধুর পোষা বিড়ালের নাম শ্বেত-করবী। নাম শুনেই ভালো-বাসার বহর বোঝা যায়। কৃষ্ণকলি, দধিমুখী, সুন্দরী এমন নামও শুনেছি। এক অপুত্রক দম্পতির তিনটি মার্জার সন্তান দেখেছি—যারা আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে খেয়ে-শুয়ে আছে।

আমাদের বিড়ালটা ঠিক পোষা নয়, বাড়িতে আছে এই পর্যন্ত। ওর নাম 'কুচু'—কেন, বা কে এই নাম দিয়েছিল, মনে নেই। নিতান্ত সাধারণ চেহারা, শরীরটা সাদা, লেজ এবং কানের কাছে কালো-খয়েরি। আমাদের গয়লার সঙ্গে ভাব জমিয়ে রোজ খানিকটা ফ্রি দুধের বরাদ্দ জুটিয়েছে, তা ছাড়া চেয়ে-চিন্তে চুরি-জোচ্চুরি করে খেয়ে খেয়ে বেশ কেঁদো শরীর হয়েছে। এক-একদিন রাত্রে চার-পাঁচটা বিড়ালের সঙ্গে মহা হল্লা করে গুণ্ডামি করে—তখন মারধোর দিই। বড় বড় ইঁদুর ধরে—কিন্তু ইঁদুর ধরা আমরা মোটেই পছন্দ করি না। ইঁদুর মারলেই সেই বীরত্ব আমাদের দেখাবার জন্য রক্তমাখা থ্যাঁতলানো ইঁদুর মুখে করে ঘরের মধ্যে, কখনও বা বিছানায় নিয়ে আসে। তখন ধরে মার দিই, মাথা নিচু করে মার খায়। এসব কিছুর পরও যখন নিতান্ত অকারণে কোনো কোনো সময় এসে পায়ে মাথা ঘষে, তখন মন্দ লাগে না।

কিন্তু আমি কুচুকে নিয়ে কিছু লিখতে বসিনি, ওর বাচ্চাগুলো সম্বন্ধে কিছু লিখতে চাই।

বছরে দু'তিনবার ওর বাচ্চা হয় এবং কোনোবারই দু'তিনটের কম নয়। এতদিনে ওর শাবক সংখ্যার শতপূর্তি হয়েছে নিশ্চয়ই। বাচ্চাগুলো বাড়িতে রাখিনি—রাখলে বাড়ির অবস্থা কি হত কল্পনাও করা যায় না। আমরা কবে উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হত সুদৃঢ় বিড়াল-সমাজ। বাচ্চাগুলো কোথায়? কয়েকটির কথা জানি, বাকিগুলোর কথা জানতেও চাই না।

যখন বাচ্চা হয়, তখন বিড়ালীর ক্রুদ্ধ এবং কাতর চোখ সত্যিকারের দেখার মতো। গর্ভিণী এখানে সেখানে ঘোরে, ছটফট করে, নিরালা খোঁজে। বাচ্চা

হবার পর বাঘিনীর মতো আগলে থাকে—তখন চোখ দেখলে হঠাৎ মনে হয় ওরও বুঝি একটা হৃদয় আছে, যা দুঃখিত কিংবা প্রীত কিংবা কৃতজ্ঞ হতে জানে।

বাচ্চাগুলি একটু বড় হলেই মায়ের টান কমে আসে। তারপর মা-টাই একদিন খাবারের ভাগ নিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়। আমাদের কুচুর খানিকটা আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। ওরই মুখের গ্রাস যখন কোনো সন্তান এসে কেড়ে নেয়, তখন ও মারামারি শুরু করে না বটে, কিন্তু গর্‌র্‌ শব্দে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে। তখন আস্তে আস্তে ওদের বিদায় করতে হয়। কখনো পুষবার জন্য নিয়ে যায় অনেকে—কেউ কেউ সত্যিই পোষে—কেউ কেউ আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তুলোর মতো নরম গা, সব বিড়াল বাচ্চাকেই প্রথমে সুন্দর দেখায়। অনেকে শখ করে বাড়িতে নিয়ে বেড়াল পোষা শুরু করতে চায়। তারা বলে, ইস্, এমন সুন্দর বাচ্চাগুলোকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে মেরে ফেলবে? না, না, আমাকে দাও। আহা, অবলা জীব।—কিন্তু প্রত্যেক সংসারেই দু'একজন থাকে যারা বিড়াল দু'চোখে দেখতে পারে না। তাছাড়া, বাচ্চারা লম্বা হয়ে, পুরুষ হলে—কদাকার ভারী মুখ নিয়ে যখন মাছ চুরি শুরু করে, তখন আর মায়া থাকে না, তখন আবার আমাদের বাড়িতে ফেরত দিতে আসে অতিষ্ঠ হয়ে। সবগুলোকেই আমরা রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসি। মেথর কিংবা ঝিকে পয়সা কবুল করে ওদের বলি দূরের কোনো পাড়ায় গিয়ে ছেড়ে আসতে। কখনও আমাকেই বাধ্য হয়ে ও দায়িত্ব নিতে হয়। মা ভাইবোনেরা প্রতিবার আপত্তি করে—কিন্তু আপত্তি শুনলে চলে না। আমাদের কুচুকে আমরা হাজার চেষ্টা করেও প্রেম করা বন্ধ করতে পারি না। এবং তিন চারমাস পর পর ওর বাচ্চা হবেই। ওদের জন্য কোনো জায়গা নেই, কিন্তু নিজের বাড়িকেও কেউ মার্জার শালা করতে চায় না। একটা মাটির ভাঁড়ে কিছুটা দুধ, কয়েক টুকরো পাঁউরুটি এবং থলিতে বাচ্চাগুলি নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি, যাবার পথে ওদের নানা রকম গল্প বলি : বলি ভয় কি তোদের এমন দেশে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে কেউ দুধের কড়াইতে ঢাকা দেয় না, পথে পথে সেখানে মাছ ছড়ানো। খুব ভালো থাকবি।

তারপর কোনো মাঠের মধ্যে নামিয়ে—ভয় কি, কোনো ভয় নেই, আমি আবার আসব—এইসব বলে বুঝিয়ে, পিছন ফিরে চোখ বুজে ছুটে পালিয়ে যাই। অনেক সময় এতদূরে নিয়ে যাই যে ফেরার সময় আমি নিজেই রাস্তা খুঁজে পাই না।

আমার বন্ধু সত্যময় একটা সুন্দর দেখে বাচ্চা বাড়ি নিয়ে গেছে। এখন ওর

নানান্ গুণপনা নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস দেখায়। কিন্তু ওর যে কতবড় ভবিষ্যতের ক্ষতি হলো একথা ভেবে আমি মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করি। কারণ, ওরটাও মাদী বেড়াল!

যখন চোখ ফোটে না, তখন বাচ্চাগুলিকে ভারী নিষ্পাপ দেখায়। যখন একটু বড় হয়ে সারা বাড়িতে খেলে বেড়ায়, নীল কালির ফোঁটার মতো চোখ তুলে তাকায়, পরস্পর দাঙ্গা করে, অকারণে দৌড়োয়—তখন যাতে ওদের প্রতি কোনোক্রমে মায়া না পড়ে যায় তার চেষ্টা করি। যে-কোনো শিশুই সুন্দর—কারণ তারা যুক্তিহীন।

বাচ্চা হবার পর কয়েকদিন ওদের মা অনেক গম্ভীর হয়ে যায়, চুরি জোচ্চোরি করে না! গর্-র গর্-র করে ওদের সহবৎ শেখায়, টুঁটি ধরে এখানে সেখানে নিরাপদে নিয়ে যায়, সমস্ত শরীর পরিচ্ছন্ন করে। তারপর অল্প কিছুদিন পরই ওদের দূর করে দিয়ে আসতে হয়—যখন ওদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা যায় না। আমার কাকা অফিস যাবার জন্য পাটভাঙা জামাকাপড় পরে খেতে বসেছেন—এমন সময় উড়ন্ত কোনো পোকা ধরবার জন্য ঝাঁপ দিয়ে একটা বাচ্চা সোজা এসে পড়ল মাছের ঝোলের বাটিতে। খাওয়া তো নষ্ট হলোই, ঝোল ছিটকে জামাকাপড়ও গেল। এই রকম অসংখ্য। অথচ বাচ্চাটাকে মারলে, ও তার কারণই বুঝবে না, অসহায় সারল্যে তাকিয়ে থাকবে।

বিদায় করে দিলেও দু'একটা পথ চিনে ফিরে আসে। তখন আবার ফেলে আসতে হয়। আবার আসে, আবার ফেলতে হয়। সে এক অসহ্য অভিযান! ফিরে আসবার কি এক পরম দাবি ওরা বোধ করে—বুঝতে পারি না। যেখানে ওদের ফেলে আসা হয়—কিছুদিন আমি সে-পথ দিয়ে হাঁটি না—কোনো দিন ভুল করে গিয়ে পড়লে মিঞাও মিঞাও ডাক শুনে চমকে পালিয়ে যাই। কোনো দিন আর দেখতে পাই না,—কোনো বিড়ালহীন গৃহে দৈবাৎ ওরা স্থান পেয়েছে এই ভেবে খুশী হবার চেষ্টা করি। কোনো দিন হয়ত দেখি বাচ্চা ছেলেরা ল্যাজে দড়ি বেঁধে টানাটানি করে খেলছে। আমি ধমকে ছাড়িয়ে দিই—তাও খুব নৈর্ব্যক্তিক ভাবে। বুঝতে দিই না, আমারই বাড়ির বাচ্চা। তাহলে যদি ফিরিয়ে দিতে আসে! ছেলেদের ধমক দেবার সময়ে গলায় জোর পাই না, কারণ ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে—ওদের কোন নিরাপদ জায়গায় রাখব তা তো জানি না।

বাচ্চা হারাবার পর মা-বিড়ালী কয়েকদিন কি কাতরভাবে কেঁদে কেঁদে ঘোরে—সেই কথা মনে পড়ে। কিন্তু কি করব, আমার কিছু করবার নেই।

এক একদিন দেখি, রাস্তার মাঝখানে একটা বেড়াল বাচ্চা গাড়ি চাপা পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে মরে পড়ে আছে। সেই সুন্দর কচি শরীরটা এখন কি ভয়ংকর। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াই। আমার ছোট বোন এই বাচ্চাটাকে কত ভালোবাসত, মনে পড়ে। রাত্তিরে আমার পায়ে কত খুনসুটি করেছে এই বাচ্চাটা, আমার মা এক একদিন নিজে না খেয়ে সম্পূর্ণ দুধের বাটিটা ঠেলে দিয়েছেন এদের দিকে। একথা ভেবে তৎক্ষণাৎ সরে পড়ি।

তারপর যে-রাস্তায় যাই, শুনি মিউ মিউ। তাকিয়ে দেখি, আমাদের বাচ্চা কি না। না। অন্য কোথাও গেলেও সেই মিউ মিউ। কলকাতার গলিতে গলিতে। আমাদের বাড়ির বাচ্চা কিংবা তার বাচ্চার বাচ্চা কিংবা কয়েক হাজার অন্য বাচ্চা। হয় ট্রাম লাইনের পাশে থ্যাঁতলানো অথবা অসহায় ভাবে ঘুরছে। বৃষ্টির সময় দেখি ভিজে জড়সড় হয়ে এক কোণে বসে কাঁপছে, কাকগুলো জ্যান্ত শরীরেই ঠোকরাতে চাইছে। আমাকে পালিয়ে যেতে হয়—কারণ আমার কিছু করবার নেই। আমি ওদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারবো না।

যুদ্ধের সময় বোমার শব্দে পাগল হয়ে লণ্ডনে বার হাজার বিড়াল পথে পথে ঘুরেছে—কাগজে এ খবর পড়েছিলাম। কলকাতার পথে পথে অসংখ্য মার্জার-শিশুর ডাক আমাকে না পাগল করে দেয়!

৯

*****

পিছন থেকে কাঁধে টোকা মারতেই লোকটি চমকে উঠলো। সঙ্গের মেমসাহেবটি বললো, টেক কেয়ার ডার্লিং।

লোকটি রেলিং-এর ওপর বেশ কায়দায় ব্যালেন্স করে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরেছিল। দূরে এক বুড়ি শুয়ে আছে ফুটপাতে, বোঝা গেল লোকটির ক্যামেরার একচক্ষু ঐ দিকেই। বললুম, ভিখিরির ছবি তুলছো বুঝি? যাঃ—এটা কি একটা সাবজেক্ট হলো?—চলো, তোমায় ভালো ভালো ভিখিরির জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।

লোকটি তাড়াতাড়ি রেলিং থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ক্যামেরাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করলো। আমি বললাম, কি, আর ছবি তুলবে না? আমি তোমাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাবো।

মেমসাহেবটি বললো, আর য়ু সীরিয়াস?

একগাল হেসে বললুম, তা না তো কি? তোমরা সাহেব-মেমরা এসে কি ছবি তুলতে চাও, আমি জানি না? তোমরা নিজেরা কি সে সব খুঁজে পাবে? চলো, আমি আসল আসল জায়গায় নিয়ে যাবো। কি একটা বুড়ির ছবি তুলছো? —এ কি আর কলকাতার ভিখিরির ছবি হলো? ফিরে গেলে তোমার দেশের লোক বিশ্বাস করবে? মনে করবে ফেক্, গেট আপ। সত্যিই যে ভারতবর্ষে এসেছিলে, তার প্রমাণ দিতে হবে তো! আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবো—

—তুমি প্রথমটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। সাহেবটি বললো, আমাদের এমব্যাসীর লোক বলে দিয়েছে—ভিখিরি-টিখিরির ছবি তুললে—অনেক সময় এখানকার লোক ক্ষেপে যায়। ক্যামেরা কেড়ে নেয়, অনেক সময়—

—তা হলে তো প্রাণ হাতে করে ছবি তুলছো, বলো! তা ক্যামেরা-ট্যামেরা

কেড়ে নেয় অনেক সময় ঠিকই। মারধোরও করে। তা ছাড়া সাধু কিংবা যোগীরা অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে দিতে পারে। সাপুড়ে গায় সাপ ছুঁড়ে দিতে পারে—

—যাঃ, ওসব নিশ্চয়ই গল্প।

—মোটেই না। সাপুড়ে আর যোগীরা কলকাতায় ঘুরে বেড়ায় এটা গল্প? মোটেই না—বিশ্বাস করো! আজ হয়তো এক্ষুনি দেখতে পাবো না। তু'এক দিন সময় পেলে তোমায় নিশ্চয়ই ক্যামেরার ফুটো দিয়ে দেখিয়ে দিতুম—প্রকাশ্য রাস্তায় সাপ খেলানো হচ্ছে। ভালুক নাচ-ওলা তুপুরের রোদে ভালুকের গায় হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে গাড়িবারান্দার নিচে। বাঁদর নাচও অহরহ। গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য সাধু আর যোগী। যাই হোক, তোমাকে এক্ষুনি যা দেখাতে পারবো—তাও কম নয়। আমি সঙ্গে আছি—ভয় নেই। তুমি টেলিভিসন্ না সিনেমার—

—ওসব কিচ্ছু না। আমি শুধু নিজের কালেক্শানের জন্যে। জানো তো ছবি তোলার বিষয় নতুন না হলে ভালো লাগে না। কলকাতার এই সব বাড়ি ঘর বা অন্য কিছু নতুন কি আর। বরং এই রকম রাস্তায় লোক শুয়ে থাকবার দৃশ্যই আমাদের কাছে নতুন।

—নিশ্চয়ই। এসো আমার সঙ্গে। গাড়িতে হবে না হেঁটে যেতে হবে। এসো, মেম-সাহেব।

লোকটি বৃষস্কন্ধ, শালভুজ, ফরসা দৈত্য একটি। কোন্ দেশের জিজ্ঞেস করিনি। সব সাহেবই আমার কাছে সমান। মেমটি এমন রংচঙে পোশাক পরেছে—যেন একটা হীরামন পাখি। এমন আলতোভাবে হাঁটছে যেন শরীরটা হাল্কা তুলোর মতো। স্বাস্থ্য আর রূপে ঝলমল করছে তু'জন। সেই সঙ্গে ঐশ্বর্য। এমন চমৎকার সংসর্গে কিছুক্ষণ কাটালেও মনটা ভালো লাগে।

আমি প্রথমেই ওদের নিয়ে গেলুম মৌলালির মোড়ে। সেখানে একটি কুষ্ঠ-রোগী বসে, জানতুম। কুষ্ঠরোগী হিসেবে একেবারে নিখুঁত, শরীরের অধিকাংশ জায়গাতেই ব্যাণ্ডেজ জড়ানো, শুধু একটা হাত আর মুখটুকু খোলা। সেখানে দগ্‌দগ্ করছে ঘা। একটা কাঠের বাক্সে বসে থাকে—আর একটি বাচ্চা ছেলে সেটা টানতে টানতে ভিক্ষে চায়। মেমটি স্বামীর বাহু চেপে ধরে অস্ফুট গলায় বললো ও মাই—নো, নো, !

আমি বললুম, কি রকম সাবজেক্টটা? ভালো না? আগে এরকম আর পেয়েছো?

লোকটি বিনা শব্দে পরপর তুটো স্ন্যাপ নিল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বললো, ইনক্রেডিবল।

আমি বললুম, চলো কাছেই আর একটা জায়গায়! সেখানে পাবে, যাকে তোমাদের ইংরেজীতে বলে, 'চোখের ভোজ'। শিয়ালদার দিকে এগোলুম। যাবার পথেই অবশ্য ফাউ হিসেবে আর একটি উত্তম বিষয় পাওয়া গেল। বউ-বাজারের মোড়ের কাছে সেই খোঁড়া ষাঁড়টি, প্রায়ই যাকে দেখি, পিছনের পা টেনে চলে, ভারী শান্ত মুখখানি, অনেকটা—বাবুর মতো। ষণ্ড প্রভু তখন যে প্রাকৃতিক কাজটি প্রকাশ্য রাস্তায় করছিলেন, তার জন্য সবচেয়ে ভদ্র শব্দ বোধ হয়, ডিহাইড্রেটিং। ক্যামেরা গোটাবার পর সাহেবটিকে জানালুম, এটা সে সত্যিকারের একটা দুর্লভ দৃশ্য পেয়েছো। কারণ, এক সময় যদিও কলকাতার পথঘাট ছিল ষণ্ডদের কৃপার অধীন, কিন্তু এখন অনেক সরিয়ে ফেলা হয়েছে, পুণ্যার্থীদের এখন অনেক খুঁজতে হয় ওদের দর্শন পাবার জন্য।

শিয়ালদাতে মনের মতো দৃশ্যই পাওয়া গেল। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো কোনো-ক্রমে দৈবাৎ প্যাণ্ট-জামা পরে ফেলেনি! যথারীতি উলঙ্গ হয়েই ছোটাছুটি করছিল। সাহেব-মেম দেখে সকলে এসে ভিক্ষের জন্য ছেঁকে ধরলো। দুপুরের সময় খুপরি ঘরগুলোর সামনে উনুন জালিয়ে ছাইভস্ম রান্না শুরু হয়ে গেছে, কঙ্কালসার বুড়ো-বুড়িরা গড়াগড়ি দিচ্ছে মাটিতে, যুবতী মেয়ে নেই একটিও। চতুর্দিকে একটা বিশ্রী ভাপ্‌সা গন্ধ। পাশ দিয়ে সুবেশ ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা ট্রেন ধরতে বা ট্রেন থেকে নেমে সবেগে ছুটে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে একটা অত্যন্ত নিস্পৃহ আবহাওয়ার জন্যই দৃশ্যটি অসাধারণ। বললুম, তোমার মুভি ক্যামেরা আনা উচিত ছিল!

—এরা কারা?

—নাম শোনোনি? পূর্ব বাংলার রিফিউজি। এ আর কটা দেখছো—এ যাবৎ সব মিলিয়ে এসেছে পঁচাত্তর লক্ষ অর্থাৎ সাড়ে সাত মিলিয়ান। তুলে নাও ছবি।

এরা জন্তুর মতো এরকমভাবে থাকে! এরাও তো আফটার অল, মানুষ! —এদের থাকার ব্যবস্থা করা যায় না?

—এই তো চমৎকার ব্যবস্থা। তুমি কি ভাবছো, এ দেশের আদি বাসিন্দারা সবাই এর চেয়ে ভালো আছে? এখনো তো বস্তিগুলো দেখোনি। তাও দেখাবো!

রাস্তায় বেরিয়ে কিছু দূর হাঁটবার পর লোকটি নিজেই আমাকে একটা দৃশ্য দেখালো। একটা বাড়ির সামনে বিরাট লাইন পড়েছে। ঠেলাঠেলি, হট্টগোল, পাশে লাঠি হাতে সেপাই। লোকটি বললো, ও কিসের কিউ?

বাড়িটা দেখে তো- সিনেমা থিয়েটার বলে মনে হয় না? তবে কি কোনো মিউজিয়াম?

আমি সেদিকে তাকিয়ে বললুম, না, তবে ওটার ছবি তুলে লাভ নেই।

—কেন?—লোকটি ভাবলো, আমি বুঝি কোনো কিছু গোপন করছি।

বললুম, ওরকম লম্বা লাইন তো তোমাদের দেশেও পুড়ে শুনেছি সিনেমা থিয়েটারে। সুতরাং লাইনের ছবি আর নতুন কি? আসল জিনিসটা তো আর বোঝাতে পারবো না! ওখানে রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে।

—তা দিয়ে কি হবে?

—ঐ কার্ড দেখিয়ে খাবার পাওয়া যাবে।

—ইউ মীন, ফ্রি? মেমসাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

ওদের মূর্খতা দেখে হাসি চেপে রাখা কষ্ট। অথচ মুখের ওপর হো-হো করে হেসে ওঠা ভদ্রতা নয়। তাই বললুম, কেন, তোমাদের দেশে কি খাবার-দাবার বিনা পয়সায় পাওয়া যায় নাকি? কি এমন দেশ থেকে এসেছো হে?

—না না না। তবে পয়সা দিয়ে খাবার কেনার জন্য অতখানি লম্বা লাইন? সেটা দেখেই একটু অবাক লাগছে। কোনো বিশেষ খাবার-টাবার নাকি? সী ফুড, অর···

—নাঃ! স্রেফ চাল গম। যাক ও নিয়ে সময় নষ্ট করো না। দৃশ্য হিসেবে এটাতে কোনো মজা নেই।

মেমসাহেবকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আমি আর সাহেবটি চট্ করে একটা বস্তির মধ্যে একপাক ঘুরে এলুম। সেও খুব চটপট ছবি তুলে এনেছে, বেশ পাকা হাত। সহস্র সচকিত চোখকে প্রশ্রয় দিয়ে আমরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে চাইনি। অবশ্য, খুব সহজে কাজটা মেটেনি। বস্তির মধ্যে কাঁচা নর্দমা উপচে উঠে গলিটা ছপ্‌ছপে হয়ে উঠেছিল কাদা, এঁটো-কাঁটা, আরও কয়েকটি তুরুচ্চার্য ময়লায়। আমি চটি জোড়া খুলে হাতে নিয়েছিলাম, বাইরে এসে চাপাকলে পা ধুয়ে নিলাম। কিন্তু বিদেশীটির জুতো জোড়া কাদায় মাখামাখি। আমি সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করলুম। বললুম, তুমি বলছিলে তুমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলে। তা হলে, নিশ্চয়ই জানো, ভারতবর্ষ কতবড় সভ্য দেশ—পাঁচ হাজার বছর আগেও আমাদের মহেঞ্জোদারো, হরপ্পার মানুষরা নর্দমা ব্যবহার করতে জানতো। এবং মজা কি জানো—পাঁচ হাজার বছর পরেও আমাদের নর্দমাগুলো মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মতোই আছে অবিকল। ঐ যে দেখলে গরুর গাড়ির জন্য ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। কিন্তু এ-কথা কি জানো—আমাদের দেশের লোক

যখন প্রথম গরু দিয়ে গাড়ি টানতে শেখে—তখন তোমরা কোথায় ছিলে? তোমরা তখন গুহায় থাকতে কিংবা গাছের ডালে বাঁদর হয়ে ঝুলতে! কিন্তু আমরা এখনও গরুর গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে!

বিদেশীটি বললো, ওয়েল নীল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু, আজকের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। আমার স্ত্রী অসুস্থ বোধ করছেন। এবার হোটেলে ফিরবো ভাবছি। মেমসাহেবটি এক পাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সত্যি এতখানি হাঁটাহাঁটি বোধ হয় জীবনে করে নি। সোনার অঙ্গে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। টস্‌টস্‌ করছে চোখ দুটো। আমার হাত ধরে বেশ আন্তরিকভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বললো, সত্যি, তুমি নিজের কাজ নষ্ট করে আমাদের সঙ্গ দিলে। অনেক ধন্যবাদ। এবার যাই।

—সেকি! এর মধ্যেই চলে যাবে? আমি তো আরও কত জায়গায় নিয়ে যাবো ভেবেছিলাম। দেখাতুম শ্মশানে মড়া পোড়ানো সাধু-সন্ন্যাসী—খাঁটি 'ইয়োগী', রেড ল্যাম্প ডিস্ট্রিক্ট—হাজার হাজার মেয়ে যেখানে নিজেদের দেহ পণ্য করছে, আরও দেখাতুম রাত্তির বেলা রাস্তায় সারবেঁধে কি করে লোকেরা ঘুমোয়—অর্থাৎ যা তোমরা এ দেশ সম্বন্ধে শুনে আসো, সত্যি সত্যি সেই সব জিনিস। আরও অনেক বিচিত্র জিনিস দেখাতুম—অফিস-ফেরত ট্রাম-বাস, কলকাতার পাঁচ মাইলের মধ্যে মশার ঝাঁক···। দুঃখ রয়ে গেল, তোমাদের সাপ-খেলা বা ভালুক-নাচ দেখাতে পারলুম না। কিন্তু সত্যিই ওসব এখনও আছে, বিশ্বাস করো।

মহিলাটি খুব কোমল গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার দেশের এ-সব খারাপ জিনিস আমাদের দেখাতে চাইছো কেন?

—খারাপ ভালো জানি না। আমাদের কলকাতায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক কোনো স্মৃতিচিহ্ন নেই, সমুদ্র পাড় নেই—ঠিক দেখার জিনিস কিছু নেই। এই সবগুলোই আসলে দেখার। এ দেশে আয়রন কার্টেন নেই—তোমরাও যা খুশী দেখতে পারো—শুধু বিদেশে যাতে বেশী ঘোরাঘুরি করতে না হয়, তাই আমি সাহায্য করছিলুম।

—কিন্তু এ-সব ছবি দেখালে বিদেশে তোমাদের দেশের দুর্নাম হবে, মনে করো না?

মোটেই না। এ দেশের যা সত্যিকারের চেহারা, তা লুকিয়ে লাভ কি? ভারতবর্ষ বলতে কি শুধু তাজমহল আর অজন্তা-ইলোরা আর কোনারক-খাজুরাহো? এ দেশে অসংখ্য ভিখিরি আর উপোসী মানুষ আছে, তা কি গোপন

ছিলাম। মফঃস্বলমুখী বাসে বিবর্ণ এবং পিষ্ট চেহারার মানুষের ভিড়ে এই মেয়েটিকে মনে হলো আকস্মিক প্রাপ্তির মত। বেদেনী না-হলেও আমি তাকিয়ে থাকতুম। কোনো সুন্দরী মেয়ের দিকে খোলাখুলি তাকাতে আমার লজ্জা করে না।

…বাস রোক্‌কে, এখানে নামিয়ে দাও, উল্টোদিক্‌কা বাস্‌মে উঠো…কিছু লোক চেঁচিয়ে উঠল। ব্যারাকপুরের দিকে কালীঘাট কোথায়! বাস থেমে গেল, মেয়েটি একটি বিচিত্র ভ্রূভঙ্গী করে সতেজ পায়ে নেমে গেল। যেন কালীঘাট পৌঁছোনো সম্বন্ধে তার কোনো দ্বিধা নেই।

আমি ছটফট করছিলাম। যেন আমার বুক থেকে কোন এক অস্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করছিলাম আমি। জানলা দিয়ে অনেক-খানি মুখ বাড়িয়ে ছিলাম, তারপর বাস একটু চলতে শুরু করতেই আমি যেন আমার কোনো বন্ধুকে দূরে দেখতে পেয়েছি, এই ভঙ্গী করে তৎক্ষণাৎ বাস থেকে ছিটকে নেমে পড়লুম।

আমার পরিধানে ভদ্র পোশাক, দাড়ি কামানো চক্‌চকে মুখ, কোন গম্ভীর কার্যে ব্যারাকপুর যাচ্ছিলাম। কিন্তু এই অস্বাভাবিক মেয়েটি কেন এই অসময়ে, এইখানে বাসে উঠেছিল এবং কোনোদিনও সে কালীঘাটে পৌঁছুবে কিনা—একথা জানবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছে বোধ করলুম। মনে হলো, একথা জানতে না পারলে, এই কৌতূহলের অসুখে আমাকে বহুদিন ভুগতে হবে।

চক্‌চকে কালো পিচ ঢালা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। রোদ্দুর তার দেহের চেয়েও ছোট ছায়া ফেলেছে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মেয়েটি হঠাৎ বাঁ পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে এক পাক ঘুরে গেল—তারপর অকারণে রাস্তার অন্যপারে চলে গেল এক ছুটে।

একি, আবার ও ব্যারাকপুরের বাসে উঠতে চায় নাকি? আমি একটু দূরে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, রাস্তার প্রত্যেকটি লোক ভেবে নিয়েছে যে আমি মেয়েটির জন্য দাঁড়িয়ে আছি, এখন রাস্তার ওপারে মেয়েটির কাছে আর যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দূরে একটা বাস আসছে। আমি চোরা চোখে চেয়ে দেখলুম, নর্দমার ধারের একটি বনতুলসীর ফুলহীন ডাঁটা ভাঙবার চেষ্টা করছে সে। হঠাৎ চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়েই প্রায় ছুটে এপারে এল, এবং সদ্য থামা বাসে উঠে পড়ল। অন্য দরজা দিয়ে উঠলুম আমি। ওর দিকে সোজা মুখ করে বসলুম।

—কাঁহে নেই কালীঘাট যায়গা?

এবার কণ্ডাক্টারের প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে সে দৃপ্ত ভঙ্গীতে রুখে উঠল। যেন রাস্তায় দুদিকের কোন দিকের বাসই কালীঘাট যাবে না—এ ত্রুটি সে সহ্য করবে না। সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং কণ্ডাক্টার তাকে বুঝিয়ে দিলে যে শ্যামবাজার গিয়ে বাস বদল করতে হবে। এটুকু বোঝাবার জন্য তাদের অনেক বাক্যব্যয় করতে হল, যতক্ষণ না বাস শ্যামবাজারের এসে থামল।

তখন শ্যামবাজার অঞ্চল মানুষের ভিড়ে লিবিয়ার জঙ্গলের মত। সেখানে মেয়েটিকে বড় সামান্য এবং অসহায় মনে হয়। প্রথম দর্শনেই আমি মেয়েটির প্রেমে পড়ে যাই নি। মেয়েটিকে কেন্দ্র করে কোনো রোমান্টিক কল্পনা আসেনি। কেন আমি মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে এসেছি নিজেও জানি না। শুধু ভেতরে ভেতরে একটা অস্বস্তি হচ্ছে, মেয়েটির যেন ভুল জায়গায় না পৌঁছোয়।

আমার ইচ্ছে হয়েছিল, মেয়েটিকে যত্ন করে কোনো কালীঘাটের বাসে তুলে দিই। কিন্তু তখন উল্টে আমার এই ভয় হচ্ছিল যে, যদি সে আমায় চিনে ফেলে কোনো কথা বলে, কোনো মিনতি কিংবা আদেশ করে, কিংবা চেঁচিয়ে উঠে আমাকে গালাগালি দেয়, তবে আমার ভদ্রপদবী বিচলিত হবে, এক হাজার লোক আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসবে। আমি চোরের মত মেয়েটির পিছন পিছন আসতে লাগলুম নিঃশব্দে।

ততক্ষণে অফিস যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়েছে। হৌসের বাবুরা পানের ডিবে হাতে করে ধীর স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করছে গাড়ির। জামার কলার চকচকে ইস্ত্রি করা, সকলেরই ভিজে মাথায় চিরুনির চিহ্ন আছে। কেরানীরা জামার হাতায় বোতাম লাগাতে ভুলে গিয়ে পরস্পর অনেক কথা বলাবলি করছে। শোভন পোশাকে সজ্জিত হয়ে মেয়েরা ধীর স্থিরভাবে একটু বাদেই প্রচণ্ড ভিড়ের হুল্লোড় ছিনিমিনি খেলার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। ট্রাম-বাসের পাদানিতে পা রাখবার জন্য পরম যত্নে শাড়িটা একটু উঁচু করা।

এই প্রসঙ্গে বেদেনী মেয়েটির উপস্থিতি বিরল ব্যতিক্রমের মত। ফুটপাতের রেলিঙে পা তুলে সে ঘাগরার হাঁটু পর্যন্ত তুলে পরম অভিনিবেশ সহকারে পা চুলকোচ্ছে এবং কোনো ব্যথার জায়গায় হাত বুলোচ্ছে। তারপর সে মাথা থেকে একটা উকুন বার করে দুই বুড়ো আঙুলের নখে টিপে শব্দ করে মেরে—নাকের কাছে হাত এনে রক্তের গন্ধ শুঁকলো। তারপর পিছন ফিরে হঠাৎ তীব্র চোখে আমার দিকে চেয়ে একটা বাসে উঠে পড়ল।

আমি শিউরে উঠলুম, এবং বলবার চেষ্টা করলুম, ও বাস নয়, ও বাস কালীঘাট যাবে না, হাওড়া যাবে। বলা হল না। মাথা দিয়ে ঢুঁ-মেরে ভিড়

সরিয়ে নির্বিকারভাবে মেয়েটা ভিতরে ঢুকে গেল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমাকে এখন জরুরী গম্ভীর কাজে ব্যারাকপুর যেতে হবে। সারাদিন এক ছাঁচের এক মাপের মানুষের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করতে হবে। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে, কোনোদিন কালীঘাট পৌঁছবে কিনা, সকালবেলা কোথা থেকে ও এসেছিল—এই না-জানা রহস্যগুলি আমাকে যাবার পথের একা বাসের জানলার চারপাশের অন্যসব দৃশ্যগুলি সম্পর্কে অন্ধ করে রাখবে নাকি? এই বি-পথে যাওয়া মেয়েটির ছবি আমাকে আরও কতদিন জ্বালাবে কে-জানে!

১১

*****

আমাদের দু'জন বন্ধু এম-এ পাস করে এখনও বেকার। প্রায়ই দুপুরের দিকে আমাদের আপিস-টাপিসে এসে বলে, 'আহা, তুমি একা একা টিফিন খাও, তাই সঙ্গ দিতে এলাম।' বন্ধু দুজনেই বহু গুণের আকর, তবুও তাদের চাকরি না-পাওয়ার একগুঁয়েমিতে আমাদের অবাক লাগে। ওদের আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডিগ্রী যখন আছে, তখন কলেজ বা স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি কেন অন্তত খুঁজে নেয় না। কলেজে না হলেও, স্কুলের চাকরি এখনও তো খুব দুর্লভ নয়। দুই বন্ধুর উত্তর দু'রকম।

প্রথম বন্ধুর বাবা, ঠাকুর্দা প্রভৃতি সকলেই শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বছর আগে ওর বাবা রিটায়ার করবার আগেই মারা গেছেন। আমরা শ্রাদ্ধের সময় চাঁদা দিয়েছিলাম। বন্ধুটি বললো, কি করবো ভাই আমার তো ইচ্ছে আছে, কিন্তু মাতৃআজ্ঞা!

—সেকি!

—মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে, একেবারে খেতে না পেলে বরং দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির সামনে বসে লোকের জুতো রেখে পয়সা নেবো, কিন্তু মাস্টারী নিলেই মায়ের অভিশাপ লাগবে!

দ্বিতীয় বন্ধুর উত্তরটি একটু ঘোরালো। বললো, 'ইস্কুল-কলেজের জীবনে কোনো একজন শিক্ষকেরও নাম মনে করতে পারিস, যিনি যথার্থ শ্রদ্ধেয়?' আমরা যখন ঠিক কোন্ নামটি বলবো ভেবে ভুরু চুলকোচ্ছি, তখন সে বললো, 'তোরা হয়তো পারিস, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি পারি না। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে কত মহৎ শিক্ষকের কথা শুনেছি, কিন্তু তাঁদের ক্ষীণছায়াও আমি মাইরী দেখিনি আমার গোটা ছাত্রজীবনের কোনো শিক্ষকের মধ্যে। সকলের বিরুদ্ধেই আমার অভিমান আছে। কেউই আমাকে বই-পড়ানো ছাড়া একটুও

শিক্ষা দেন নি। এমন কারুকে দেখি নি যাঁর জীবন আমার কাছে মনে হতো অনুকরণের যোগ্য। রচনা লিখতে দেবার নাম করে ক্লাসে ঘুমোনো, ছাত্রদের ছলে-বলে-কৌশলে নিজের কোচিং-এ ভর্তি করার চেষ্টা, নিজের লেখা নোটবই গছানো, শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে 'বখাটে' হয়ে গেছি অপবাদ পাওয়া—এইসব। দেবতুল্য চেহারা ও কণ্ঠস্বরের এক মাস্টারমশাই ছিলেন আমাদের স্কুলে, তিনিও—আমি অঙ্কে ফেল করেছিলুম টেস্টে, কিন্তু তার জন্য ভাড়া-বাড়ি যোগাড় করে দেওয়ায়—আমাকে ষাট নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও ওঁদের মতই হয়েছি। আমি খুব ভালো কেরানী বা অফিসার হতে পারি, এমন কি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারতুম, কিন্তু কারুকে কিছু শেখাবার কোনো সম্বল নেই। আমি আদর্শবাদী নই, জীবনে হয়তো অনেক অন্যায় করতে হবে—কিন্তু ছোট ছেলেদের ঠকাতে চাই না। বাচ্চাদের, চোখকে আমি ভগবানের চেয়ে বেশী ভয় করি।'

এ সব সত্ত্বেও আমাদের পরিচিত বহু শিক্ষক আছেন। অনেকে নিশ্চিত সুশিক্ষক। অপর এক বন্ধু, আগাগোড়া সমস্ত পরীক্ষায় ফার্স্ট হতেন, তিনি অনায়াসে আই. এ. এস. হবার লোভ সংবরণ করে স্বেচ্ছায় শিক্ষক হয়েছেন। সুতরাং আমরা উনিশে জানুয়ারী শিক্ষকদের নীরব মিছিল দেখতে গিয়েছিলাম।

কথা রেখেছিলেন শিক্ষকরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শান্ত শোভাযাত্রা। স্লোগান নেই, জিগীর নেই। অর্থাৎ ছাত্রদের মিছিল থেকে নিজেদের তাঁরা আলাদা রাখতে পেরেছিলেন। অনেক শিক্ষক তো কিছুদিন আগেই ছাত্র ছিলেন কিংবা এখনো ছাত্র, (প্রাইভেটে অনার্স বা বি টি ক্লাস বা রাত্তিরে এম-এ পড়া) কিন্তু ছাত্রজীবনের অভ্যেস এখানে কাজে লাগেনি। অর্থাৎ তাঁদের নীরব মুখের ভাষা থেকে বুঝতে পারা যাবে তাঁদের দাবি ও অভিযোগ। অবশ্য মুখ দেখে বোঝা যায় না। কারণ সব মিছিলেই যা হয়, সব সমস্যা মুছে গিয়ে সেখানে এক মাত্র সমস্যা হয় লাইন ম্যানেজ করা। দু'জন দু'জন করে যান···ওকি ওখানটায় ফাঁক পড়ে গেল যে···ভিতর দিয়ে লোক যাচ্ছে কেন···দৌড়ে মেক আপ করুন··· ইত্যাদি। সুতরাং পোস্টার ও ফেস্টুন ছিল।

অফিস ফেরত লোকেরা মিছিল দেখলেই তিরিক্ষে হয়ে যায়। তা দুনিয়ার যে-কোনো সমস্যা নিয়েই মিছিল হোক না। অবশ্য, দু তিন ঘণ্টা থেমে-থাকা ট্রাম-বাসের নিশ্বাস আটকানো ভিড়ে চেপটে থাকা খুব সুখকরও নয়। কিন্তু শিক্ষকদের মিছিলের জন্য রাগ করতে দেখি নি। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি হোক—এটা যেন প্রত্যেকেই চায়। সমবেদনায় অনেকের উক্তিও বেরিয়ে এলো :

শেষ পর্যন্ত মাস্টারদের মান খুইয়ে পথে নামতে হলো! কবে দেশের…। যদিও যিনি এ কথা বললেন, তিনিই হয়তো নিজের ছেলের গৃহশিক্ষককে পরীক্ষার পরের ছুটির মাসে মাইনে দিতে চান না। কিন্তু এগুলো সামান্য মানবিক ত্রুটি। যেমন দেশের সমস্ত মানুষেরই প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়া উচিত—এ কথায় যিনি অটল বিশ্বাসী তিনিও যে নিজের বাড়ির ঝি-চাকরের লেখাপড়া শেখার কোনো ব্যবস্থা করবেন, তার কোনো মানে নেই।

ছাত্ররা রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে ধর্মঘট মিছিল করে লেখাপড়া গোল্লায় দেয়, বিভিন্ন প্রদেশে তারা হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। তাদের নিবৃত্ত করার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকদেরই—এতে কারুর সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজে সন্দেশ খেয়ে অপরকে সন্দেশ খেতে বারণ করা যায় কি? আজ শিক্ষকরাই ধর্মঘট-মিছিলে নেমেছেন, শক্ত গলায় জানিয়েছেন পরীক্ষার হলে গার্ডও দেবেন না। এতে ছাত্ররা নিজেদের দুষ্টুমির খোরাক পাবে নিশ্চিত। তারা বলবে, আরে যা-যা, স্যাররা নিজেরাই স্ট্রাইক করছে, আর আমরা পারি না! সুতরাং, শিক্ষকদের এই আন্দোলন সম্পর্কে মিশ্র অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগের দাবি প্রত্যেকটা সত্যি, কোনো বিবেকবান লোক তা' অস্বীকার করতে পাবেন না। ভিড়ের মধ্যে শোনা যাচ্ছে: 'মাস্টারদের এতটা না করলে কি চলতো না?' 'না হলে ওদের কোনো দাবি মিটবে?' এতটা চরম পথ না নিয়ে শিক্ষকরা যদি আরেকটু অপেক্ষা করতেন, সহ্য করতেন—এই-ই বেশীর ভাগ লোকের মনে মনে ইচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীও বলছেন, তিনি শিক্ষকদের দাবি ন্যায়সঙ্গত বলে মানেন, কিন্তু এখন যে আর টাকা নেই, সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত অপেক্ষা না করলে—। ভিড়ের মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়: 'কিন্তু মশাই তাকিয়ে দেখুন ওদের দিকে, ওদের তো শুধু দুরবস্থা নয়, এখন দুরাবস্থা একেবারে—আকার দেখলেই বোঝা যায়!'

অভাব শুধু টাকার নয়। শিক্ষকদের-সামাজিক মূল্য এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। পেশার সম্মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। স্কুল কলেজের বাইরে শিক্ষকদের আর কেউ গ্রাহ্য করে না। একই রকমের দুজন ভালো ছাত্র—একজন আই-এ-এস হলো, ছশো টাকা মাইনে, প্রবল প্রতিপত্তি। অপরজন শিক্ষক, সুতরাং একশো পঁচাত্তর টাকা, নগণ্য মানুষ। সরকারের যে-কোনো পেটি গেজেটেড অফিসারের ক্ষমতা আছে কারেক্টার সার্টিফিকেট দেবার, অন্য সার্টিফিকেটের কপি অ্যাটেস্ট করার। শিক্ষকের এই ক্ষমতা নেই। ছাত্ররা কাকে শ্রদ্ধা

করবে—শিক্ষককে না ওই গেজেটেড অফিসারকে ? কার মতন হতে চাইবে ? পাস করার পর আর কোনো চাকরি না পেলে—তবেই লোকে কানামামা হিসেবে মাস্টারী নেয়। তিক্ততা আর হতাশা জীবিকার প্রথম থেকেই জড়িত হয়ে যায়।

সবচেয়ে অসহায় লাগে প্রাথমিক শিক্ষকদের। কি পরাজিত আহত মুখ ! ডায়মণ্ডহারবার থেকে তিনখানা রিজার্ভ করা বাসে এসে ওঁরা অনেকে ওই মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।

একই মিছিলে নাম-করা অধ্যাপক আব পাঠশালার মাস্টার। কিছু অধ্যাপকদের চেহারা দেখলেই চেনা যায়, খানিকটা বাবু-বাবু গন্ধ আছে। নোট বই এবং প্রাইভেট টিউশানির অতিরিক্ত আয়ের ছাপও আছে চেহারায়। তার পাশে গাঁয়ের মাস্টারদের ময়লা ধুতি, মলিন মুখ। প্রাথমিক ইসকুল থেকেই খারাপ পড়ানো হয় বলে, কলেজের অধ্যাপকরা ভালো টিউশানি পান !

আমরা অধ্যাপক থেকে শুরু করে সকলেরই বেতন ও অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধি চাই। কিন্তু প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত প্রাথমিক শিক্ষকদেব প্রতি—এবং উচিত অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান খুব কমিয়ে আনা। যাতে শুধু বিদ্যাব মান অনুযায়ীই নয়, অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও প্রাথমিক শিক্ষক হতে পারেন। তাঁদের দরকার বেশী। আজ স্বাধীনতার পর শিক্ষিতের সংখ্যা আরও কমে গেছে, সেদিনকার সরকারী রিপোর্টে জানা গেল। অর্থাৎ শিক্ষা প্রসার তো দূরের কথা, জন্ম-হারের সঙ্গেও শিক্ষার হাব সমতা রাখতে পারছে না।

মিছিল শেষ হবার পর একটা টুকরো সংলাপ আমাদের কানে এলো। একজন শিক্ষকের ক্যাম্বিশের জুতো পরা পায়ে একটি ডোবাকাটা সার্ট পরা ছেলে হুমড়ি খেয়ে পড়লো : স্যার, আমায় চিনতে পাবছেন ?

—না তো।

—সেই যে স্যার, তিন বছর আগে অমুক ইস্কুলে……

—না, চিনতে পারলুম না।

—টেস্ট পরীক্ষার সময় আমি টুকলি করেছিলুম। আপনি স্যার আমাকে ধরে হল থেকে তাড়িয়ে দিলেন ! সেবার পরীক্ষা দেওয়াই হলো না স্কুল ফাইন্যাল !

মাস্টারমশাই'র চোখে ভয় ঘনিয়ে এলো। বথা ছেলেটি এখন কি আবার কোনো প্রতিশোধ নিতে এসেছে না কি ? ছেলেটি কিন্তু বেশ বিনীতভাবেই পায়ের ধুলো মাথায় নিল। বললো, মাস্টারমশাই, আমি অন্যায় করেছিলুম ঠিকই।

—তুমি পরের বার পাস করেছিলে ?

—না স্যার, আমার আর লেখাপড়া হলো না। চাকরিতে ঢুকে গেলুম।

—কোথায় ?

—গান এণ্ড সেল্ ফ্যাক্টরিতে। আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি। ওভার টাইম্-কাইম্ মিলিয়ে শ'চারেক হয়। আচ্ছা স্যার, চলি।

মাস্টারমশাই বহুক্ষণ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। শীর্ণকায়, প্রায়-প্রৌঢ়। হাত কাঁপছে তাঁর। না-কান্না গলায় পাশের সঙ্গীকে বললেন, আমি বি. এ-তে ডিস্টিংসান পেয়েছিলুম, জানেন ? আমি ম্যাট্রিকে ছুটো লেটার পেয়েছিলুম। আমি পরীক্ষায় টুকতেও যাই নি বা ধরাও পড়িনি বলে আজ এতদিনে আমার মাইনে একশো সাতান্ন। জানেন, ঐ ছেলেটির আমি কতটা উপকার করেছি ?

১২

❋❋❋❋❋

আমার একটি টেলিফোন করার জরুরী দরকার হলো বিকেলের দিকে। তৎক্ষণাৎ আমি কাছাকাছি পানের দোকান থেকে একটা টাকা ভাঙিয়ে প্রচুর খুচরো করে নিলাম।

কাছেই টেলিফোন কম্পানির একটি শাখা অফিস। সেখানে পরপর ছ'টি খোপের মধ্যে ছ'টি সাধারণের ব্যবহার্য টেলিফোন, একটি নেপালী দরওয়ান সেগুলি পাহারা দিচ্ছে। প্রত্যেকটি যন্ত্রের নিচে হিন্দী-বাংলা-ইংরেজীতে প্রচুর নির্দেশ লেখা আছে। পড়লে মনে হয় যেন বিরাট একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতে হবে এখুনি। এবং ওর সঙ্গে যেন একটা অলিখিত বাক্যও যুক্ত আছে, সাবধান, ৪৪০ ভোল্ট, অসাবধান হইলেই মৃত্যু! আমি সাধারণত এসব যন্ত্রপাতি থেকে দূরেই থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু সেদিন বিষম প্রয়োজন ছিল একটি খবর দেবার।

খুব সাবধানে মাথা ঠাণ্ডা করে প্রথমে ইংরেজী নির্দেশ তারপর বাংলা অনুবাদ পড়ে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম। কী রকম যেন মনে হলো, ঐ নির্দেশ পুরো-পুরি মানতে হলে আমার চারটে হাত থাকা দরকার। আমি জামার তলা থেকে আমার লুকনো আর দুটো হাত বার করে, চার হাতেই কাজ শুরু করলাম। প্রতি মুহূর্তে নির্দেশাবলীর দিকে চোখ রেখে। যথারীতি রিসিভার তুলে, চাক্তি ঘুরিয়ে বোতাম টেপার পর ওপার থেকে কী যেন একটা গলা ভেসে এলো, আমি পয়সা দিয়ে কথা বলা শুরু করতেই কড-র, কড়-র কট্ কট্ ইত্যাদি কিছু আওয়াজ হয়েই একেবারে চুপ! আর টু-শব্দটি নেই। অর্থাৎ টেকনিক্যাল ভাষায় যাকে বলে 'ডেড্'। রিসিভার রেখে দিলাম। কী ভুল হয়েছে? নির্দেশনামায় আবার চোখ বুলোতেই দেখলাম, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ না হলে একটা বিশেষ বোতাম টিপলেই পয়সা নাকি ফিরে পাওয়া যায়।

বোতাম ধরে টেপাটেপি করলুম, সেটা গোঁয়ারের মত চুপ করে রইলো। তাতে দুঃখিত হলুম না, কারণ, যে-পয়সা একবার পকেট থেকে বেরিয়ে যায়, তা আবার ফিরে আসবে এমন অলৌকিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস হয় না। বুঝতে পারলুম, আমারই কোনো ভুল হয়েছে, নিজের বোকামি আর কেউ দেখে ফেলেছে কিনা এদিক ওদিক তাকিয়ে আমি সুট্ করে পাশের কুঠরিতে ঢুকে গেলাম।

পাশের খোপে ঝঞ্ঝাট কম, রিসিভার তুলতেই পিঁ-পিঁ-পিঁ আওয়াজ এলো। অর্থাৎ এনগেজ্‌ড্। পাবলিক টেলিফোন কি করে এনগেজ্‌ড হয়, এ তত্ত্ব ভাবতে ভাবতে আমি এলাম তার পাশের ঘরে। একটি লোক সেই মুহূর্তে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই বললো, এটায় হবে না, আমি অনেক চেষ্টা করলাম। ফোনটা খারাপ। কী ধরনের খারাপ, কড়-কড় না পিঁ-পিঁ সেটা দেখার জন্য আমি তবু রিসিভার তুললাম। পিঁ-পিঁ অর্থাৎ আগের ঘরের মতই।

আমি চতুর্থ ঘরে গেলাম। এখানে স্পষ্ট ডায়াল টোন। সব ঠিকঠাক হলো। ওপাশ থেকে গলা পেলাম। এবার পয়সা ফেলে বোতাম টেপা। তাও নিখুঁত। ওপার থেকে ভেসে আসছে, হ্যালো, হ্যালো? আমি জবাব দিলাম। উত্তর এলো, জবাব দিচ্ছেন না কেন? কে?—আমি অত্যন্ত কাতর গলায় নাম জানালাম। উত্তর এলো, কী আশ্চর্য কথা বলছেন না কেন? কে আপনি? —আমি কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে তুলে তবু মিনতির সুর বজায় রেখে বললাম, আমি, আমার এই নাম, চিনতে পারলে না?

—কে আপনি? ধেৎ! কথা বলছেন না কেন?

—এত কথা বলছি তবু শুনতে পাচ্ছো না? তুমি কি ভগবান নাকি?

—টেলিফোন করে একটাও কথা বলছেন না! কে আপনি?

আমি তখন ঘর কাঁপিয়ে গর্জন করছি। ওপার থেকে তবু সেই শুনতে না পাবার বিরক্তি। কট্ করে লাইন কেটে গেল। এবং বোতাম টিপে পয়সা ফেরত এলো না।

পঞ্চম ঘরে গিয়ে, সেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় যে-ভাবে 'ড্যাফোডিল' কবিতার সাবস্টেন্স মুখস্থ করেছিলাম সেইভাবে নির্দেশনামা মুখস্থ করে নিজেই নিজের পড়া ধরলাম। তারপর প্রতিটি জিনিস যে ঠিক্‌ঠাক্ করেছিলাম তা আদালতে হলপ করে বলতে পারি। এবার পয়সা ফেলে বোতাম টেপার পর আবার সেই পরিচিত গলা। আমি জীবনের চরম অনুনয়ের সুরে বললাম, আমার নাম অমুক, দয়া করে এবার আমার কথা শোনো। ওপাশ থেকে আবার ভেসে এলো, কে? কথা বলছেন না কেন?

আমি প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে বললুম, হে টেলিফোনের দেবতা, দয়া করে আমার কণ্ঠস্বর ওপারে পৌঁছে দাও। আমি কি বোবা হয়ে গেছি, না পৃথিবীর মানুষ আর আমার ভাষা বুঝবে না ?

ওপার থেকে শুনলাম, 'মা, দেখো, সেই কোন বখা ছেলে বারবার টেলিফোন করে বিরক্ত করছে। কথাও বলছে না। একটা কথা বললে এমন শুনিয়ে দিতাম। দূর ছাই!' কট্।

আমার পরম বান্ধবী আমাকে বখা বলে আখ্যা দিলেন, নিজের কানে শুনলাম। একটি উত্তর দিতে পারলুম না। পয়সাটা এবার ফেরত দেবে অন্তত, দেবতা ? না।

পাশের কামরায় বাইরেই দয়া করে নোটিস ঝোলানো আছে, এই টেলিফোন যন্ত্রটি বিকল। যাক আর পয়সা গচ্চা গেল না।

নেপালী দরওয়ানটি বাংলা-ইংরেজি বোঝে না দেখা গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, কী ব্যাপার, তোমাদের মেশিন খালি পয়সা খায়, অথচ কাজ করে না ? লোকটা বললো, কম্‌প্লেন বুক ? হাঁ সাব্, ইধার! অর্থাৎ দিনের মধ্যে বহুবার ঐ খাতাটি তাকে বার করতে হয়। বেশ যত্ন করে বাঁধানো খাতা। আমি উল্টে পাল্টে দেখলাম। বহুদিন এমন একা একা হাসি নি। অসম্ভব মজার মজার মন্তব্যে ভরা। শেষ দিকের কয়েকটা মন্তব্য এই রকম :

পয়সাও নষ্ট হলো, কাজও হলো না। আমার নাম ঠিকানা দিয়ে গেলাম! কম্পানির উচিত আমার বাড়িতে ৬০ নয়া ফেরত পাঠানো।

আরেকজন :

মানুষ ঘুষ খায়, যন্ত্রও বা খাবে না কেন ? আমি প্রত্যেকটা টেলিফোনের জন্য দু'বার করে পয়সা দিয়েছি, তবু কোনো কাজ হয় নি। যন্ত্রও মানুষের মতো নিমকহারাম!

এর নিচে লেখা, ছ'নম্বর ঘর ছাড়া আর সবক'টি টেলিফোনই ঠিক আছে! পরীক্ষা করে দেখছি। ইতি, টেকনিক্যাল ইন্সপেক্টর।

এই লেখাটা একটু আগের, তখনও ভালো করে কালি শুকোয় নি। সুতরাং আমি আর কিছু লিখে সময় নষ্ট করলুম না। খাতাটা ফেরত দিয়ে আমি ছুটে গেলাম পোস্ট-অফিস। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটিও একটি শাখা পোস্ট-অফিস, পূর্বের শাখা টেলিফোন ভবনটির মতো। নদীর চেয়ে শাখা নদীগুলির যেমন বিক্রম বেশী, তেমনি শাখা অফিসগুলো অকৃতকার্যতায় আসল অফিসগুলোকে ঢের ছাড়িয়ে যায়। যে-কোনো শাখা পোস্ট-অফিস এ কৃতিত্ব জি পি ও-কেও টেক্কা দিতে পারে।

পোস্ট-অফিসের টেলিফোনের সামনে দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। একটু অপেক্ষা করতেই হঠাৎ আমার মনে হলো, এত ঝঞ্ঝাটে আমি নম্বরটা ভুলে গেছি। শেষ দুটো সংখ্যা তো বারবার উল্টে যাচ্ছে। মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের টেলিফোন গাইডটা কোথায়?

—চুরি গেছে। নেই।

পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক রুক্ষ গলায় বললেন, আপনাদের তো মশাই যখনই খোঁজ করা হয় টেলিফোন গাইড তখনই বলেন, চুরি গেছে। আনিয়ে রাখতে পারেন না?

—কতবার আনবো? বারবার চুরি যায় যে! আপনারা কমপ্লেন করুন না! পাশের স্ট্যাম্পের ঘর থেকে মেয়েটি মিষ্টি হেসে বললো, জানেন, মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের গির্জা থেকে বাইবেল চুরি যেতো?

মেয়েটি সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে বুঝলুম। কিন্তু টেলিফোন বই চুরি করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার কি লাভ হয়, কোন্ ধর্ম সাধনায় সিদ্ধি পায়, তা আমার বোঝার কথা নয়। স্থান ত্যাগ করে ছুটে গেলুম রাস্তার উল্টো দিকের ডাক্তারখানায়। বিনীতভাবে বললুম, দয়া করে পয়সা নিয়ে একটা টেলিফোন করতে দেবেন?

—টেলিফোন? এই বিকেলবেলা? সন্ধ্যের পর আসবেন।

এরকম কথাও আমি জীবনে শুনিনি। আমার টেলিফোন করা দরকার এখন, আমি আসবো সন্ধ্যেবেলা? সবিনয়ে জানালুম, সন্ধ্যেবেলা লোকটির সঙ্গে আলাপ পরিচয় বা যা কিছু করবার জন্য আমার আসতে আপত্তি নেই, কিন্তু টেলিফোনটি আমার এখুনি করা দরকার। তখন আসল ব্যাপারটা জানা গেল। ওর টেলিফোনের চাক্তিতে তালা আটকানো, সন্ধ্যেবেলা ডাক্তারবাবু স্বয়ং এসে তালা খুলবেন। এখন কল রিসিভ করা যায়, কিন্তু বাইরে করা যায় না। যাই হোক, ভদ্রলোক দয়া করে আমাকে গাইডটা দেখতে দিলেন। নম্বরটা এবার কাগজে লিখে ফিরে এলাম পোস্ট-অফিসে।

টেলিফোনের সামনে আর কোনো লোক নেই। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিটি একটি বই পড়ছেন। এখানে অন্যান্য পোস্ট-অফিসের মতো লোকে এসে নিজে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করতে পারে না। একজন লোক শুধু এজন্যই রাখা হয়েছে, যিনি লোকের মুখে নম্বর শুনে নিজে চাক্তি ঘুরিয়ে রিসিভার তুলে দেবেন। আপাতত সেই লোকটি বই পড়ছেন। মলাট দেখে বুঝলাম, গোয়েন্দা গল্প। দু'তিনবারের ডাকেও সাড়া না দিতে লোকটির প্রতি মায়াবশত আমি একটু অপেক্ষা করতে

লাগলাম। আহা, এই মুহূর্তে হয়তো সুন্দরী নায়িকার সামনে পিস্তল তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুর্বৃত্ত। এখন কি আর অন্যদিকে মন দেওয়া যায়।

দণ্ড পল মিনিট কাটতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত আর না থাকতে পেরে আমি কাচুমাচু গলায় বললাম, দয়া করে আমাকে একটা নম্বর ডায়াল করে দেবেন? একবার দুবার তিনবার বলার পর লোকটি উত্তর দিলেন, হবে না, লাইন আউট অব অর্ডার।

—সে কি। এইতো দেখলুম, কয়েকজন টেলিফোন করছিলেন?

—এ লাইন কখনও ভালো থাকে, কখনও খারাপ হয়। ভূতুড়ে কাণ্ড মশাই।

এবার আমার পক্ষে মেজাজ ঠিক রাখা কষ্টকর হলো। বেশ রুক্ষ গলায় বললাম, আপনি ওটা কাউন্টারের উপর তুলে দিন, আমি দেখছি ওটা ভালো কী খারাপ!

লোকটি এবার হাতের বই মুড়ে রেখে ধীরে সুস্থে চোখ তুলে বললেন, আপনি রাগ করছেন?—তারপর, যে ভাবে লোকে ব্যবসার সঙ্গীকে গোপন সুখবর বলে. তেমনি মুচকি হেসে, এক চোখ কুঁচকে লোকটি আমাকে বললেন, কমপ্লেন করুন না। ঐ তো রয়েছে খাতাটা! লিখুন না যা ইচ্ছে।

তখন বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গিয়ে যেখানে আমার টেলিফোন করা দরকার ছিল, সেই ঠিকানায় আমি ট্যাক্সি করে উপস্থিত হলাম।

কিন্তু কমপ্লেন বুক আমাকে কয়েকদিন তাড়া করেছে। যে-কোনো সরকারী অফিসে গিয়ে কোনো কিছু নিয়ে রাগারাগি করলেই দেখছি তারা কমপ্লেন বুক এগিয়ে দেয়। যেন এটা একটা বেশ মজার ব্যাপার। পরম দুর্মুখকেও চুপ করিয়ে দেবার একমাত্র অস্ত্র। খাতাটা এগিয়ে দেবার সময় সকলেরই মুখ বেশ হাসি হাসি থাকে।

রাত্রি সাড়ে এগারোটায় শ্যামবাজার থেকে দমদমের শেষ বাস ছাড়ে। এগারোটা আন্দাজ পৌঁছে দেখি বিরাট কাণ্ড। তখনই সার্ডিন মাছের টিনের মতো ভর্তি হয়ে একটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাসের সামনেটা ভিজে, ভেতরের লোকদের ঘাম গড়িয়ে এসেছে। প্রতি দশ মিনিট অন্তর বাস ছাড়ার নিয়ম হলেও শুধু আজ এই একটা বাসই ছাড়বে আধঘণ্টা পরে শেষ বাস হিসেবে, তার গাড়ি নেই, বাইরে তখনও শ দুয়েক লোক দাঁড়িয়ে।

ছোট গুমটি ঘরের মধ্যে দু'তিনজন লোক টেলিফোন আর খাতা পেন্সিল নিয়ে কি যেন করছিলেন। সেই ঘর ঘিরে একদল যাত্রী উত্তেজিত গলায় কত

কী বোঝাবার চেষ্টা করছে। ভিতরের লোকেরা একদম গ্রাহ্যই করছেন না। শুধু একজন শুধু তিরিক্ষে গলায় বলছেন, আর বাস নেই তো কি করতে পারি আমরা? পায়ে হেঁটে বাড়ি যান!

এমন সময় একটি লোককে দেখলাম। দেখার মতো চেহারা। বিশাল লম্বা ও চওড়া, পাজামা ও পাঞ্জাবি পরনে—একটি চলন্ত দৈত্য ভিড়ে সকলের মাথা ছাড়িয়ে সেই গুমটি ঘরে উঁকি মেরে মেঘগর্জনের মতো গলায় বললো, কী ব্যাপার, আর বাস নেই কেন?

এক সঙ্গে বহু কণ্ঠের বহু উত্তর। লোকটি সবাইকে এক ধমক দিল, আপনারা চুপ করুন। গুমটির লোকেরা জবাব দিক। বাস নেই কেন?

নেই তো আমরা কী করবো? আপনারা ওপরওলাকে জানান। কম্‌প্লেন করুন! ঐ তো কম্‌প্লেন বুক রয়েছে, জানান না!

—কম্‌প্লেন বুকে লিখবো? লোকটা হা-হা করে হেসে উঠলো। আমার সঙ্গে কম্‌প্লেন বুক নিয়ে ইয়ার্কি করছেন? ওসব রঙ্গরস বুঝি আমি জানি না? ও বইতে লিখে কি লাভ হয় আমি জানি। দেখবেন, আমার কম্‌প্লেন বুকে লেখার কায়দা?

তারপর লোকটি দুই বিরাট থাবা দিয়ে দম্‌দম্ করে পেটাতে লাগলো গুমটির টিনের দেয়ালে। পুরো গুমটি ঘরটা ধরেই নাড়া দিতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের অনেকেও হাত মেলালো তার সঙ্গে। সেই লোকটা হাসতে হাসতেই বললো, হয় বাস চাই, নইলে এ গুমটি ঘর আজ উড়ে যাবে! লাগাও! দুম্, দুম্!

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ভোজবাজি ঘটে গেল। কোথা থেকে চলে এলো দুটো খালি বাস। একটা ডবল ডেকার এসেও অপেক্ষা করতে লাগলো—যদি যাত্রী সাধারণের সেবার জন্য লাগে। একাধিক সরকারি অফিসার ছোটাছুটি করে দেখতে লাগলেন যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। হাতজোড় করে বলতে লাগলেন আগে প্রত্যেকটি যাত্রীর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে, তবে তারা নিজেরা বাড়ি ফিরবেন। তাদের কাজই তো জনসাধারণের সেবা।

লম্বা লোকটি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকটি লোককে আগে বাসে তোলার ব্যবস্থা করে দিলো। তারপর, আমি কাছাকাছি ছিলাম বলে, আমার দিকে ফিরে প্রবল হাস্যে বললেন, হাঃ! আমাকে দেখাচ্ছে কম্‌প্লেন বুক! যে রোগের যে ওষুধ! কিংবা যে ক্লাসের যে-রকম অঙ্ক, বুঝলেন? অথবা যে বিয়ের যে মন্তোর!

আমি লোকটির কাছ থেকে সরে গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঠলাম।

১৩

*****

আবদুল সকালবেলা এসে বললো, আপনার কাছে বিদায় নিতে এলুম, আবার কবে দেখা হয় না হয়।

আবদুলের মতো এমন চমৎকার ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। সেই দুর্লভ ধরনের মানুষ যারা হাসতে হাসতে দুঃখের কথা বলতে পারে। আমার চেয়ে বয়েসে বেশ ছোট, এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে, পড়াশুনোয় খুব ভালো, এরই মধ্যে ইংরিজী খবরের কাগজে চিঠি লেখা শুরু করেছে। দেখতে সুন্দর নয় আবদুলকে—মুখের গড়ন খানিকটা চৌকো ধরনের, অস্পষ্ট চামড়ার রং, সীমাবদ্ধ চোখ, তা ছাড়া সেলুনে কায়দার চুলের ছাঁট দিতে শেখেনি—একেবারে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার মতো চেহারা। কিন্তু মুখে এমন একটা ঝলমলে কৌতুক লেগে থাকে সব সময় যে, ওর মুখের দিকে তাকালেই দর্শকের মুখেও একটা প্রসন্নতা আসতে বাধ্য। চব্বিশ পরগনার একটা গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে লেখাপড়া করতে—ওদের আত্মীয়পরিজনের মধ্যে কেউ কোনোদিন ইস্কুল-মাদ্রাসা পার হয় নি, আবদুলই প্রথম এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওর বাবা এখনও চাষের কাজ করে। বাড়ি থেকে পয়সাকড়ি দেবার সামর্থ্য নেই—কলকাতায় থাকে এখানে সেখানে, কোনো চাল-চুলো নেই—ডিস্টিক্ট স্কলারশিপ পায় ১৫ টাকা—সেটা মূলধন করে সারা মাস মাথা খাটিয়ে চালিয়ে দেয়—অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্রের মতো—গাঁয়ের ছেলে শহরে এসে খেয়ে না-খেয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য প্রাণপণ করেছে। কোনোদিন হয়তো, ও আমাকে এসে বললো, আপনি পান খান, নীলুদা?

—মাঝে মাঝে দু' একটা। কেন বলো তো?

—কাল একটা অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করলুম। কাল রাত্রে পকেটে দশ নয়া পয়সা ছিল তো, ভাবছিলাম কি করি, কি করি। খিদে লেগেছিল—চার পয়সার ছাতু খেলাম, বুঝলেন। মুখটা একটু বিশ্রী বিশ্রী লাগছিল—তারপর,

তাই চার নয়া দিয়ে একটা মিঠে পান খেলাম। তখন জানেন, ভারি আশ্চর্য, বোধ হয় পানের সঙ্গে ছাতুর একটা কেমিক্যাল রি-অ্যাকশান হয়, পেট ভরে গেল—আর মনটাও খুঁব ভালো হয়ে গেল—কি রকম যেন ফুরফুরে লাগতে লাগলো—ভাবলুম উড়তে উড়তে বাড়ি যাই। আপনি একদিন ছাতুর সঙ্গে পান খেয়ে দেখবেন?

আবদুলের সঙ্গে কথাবার্তা আমাকে একটু সাবধানে বলতে হয়। ওর সরলতার কাছে প্রতিমুহূর্তে আমার অপমানিত হবার ভয় থাকে। গতকাল রাত্রে যে শেষ দশ নয়া পয়সা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছে আজ সে কোন্ মহাশূন্য নিয়ে গবেষণা করবে—সে সম্পর্কে আমার প্রশ্ন করা চলবে না। প্রত্যেকের জীবন তার নিজের—তবু আমরা অপরের জীবন নিয়ে কথা বলার জন্য আকুলি-বিকুলি করি।

আমিও আবদুলকে সৎপথে আনার জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করেছি। গ্রামের ছেলে, আগে বিড়ি সিগারেট খেতো না, আমিই সিগারেট ধরিয়েছি—এখন, এই মাস দুয়েকের মধ্যেই ছাই ঝাড়ার সময় দিব্যি আঙুলে টুস্‌কি আওয়াজ করতে শিখে গেছে। টিউশানি করতে গিয়ে কি কি উপায়ে পড়ানো ফাঁকি দিতে হয়, সে সম্পর্কেও উপদেশ দিয়েছি ওকে। ট্রামে বাসে ভাড়া না-দেবার আমার নিজস্ব পদ্ধতিগুলি শুনে শুনেও ও এখনও ঠিকমতো রপ্ত করতে পারে নি যদিও। এ ছাড়া, আর একটি কথা আমি ওকে প্রায়ই বলে থাকি, পড়াশুনো ছেড়ে দাও আবদুল, পড়াশুনো করে কি হবে? এর উত্তরে ও একটা বেয়াড়া ধরনের প্রশ্ন করে, পড়াশুনো না করে কি হবে, সেটা আগে বলুন! পড়াশুনো ছেড়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবার সঙ্গে মিলে চাষবাস করা অনেক ভালো—সেটা ও কিছুতে বুঝবে না। অর্থাৎ একাকিত্ব, মুক্তি, আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি কয়েকটা আধুনিক সাহিত্যের অসুখ ওর মধ্যে ঢুকে গেছে। ও এখন নাগরিক জীবন চায়।

অনেকদিন আবদুলের সঙ্গে দেখা হয় নি। হঠাৎ এসে ও বিদায় নেবার কথা বলতে একটু অবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, গ্রামে ফিরে যাচ্ছো নাকি?

—না, বিদেশে। পাকিস্তানে। ঢাকা যাবো।

—বেড়াতে? কবে ফিরবে?

—আর ফিরবো না। ওখানেই থেকে যাবো।

আমি হঠাৎ চুপ করে গেলাম। বুঝলাম, নিশ্চয়ই একটা কিছু গুরুতর ঘটেছে! সামান্য কারণে আবদুলের মতো ছেলে বিমর্ষ হয় না। আবদুল কিন্তু পর মুহূর্তেই হেসে উঠে বললো, কি, জিজ্ঞেস করলেন না, কেন যাচ্ছি?

বললুম, তুমিই বলো না।

—একা একা থাকি। আজকাল বড মন খারাপ লাগে।

—ঢাকায় কোনো মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়েছে বুঝি ?

—প্রেম তো এখানেই একটা মেয়ের সঙ্গে হয়েছিল, মুসলমান বলে পাত্তা দিল না। না, ইয়ার্কি নয়, নীলুদা আজকাল টাকা পয়সা একদম কুলিয়ে উঠতে পারছি না। তা ছাড়া সব সময় একটা অস্বস্তি।

—অস্বস্তি ?

—কী জানেন, কাগজে টিউশনির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে হয়তো গেলাম—সব কথাবার্তা হলো, যেই নাম জিজ্ঞেস করলো, অমনি—হেসে ফেললো আবদুল—লোকগুলো এমন মজার, চট করে মিথ্যে কথাও বানাতে পারে না। বলে, এখন টাকার টানাটানি—কয়েক মাস মাস্টার রাখবো না এখন। আসল সব ঠিক হবার পর আমি মুসলমান শুনেই যে এমন মজার মুখ করে লোকেরা···

—অনেক মুসলমানও তো বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখে, সেখানে যাওনা কেন ?

—আমি মুসলমান বলেই কেন মুসলমানের কাছে যাবো ? আমি মানুষ, যে-কোনো মানুষের কাছে যাবো।

—অত আদর্শ রাখলে চলে না আবদুল। বেঁচে থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড কথা। মুসলমানের কাছে গেলে যদি চাকরি পাও—সেখানেই যাবে!

—তাও গিয়েছিলাম। কিন্তু জানেন তো, এ দেশে মধ্যবিত্ত মুসলমান নেই। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে হিন্দুদের মধ্যেই। আর বড়লোক মুসলমানেরা এক অদ্ভুত চীজ্। সত্যি বলছি। তারা থাকে সাহেবী কায়দায়—তারা চায় প্যাণ্টকোট পরা ইংরেজী বলা মাস্টার—তা হিন্দু মুসলমান অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান যাই হোক না। আমার মত ইস্তিরি না-করা জামা, ময়লা ধুতিপরা মাস্টার চায় না। অথচ আমি কি ইংরেজী খারাপ জানি ?

—বড়লোক হিন্দুরাও তাই। দুনিয়ার এমন কোনো বড়লোক নেই, যে নিজের বাড়িতে ময়লা জামাকাপড় পরা মাস্টার রাখতে চায়।

আবদুল সরল হেসে বললো, কি মুশকিল, টাকা না পেলে প্যাণ্টকোট কিনবো কি দিয়ে ? ওর বলার ভঙ্গিতে আমাকেও হেসে উঠতে হলো।

—একজন দোকানদারের কাছে গিয়েছিলুম—খাওয়া থাকার বদলে দোকানের হিসেবপত্র রাখতে হবে। লোকটা সব ঠিক করার পর আমি মুসলমান শুনে বললে কি জানেন ? বললে, ভাই তোমাকে না নেবার কোনো যুক্তিই

নেই কিন্তু তবু নিতে পারছি না। মাপ করো ভাই। লোকটার কাঁচুমাচু মুখ দেখে এমন মায়া হলো আমার। সত্যি খুব ভালো লোকটা, কিন্তু সংস্কারের কাছে অসহায়। আবার দু'একজন চোখ রাঙায়ও বটে, স্পষ্ট অপমান করে—কিন্তু তাতেও কিছু মনে করি না। ও তো স্বাভাবিক। মানুষ তো আর একরকম হয় না। এখন কারুর কাছে যেতেই লজ্জা হয়। নিজের নাম বলতে যদি লজ্জা হয়—তার চেয়ে খারাপ কিছু আছে? সেইজন্য জানেন, সব সময় একটা অস্বস্তি লাগে, কি রকম কষ্ট হয়, বুকের মধ্যে যেন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে অনবরত। নিজেকে খুব একা মনে হয়।

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলুম, আবদুল কি একাই এরকম পরিস্থিতিতে পড়েছে—না ওর মত সব মুসলমান ছেলেদেরই এ অবস্থা? কি জানি! এমনও হতে পারে, আবদুলের একাকিত্ব বোধের সঙ্গে ধর্মভেদের কোনো সম্পর্ক নেই। কাফকা কিংবা কামুর লেখা-টেখা পড়েই বোধহয় এসব মাথায় ঢুকেছে! হয়তো এসব সাহিত্যের অসুখ। কিন্তু অস্বস্তির কারণ যখন ও নিজেই বার করেছে—তখন সেইটাই সত্য। অন্য কোনো ধারণা কি ওকে কোনো সাহায্য করতে পারবে? কিন্তু ঢাকায় গেলেই ওর এই ভাব সেরে যাবে ও কি করে ভাবলো? —সে কথা ওকে জিজ্ঞেস করলুম।

—জানি না ওখানে গেলেই কেটে যাবে কিনা। তবু দেখা যাক। জানেন, এখানে তো আমার কোনো বন্ধুও নেই। কলেজে একটা ছেলের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হলো—বনেদি ব্রাহ্মণ বংশের ছেলে—অনেক কিছু জানে, অনেক আলোচনা করতুম দুজনে। ছেলেটাকে মনে হত সত্যিকারের উদার। ওর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেতুম। একদিন বিকেলে একটু একা একা লাগছে, ওর বাড়িতে গেলাম। ছেলেটা এমন তিনতলা জানলা থেকে উঁকি মেরে বললো, খুব ব্যস্ত, দেখা করতে পারবে না। আচ্ছা দেখুন তো, কি বোকা—আমার কি ক্ষতি হলো—ওকেই তো নিজের সঙ্গে জোচ্চুরি করতে হলো! আর একটা ছেলে-বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব আদরযত্ন করে খাওয়ায় মাঝে মাঝে—খাতিরের ঠেলায় আমি ব্যতিব্যস্ত—পাড়ার লোককে ডেকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দেয় যে, আমি মুসলমান। ব্যাপারটা কি বুঝতে পারলেন তো? আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি—মহত্ত্ব দেখানো। তার পর আর আমি যাই না, কেন যাবো বলুন!

আবদুলের কথা বলার বিশেষ গুণ এই যে কোনো বিদ্রূপ বা দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই। কথার ঝোঁকে কথা বলে যায়।

—জানেন নীলুদা, মুসলমানরা আরও খারাপ। আমি তো অনেক চাষাভূষো

গরীব লোকের সঙ্গে মিশে দেখেছি! গরীব হিন্দুদের মধ্যে সাধারণত মুসলমানদের সম্পর্কে কোনো রাগ বা এড়িয়ে যাবার ভাব নেই। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে আছে। আমি তো মুসলমানদের বস্তিতে থাকি। দেখেছি হিন্দুদের ওপর সব সময়েই একটা রাগ আর হিংসে নিয়ে কথা বলে। খুব খারাপ!

—স্বাভাবিক এটাও। ওরা এ দেশে সংখ্যালঘু—তাই হয়তো ভাবতে পারে ওদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে।

—শুধু তাই না, কুসংস্কারও বেশী। শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যেও আছে। আমি কয়েকটা মুসলমান ছেলের মেসে বসে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত গাইছিলুম—ওরা কি বললো জানেন? আমি হিন্দুর গান গাইছি।

—আমি এরকম কথা কখনো শুনি নি। এটা তোমার বাজে কথা। আমি অনেক মুসলমান ছেলেকে জানি—যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে পাগল!

—আপনারা একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে থাকেন—তার বাইরে একটা বিরাট বাংলাদেশ আছে। আমি অনেক মুসলমানকে বলতে শুনেছি যে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশ হিন্দু সাহিত্য লিখেছেন—। কিন্তু কোনো হিন্দু কি কখনো বলে, নজরুল ইসলাম বা মুজতবা আলী ইসলামী সাহিত্য লিখেছেন? কখনো বলে না! আমাদের মধ্যে এরকম কুসংস্কার বেশী আছে।

—বলুক না, তাতে কি ক্ষতি হয়েছে? তোমার তা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি দরকার?

—আপনি আমাকে খুশী করার জন্য সত্য কথাটা এড়িতে যেতে চাইছেন।

আমি হঠাৎ অত্যন্ত চটে গিয়ে বললাম, বাজে বোকো না। তুমিও আমাকে খুশী করার চেষ্টায় মুসলমানদের নিন্দে করতে শুরু করেছো। আবদুল চটপট উত্তর দিলো, আপনি একথাটা রাগের মাথায় না ভেবে বললেন।

আমি একটু অনুতপ্ত হয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, আবদুল, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান—কিন্তু কখনও তা মনেও পড়ে না। তুমি আজ সকালে এসে হঠাৎ এ সব প্রসঙ্গ তুললে কেন? আমি কি জানি না, দেশে এ সমস্যা আছে? থাকবেই দুই জাত বা দুই ধর্ম বা দু'রকম গায়ের রঙ—যে কোনো একটা হলেই হলো…এ রকম মানুষ কোথাও শান্তিতে পাশাপাশি থাকতে পারে না। ঝগড়া-মারামারির জন্য মানুষের একটা তো খেলনা চাই। তুমি আমি পাশাপাশি বসে থাকলে যুক্তিতর্ক মেনে কত কথা হবে। কিন্তু যেই দু'পাশে দুটি জনতা, বা দুটো দেশ—অমনি আর কোনো যুক্তি টিকবে না। এ সব নিয়ে আর ভাবতে চাই না—কারণ জানি তোমার বা আমার

ইচ্ছে অনুসারে কিছুরই বদল হবে না। আজ গোটা পৃথিবীতে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ইচ্ছে অনুযায়ী, কোনো দেশেরই রাজনীতি চলছে না।

—রাজনীতি ছেড়ে দিন, সাধারণ মানুষ ?

—সেখানেও ঐ সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু এই দুই দলে রেষারেষি, অবিশ্বাস, ঘৃণা থাকবেই। সংখ্যালঘুরা সব সময়ে মনে করবেই তারা নির্যাতিত, সত্যিকারের নির্যাতিত হোক বা না হোক। এ দেশে মুসলমানরা, পাকিস্তানে হিন্দুরা, আমেরিকায় নিগ্রোরা, সাইপ্রাসে তুর্কিরা, ইউরোপে ইহুদিরা। আচ্ছা, ওটা ভুলে যাও। মনে কর কবি আর অকবি—এই দু দল। সারা পৃথিবীতেই কবিরা সংখ্যালঘু, অকবিদের কাছে নির্যাতিত। কবি শুনলে প্রেমিকার বাবা বাড়ি থেকে দূর করে দেয়, আপিসে চাকরি হয় না, বইয়ের দোকানে মুখ বাঁকায়, মাছওলা ঠকায়, রাস্তায় পুলিসে তাড়া করে, বাড়িওলা বাড়ি ভাড়া দেয় না—

আবদুল হেসে বললো, আপনি কথাটা অন্য দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপর ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে আবদুল বললো, আমি লোককে বোঝাতে চাই। কেন মানুষে মানুষে এমন তফাত হবে—ধর্মের জন্য ? আমি এখানে পারলুম না, হেরে গেলাম। ঠিক করেছি, পাকিস্তানে গিয়ে মুসলমানদের বোঝাবো। মুসলমানরা বেশী পেছিয়ে আছে—আমি ওদের বোঝাবো—পাকিস্তানে আমার বেশী স্বাধীনতা থাকবে।

—স্বাধীনতা কথাটা কত ছোট !

—কেন ?

—তুমি মুসলমান বলে শুধু মুসলমানদের বলতে পারবে—তারা ভুল করছে। হিন্দুদের পারবে না! আমি দৈবাৎ হিন্দুর ঘরে জন্মেছি—এখন আমি যদি বলতে যাই, মুসলমানদের বোরখা পরা কিংবা পর্দা প্রথা খারাপ কিংবা বাঙালী মুসলমানদের নাম কেন বাংলা ভাষায় রাখা হয় না, অমনি বলা হবে আমি অনধিকার চর্চা করছি। আমাকে ওরা মারতে আসবে। তুমি যদি আবার বলো, হিন্দুদের বিয়ের সময় মেয়েদেখানো প্রথা কিংবা বিধবাদের ঝিয়ের মতো খাটানো, কিংবা জাতিভেদ প্রথা খারাপ—তবে তোমার নিস্তার নেই। তাও তো এ-সব সামাজিক প্রথা, ধর্ম নিয়ে তো কথাই বলা যাবে না। আমি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে গুষ্টির পিণ্ডি করে যা খুশী বলতে পারি, কিন্তু ইসলামের নিন্দে করতে পারবো না। আবার, তুমি ইসলামের দোষত্রুটি দেখাতে পারো, কিন্তু একবার হিন্দুদের মূর্তি পূজা নিয়ে কথা বলে দেখো দেখি! এর নাম স্বাধীনতা, আবদুল ?

—তা হোক! তবু আমাদের যতটা সাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম, দু'জনেই। তারপর আবদুল গাঢ়স্বরে বললো, চলে যাচ্ছি, আর আপনাদের সঙ্গে কখনো দেখা হবে কি না, কি জানি। মনটা খারাপ লাগছে।

বললুম, চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় যতদূর সম্ভব চেষ্টা করলাম আবদুলকে অন্যমনস্ক করে দেবার, তবু ওর চোখ পড়ে গেল। আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ির তলায় অন্ধকার জায়গায় একটি পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে—সেদিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করলো, এরা কারা? আগে তো দেখি নি।

বললুম, কি জানি, চলো তাড়াতাড়ি, বাস এসে গেছে।

—ইস্, সিঁড়ির নিচের ঐটুকু জায়গায়, এখানেও ভাড়াটে নাকি?

—জানি না, চলো চলো।

—বাঃ, এক বাড়িতে আছেন, জানেন না।

—কি জানি লক্ষ্য করি নি। চলো, আমার একটু তাড়া আছে।

ততক্ষণে আমরা বাড়ির বাইরে এসেছি। আবদুল হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো, আপনি যেন কিছু লুকোচ্ছেন!

—নিজের লজ্জার কথা বলবো কি করে? ওরা আমার পিসীমা আর তাঁর ছেলেমেয়ে। নিজের ঘরে জায়গা দিতে পারি নি, সিঁড়ির তলায় আছেন—এ কথা কি আর সকলকে বলা যায়?

—নীলুদা, আমি দূরে চলে যাচ্ছি শুনে অমনিই আপনি আমাকে পর পর মনে করছেন। ওঁরা কোথা থেকে এসেছেন?

—পাকিস্তান থেকে! কিন্তু, আবদুল, তুমি পাকিস্তান চলে যাচ্ছো—সেই সময়ই পাকিস্তান থেকে একটা হিন্দু পরিবারের চলে আসা নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত ভাল্‌গার। আমি চাই না। এরকম তো চলছে, জানোই। সে নিয়ে আর কথা বলে কি হবে?

আবদুলের মুখ মুহূর্তে বিষণ্ণ হয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বললো, ওঁরা কেন চলে এলেন? আবার কি কোনো গণ্ডগোল শুরু হয়েছে?

—না।

—আপনি সত্যি কথা বলুন।

—সত্যিই বলছি। আমি বারবার ওঁদের জিজ্ঞেস করেছি—কোনো দাঙ্গা হয়েছে কি না, কেউ ভয় দেখিয়েছে কি না—নইলে এতকাল পর কেন চলে এলেন। কিছুই হয় নি। এমনিই। দাঙ্গা হয় সাধারণত শহর অঞ্চলে। ওঁরা

এসেছেন ফরিদপুরের একটা গ্রাম থেকে—সেখানে আমিও জন্মেছি—সেখানে এ পর্যন্ত কোনোদিন দাঙ্গা হয় নি।

—এমনি কেউ আসে না। কেন চলে এলেন তবে ?

—তুমিও তো এমনিই যাচ্ছো। অস্বস্তি! পিসেমশাই বুড়ো হয়েছেন—ওঁর বড় ছেলেটা মারা গেছে—মুসলমানদের হাতে নয়, কলেরায়। তবু, দেশের জমিজায়গায় চলে যেত। কিন্তু পিসীমার এক মেয়ে বড় হয়েছে—তার জন্মেই এখানে চলে আসা। কয়েকটা ছোকরা নাকি দিনরাত ঘুরঘুর করতো, উড়ো চিঠি দিয়েছে, রাত্তির বেলা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাবে বলে শাসিয়েছে। কি এমন অস্বাভাবিক এটা ? ওঁরা কি জানেন না যে, সোমত্থ মেয়েদের পিছনে ছোকরাদের ঘোরাঘুরি এখানেও বেশী ছাডা কম নয় ? তা ছাড়া, এই শহরতলি অঞ্চলের ছোকরারা উড়ো চিঠি না দিয়ে এমনিতেই মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তবে, এখানে এসে কি লাভ হলো, এখানে খাবার সংস্থান নেই, তবু কেন এলেন ? কারণ কি জানো, সন্দেহ আর অবিশ্বাস। আসবার সময়, গ্রামের অনেক মুসলমান নাকি বলেছে, যাবেন না, আপনারা গ্রামের শেষ ব্রাহ্মণ, আপনারা যাবেন না। তবু কেন এসেছেন ? সেই সংখ্যালঘু হবার অপমানবোধ। ভেবেছেন দিনদুপুরে মেয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেও গ্রামের একটা লোকও তখন প্রতিবাদ করবে না। সন্দেহ আর অবিশ্বাস! তুমি যাকে আধুনিক ভাষায় বললে, অস্বস্তি।

১৪

*****

—কি অমন চেহারা কেন ? ঘোড়ার পিঠে চেপে এলেন নাকি ?

—হ্যাঁ, ঘোড়ায় চেপে নাচতে নাচতে এনুম।

—এই ভরদুপুরে ?

—আর জি কর হাসপাতালেব পাশের বাস্তা দিয়ে বাসে চেপে এলে সকলকে নাচতেই হবে ভাই। আজ দশ বছর নেচে নেচে অফিসে আসছি।

—তা, রাস্তাটার নাম উদয়শঙ্কর রোড দিয়ে দিন না।

—দিলাম। আর আমাব বাড়ির পাশের রাস্তাটা তা হলে বৈজয়ন্তীমালা লেন!

তুজন লোকের এই কথোপকথন আমাকে শুনতে হলো। অনেক অপরিচিত লোকের সম্পূর্ণ অনাবশ্যক কথাবার্তা আমরা শুনতে বাধ্য। কারণ, বাস-ট্রামে-ট্রেনে মুখ বুজে যাওয়া আমাদের স্বভাব নয়। একা থাকলে অপবেব কথা না শুনে উপায় নেই। কার পিসশাশুড়ীব গেঁটে বাত হয়েছে, কিংবা কার ন কাকিমাব আপন ছেলে—না, না,—আপন ন কাকিমাব ছেলে বিলেত থেকে ফিরেছে কিংবা মন্দিরা নাম্নী কোন বালিকা অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে হেসেছে—এই সব শুনে যাই, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে কোনো বন্ধু জোটে। তখন আমরাই আবার সরবে ওইরকম কোনো কথা শুরু করি।

তবে, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত চেহারার লোকদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে তু'একটা চমৎকার রসিকতা শোনা যায়। দেশের অবস্থা যখন খুব বেশী খারাপ, নানান অনটন—রসিকতার মাত্রা তখন বেড়ে যায়। রাগারাগির বদলে হাসাহাসিতেই বাঙালীরা বেশী পারঙ্গম বোধ হয়। মাস তুয়েক আগে, বাসে এক ভদ্রলোককে বলতে শুনেছিলুম—তিনি তখনও সর্ষের তেল খান নিজেই সর্ষের ফুল থেকে বানিয়ে। কিন্তু অত সর্ষের ফুলই বা

পাচ্ছেন কোথায় ? নিজের দু'চোখ থেকে। উচ্চাঙ্গের রসিকতা নয়, কিন্তু বলার ভঙ্গি !

ঐরকম ভাবেই এক ডাক্তারের গল্প শুনেছি। ডাক্তারের এক রোগী এসেছে, তার বিষম মাথাধরার অসুখ। কিছুতেই সারছে না। অনেক চিকিৎসা করা হলো। শেষে ডাক্তার বললেন, আপনার ব্রেনটা খুলে রেখে যান, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখি। রোগী ভদ্রলোকের মাথা থেকে সবটুকু ব্রেন খুলে একটা কাচের বাসনে রাখা হলো, ডাক্তার তাকে বললেন এক মাস বাদে আসতে। তারপর এক মাস যায়, দু মাস যায় রোগী আর আসে না ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার নিজেই পড়লেন মহা চিন্তায়। লোকটার হলো কি ? মরেই গেল, না কি হলো ? আর যদি বেঁচে থাকে, তবে ব্রেন ছাড়া কাজকর্ম করছে কি করে ? অথচ লোকটার কোনো সন্ধান নেই।

অনেকদিন বাদে ডালহাউসি স্কোয়ারে লোকটিকে দেখতে পেলেন ডাক্তার। গাড়ি থামিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন, ও মশাই, শুনছেন, শুনছেন !—কাছে এসে ভাবলেশহীন মুখে লোকটি বললো, কি ব্যাপার ?

—আচ্ছা লোক তো আপনি, আর এলেন না ? আপনার ব্রেন যে আমার কাছে রয়ে গেছে !

—থাক্। ওটা আর আমার দরকার নেই। আমি সরকারী অফিসে চাকরি পেয়ে গেছি।

ওড্‌হাউসের অনুকরণ, তাতেও ক্ষতি নেই। দু'জন লেখক একদিন আমাকে বলেছিলেন, পৃথিবীতে সব রসিকতা শেষ হয়ে গেছে, খাঁটি নতুন রসিকতা নাকি হবার উপায় নেই। আমিও একটি বিদেশী প্রবন্ধে পড়েছিলাম, পৃথিবীতে সত্যি-কারের নতুন কোনো 'গল্প' আর বানানো সম্ভব নয়। এগারো রকমের বেশী প্লট হতে পারে না। এখন শুধু পরিবেশ নতুন হবে। সেই জন্যেই হয়তো পুরোনো রসিকতায় আর একটি লোককে নতুন করে খুশী হতে দেখলুম। সম্প্রতি বাসের ভাড়া বাড়ায় তিনি দুঃখিত হন নি। মহা খুশী হয়ে বন্ধুকে বলছেন, আমার ভাই ভালই হলো, আগে হেঁটে অফিসে যাওয়া-আসা করে চব্বিশ নয়া পয়সা বাঁচাতুম, এখন হেঁটে গেলে বাঁচবে তিরিশ পয়সা। বাস ভাড়া আরও বাড়লে আমার ব্যাঙ্কে বহু টাকা জমবে।

আর একটি সুন্দর কথা শুনেছিলাম এক বৃদ্ধের মুখে। হাতে একটি দেড় কিলো রুইমাছ ও কয়েকটি নধর ফুলকপি। একজন জিজ্ঞেস করলো, 'কি গণেশদা, এই বাজারে অত বড় মাছ ? বাড়িতে মচ্ছব নাকি ?' 'না ভাই,

বুড়ো হলুম, ছেলেটাকে চাকরিতে ঢোকাতে হবে তো! এখন থেকে সাহেবকে নিজের গাছের রুইমাছ আর পুকুরের ফুলকপি না দিলে চলবে কি করে?'

আর চিড়িয়াখানায় সেই লোকটির চাকরি করার গল্প? কে না জানে ঐ গল্প। একদিন ট্রামে বসে একজন লোককে ঐ গল্পটি বলতে শুনে এমন বিরক্ত হচ্ছিলুম। সবচেয়ে খারাপ লাগে জানা রসিকতা অপরের মুখে শুনতে—নিজে বার বার বলতে খুব খারাপ লাগে না যদিও। কিন্তু গল্পটার শেষ শুনে বুঝলুম, বক্তা একজন সত্যিকারের শিল্পী। পাঠক, ধৈর্য ধরে আর একবার শুনুন। বক্তা অবশ্য কানাই নামে তার কোন এক চেনা লোকের নামে গল্পটা চালাচ্ছিলেন। অর্থাৎ কানাই এম এ পাস করেও কোনো চাকরি পাচ্ছিল না। তারপর, তার এক মুরুব্বি তাকে চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়ে দিল। চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জীটা মরে গেছে, তার খাঁচায় শিম্পাঞ্জীর ছাল পরে কানাইকে থাকতে হবে। কয়েকদিন বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করেও কানাই ওপরওলার মন পেলো না। (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে বিষণ্ণ শিম্পাঞ্জীকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন—তা বোধ হয় ঐ ছদ্মবেশী কানাইকে দেখেই) ওপরওলা এসে ধমকে কানাইকে বললেন, এরকম মানুষের মতো চুপ করে বসে থাকলে তার চাকরি যাবে। সুতরাং তারপর থেকে দর্শক এলেই নেচে-কুঁদে কানাই খুব খেলা দেখাতে লাগলো। তার ধরে ঝুলে ডিগবাজী খেয়ে তার কসরত হলো দেখবার মতো। শেষে একদিন দর্শকদের মধ্যে দেখতে পেল ওর কলেজের সহপাঠিনী অরুণা সান্যালকে। কোনোদিন অরুণার মন পায়নি কানাই। আজ তাকে খুশী করার জন্য শিম্পাঞ্জী-বেশী কানাই মহা লম্ফঝম্প জুড়ে দিল! তারপর একবার হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় গিয়ে পড়লো পাশের খাঁচায়। সে খাঁচাটা বাঘের। বাঘ থাঁটি হালুম গর্জন করে এক লাফে এসে পড়লো ভয়ে আধ-মরা কানাইয়ের কাছে। তক্ষুনি তাকে না খেয়ে ভালো করে শুঁকে দেখতে লাগলো। তারপর কানাইয়ের কানের কাছে মুখ এনে বাঘ বললো, ভয় নেই দাদা, আমিও বাংলার এম. এ!

১৫

*****

এমন সময় ধাক্কা লাগলো। ল্যাণ্ডো গাড়িটা দিশাহারা হয়ে প্রথমে সবগুলো চাকা বেঁকে,—সেই সময় প্রবল হায়-হায় ধ্বনি জনতার—পিছন দিকে গড়িয়ে যেতে লাগলো বেগে, আর ঐ প্রবল, তেজী, দৃপ্ত বেগবান পুরুষ অশ্ব সেই টানে পিছিয়ে যাচ্ছে, সামনের দুটি পা শূন্যে তুলে থামাবার চেষ্টা করলো পিছিয়ে যাওয়া গতি। পারলো না। কোচোয়ান আগেই মাটিতে পড়ে গেছে। চি-হিঁ-হিঁ আর্তকণ্ঠ না আক্রোশের হুঙ্কার কি জানি। অমন শক্তিমান ঘোড়া, পিছনের দুই পা ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়েও রুখতে পারলো না নিজেকে বা গাড়িটা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ওর চারপাশে মানুষের গোল বৃত্ত।

আমি দোতলার জানলা দিয়ে দেখছিলাম। বৃষ্টি না হওয়া মেঘের কোমল ছায়ায় চমৎকার সন্ধেবেলা দোতলা বাসের জানলার পাশে বসতে পাওয়ার গর্বে আমি বাসের মানুষদের দিকে আর একবারও তাকাইনি। টিকিটের পয়সা হাতে নিয়ে বাঁ-হাত বাড়িয়েছিলাম অবহেলায়। যেন ওজন্য আমাকে বিরক্ত না-করা হয়। আমি সর্বক্ষণ বাইরে তাকিয়েছিলাম। তাকিয়ে মেঘ দেখছিলাম না অবশ্য, মেঘে কারুর মুখের ছায়া না ভাসলে বেশিক্ষণ দেখাও যায় না, আমি নিচের দিকে তাকিয়ে খানিকটা করুণার দৃষ্টিতে মন্থর মানুষের স্রোত দেখছিলাম।

সেই সময় ঘোড়ার গাড়িটা আমার চোখে পড়ে। ল্যাণ্ডো বা টম্‌টম্‌ কি বলে ওগুলোকে আমি ঠিক জানি না, এক-ঘোড়ার গাড়ি, গাড়ির রং মসৃণ চকচকে কালো, ঘোড়ার রং সাদা—পুরো সাদা নয়, শিরদাঁড়া ব্যাপী লালচে প্যাচ, কোচোয়ানের মাথায় মুরেঠা, তকমা-আঁটা পোশাকে পিছনে দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ার-দার। উত্তর কলকাতার দু'একটি বনেদী বাড়িতে এখনো কয়েকটি এরকম গাড়ি আছে জানি, কিন্তু সহসা চোখে পড়ে না, এ গাড়িটাকে দেখে মনে হয় যেন অকস্মাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে উঠে এলো।

গাড়িটা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রবল ইচ্ছে হলো, গাড়িটার মধ্যে যিনি বা যাঁরা আছেন তাঁদের দেখার জন্য। এই সব অভিমানী, পরাজিত তবু মুখে অহংকারের হাসি ফোটানো মানুষদের দেখতে এখনো খুব কৌতূহল হয়। বনেদী-বাড়িগুলো থেকে এই সব জুড়িগাড়ির চল বন্ধ হতে শুরু করে মোটরগাড়ি আসবার পর—এখন অবশ্য, সেসব বাড়ির অনেকেরই আর জুড়ি বা মোটর কোনোটা রাখারই সামর্থ্য নেই। মনে আছে, একবার আমি আমার এক বন্ধুর বাড়ির অন্দর-মহলের শয়নঘরে গিয়েছিলাম। বন্ধুটির পূর্বপুরুষ কলকাতার অভিজাত সমাজের একজন ছিলেন। ওদের রং-জ্বলা কুৎসিত বিরাট বাড়িটির খিলান ও মণ্ডপ, ধুলোয় ঢাকা ঝাড়লণ্ঠন দেখলে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু দেখে-ছিলাম, বন্ধুটির মা রান্না করছিলেন একটা বেনারসী শাড়ি পরে। পুরনো খাঁটি, ভারি চমৎকার, অত্যন্ত দামী শাড়ি—কিন্তু ওর মাকে রান্নাঘরে দেখে সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম, ওদের দারিদ্র্য কত নৃশংস জায়গায় এসেছে, দারিদ্র্যের এমন বীভৎস রূপ আমি শিয়ালদার ফুটপাথে মরে থাকা ভিখারীর মধ্যেও দেখিনি। বন্ধুর মা আমাকে দেখে কিছুটা যেন অপ্রস্তুত হয়েছিলেন, পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করি, তিনি আশীর্বাদ করার সময় একটু হেসেছিলেন, চাপা বিষাদময় ক্রুদ্ধ অভিমানের হাসি।

ল্যাণ্ডোর আরোহীদের সহজে দেখতে পাইনি। পর্দা ফেলা ছিল না, কিন্তু ঘোড়াটা দুল্‌কি চালে ছোটার বদলে বেশ জোরে দৌড়োচ্ছিল। কখনও ডবল ডেকারের পাশাপাশি আসে নি। ভালো জাতের, বোধহয় একেই ওয়েলার ঘোড়া বলে, ঘোড়াটার মধ্যে যেন পাল্লা দেবার স্পৃহা এসেছিল। মাঝে মাঝে আমাদের বিরাট দৈত্যের মতন বাস হুস্ করে ওকে পেরিয়ে বহুদূর এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াটা তখন গ্রীবা ফিরিয়ে দেখছে। আবার স্টপে এসে বাস থামার সময় লোকের ভিড়, জেনানাদের ওঠা-নামার অবকাশে টক্ টক্ টক্ শব্দে ঘোড়ার গাড়ি আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াটা তখন আর অবহেলায় বাসের দিকে চেয়েও দেখছে না। একবার কি একটা কারণে পথ আটক, বাস ও ল্যাণ্ডো দুটোই থামলো, ঘোড়াটার থেমে থাকা যদিও পছন্দ নয়—অসহিষ্ণুভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। তখন আমি আরোহীদের দেখতে পেয়েছিলাম।

একটি নবীনা নারী ও একজন প্রবীণ পুরুষ। দু'জনের বয়সের ব্যবধান অন্তত পঁচিশ। অর্থাৎ মেয়েটির বয়েস কুড়ি থেকে পঁচিশ হলে, পুরুষটি পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। যে-রকম হয়, দু'জনেই অত্যন্ত গৌর বর্ণের, সুকুমার স্বাস্থ্য, মেয়েটি সেই জাতের সুন্দরী যাদের মুখ বিনা প্রসাধনেও অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়, ওর

চোখ দুটি নিশ্চিত লক্ষণ সেনের কাটা দিঘির জলের মতো কালো ও গভীর—আমি ভালো করে না দেখতে পেয়েও বুঝেছিলাম।

মানুষের স্বভাবই এই, সকলেরই কিনা জানি না, অত্যন্ত আমার—কোনো অচেনা নারী-পুরুষ একসঙ্গে দেখলেই তাদের সম্পর্কটা মনে মনে ভাবা। বাগ্-দত্তা-দত্তা, প্রেমিক-প্রেমিকা, দিদির বর ও স্ত্রীর বোন, স্বামীর বন্ধু ও বন্ধুপত্নী, দাদার বন্ধু ও বন্ধুর বোন, দুই শত্রুপক্ষ অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি, এসব জানার আমার কোনো দরকার নেই, একটি যুগলকে এই কয়েক মিনিট দেখছি আর হয়তো জীবনে দেখবো না—ওদের সম্পর্কে জেনে কি লাভ আমার, তবু মন এসব যুক্তি মানে না, মাথার মধ্যে আন্দাজের পাশাখেলা চলে। মোটরগাড়ির যাত্রীদের দেখে আন্দাজ করা খুব শক্তও নয়, গাড়ি বা ট্যাক্সিতে দু'জন নারী-পুরুষ যখন কঠিন মুখে দু'জন দু'দিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকে, তখন নিশ্চিত বোঝা যায় ওরা স্বামী-স্ত্রী, একটু ঘনিষ্ঠ, পথচারীদের সম্বন্ধে উদাসীন, কিছুটা বিসদৃশভাবে বসে থাকা যুগল দেখলে গোপন সম্পর্কের কথা মনে আসে।

কিন্তু এদের দেখে কিছুই বোঝা যায় না। এরা ঠিক কঠিন মুখে নয়, কিন্তু চাপা বাশভারি গাম্ভীর্য নিয়ে এবং হেলান দিয়ে নয়, দু'জনেই উন্নতদেহে বসে আছে। যেন পথ চলতে প্রগল্‌ভতা, কথা বলা, ওদের মানায় না। ওরা পিতা-পুত্রী, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী যা কিছু হতে পারে।

বাধা সরে যেতেই আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। অসহিষ্ণু ঘোড়াটা এবার ছুটতে লাগলো খুব জোরে। যেন এবার আর কিছুতেই সে ডবল-ডেকারকে এগিয়ে যেতে দেবে না। এবারই সত্যিকারের প্রতিযোগিতা, কেউ হ্যাণ্ডিকাপ পায় নি, একই খড়ির দাগ থেকে দৌড় শুরু করেছে। ঘোড়াটার জন্য আমার মায়া হলো, অমন সুন্দর জন্তুটা—ঘোড়ার মতো সুন্দর প্রাণী আর বোধহয় পৃথিবীতে একটিও নেই—যার শরীরে প্রতিটি অঙ্গ সুষম, অমন সুন্দর জন্তুটা হেরে যাবার দুঃখ পাবে! মনে মনে ভাবলুম, হেরে গেলেও তোর দুঃখ নেই রে, মরে গেলেও তুই গতির প্রতীক হিসেবে বেঁচে থাকবি চিরকাল, এই ডবল-ডেকারও বোধ-হয় হর্স পাওয়ার দিয়ে মাপা। ঘোড়াটা তবু জেতার দারুণ চেষ্টায় ছুটছিল। সামনেই ট্রাফিকের লাল আলো, বাস আস্তে আস্তে থেমে গেল, ঘোড়াটা লাল আলো মানলো না, কি জানি কোচোয়ান থামাবার চেষ্টা করেছিল কিনা, ছুটে এগিয়ে গেল।

এমন সময় ধাক্কা লাগলো। ক্রস রোড থেকে আর একটা ডবল-ডেকার, ঘোড়ার চিঁ-হিঁর চেয়েও তীব্র যান্ত্রিক শব্দ উঠেছিল বাসের ব্রেক কষার। আমরা

স্পষ্ট দেখলাম দৃশ্যটা। ধাক্কা যেন লাগেইনি প্রায়, শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষে বাস থামার আগে ল্যাণ্ডো গাড়িটাকে যেন শুধু আলতোভাবে কোণাকুণি ছুঁয়ে দিল। তাতেই গাড়িটা ঝাঁকানি দিয়ে বেঁকে জোরে পিছিয়ে আসতে লাগলো, ঘোড়াকে পিছন দিকে টেনে কোচোয়ান নিচে পড়ে গেছে, ঘোড়াটা অসহায়ভাবে দু'পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েও থামতে পারলো না, পিছিয়ে আসতে আসতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ঘোড়া কি জীবনে পিছু হটেছে, অভ্যেস নেই পড়ে তো যাবেই। যাক, দুর্ঘটনা সামান্য।

আমি তৎক্ষণাৎ পথে নেমে এসেছিলাম। কিজন্য ঠিক জানি না। দেখা গেল একজন মানুষেরও প্রাণ যায় নি, পিছনের লোকটি আগেই লাফিয়ে নেমে গিয়েছিল, কোচোয়ান ওপর থেকে পড়ে গেলেও শুধু মাথা কেটেছে, রক্তাক্ত মুখ—কিন্তু জ্ঞান আছে, সুতরাং প্রাণের ভয় নেই। প্রৌঢ় ও যুবতীটি গাড়ি থেকে নেমে পাশাপাশি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, প্রৌঢ়ের একটি হাত থুতনিতে রুমাল চেপে ধরা, যুবতীটি অক্ষত, আগেরই মতো শান্ত। শুধু ঘোড়াটা চিৎ হয়ে ছটফট করছে, ওঠার সাধ্য নেই।

মানুষের যদিও দু'টি চোখ, কিন্তু একই সঙ্গে দু'চোখে দু'পাশের দুটি দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি কি করে দেখেছিলাম জানি না—একই সঙ্গে আমি ঐ শান্ত যুবতী ও মুমূর্ষু ঘোড়াকে দেখেছিলাম প্রতিমুহূর্ত। এমন একটা কাণ্ডের পরও কি করে অমন অবিচলিত, শান্ত হয়েছিল, একটুও ব্যস্ত হয় নি, উত্তেজিত হয় নি—স্থির চোখে মেয়েটি দেখছিল অত বড় জন্তুটার মৃত্যুর ছটফটানি। মেয়েটি এমন কিছু অসাধারণ নয়, সাধারণ সুন্দরী নারী—এমনকি ওর মাথার কাছে সিনেমার পোস্টারে যে নায়িকার মুখচ্ছবি আঁকা ছিল—তার কাছে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় এ মেয়েটি নিশ্চয়ই হেরে যাবে—তবু অমন কমনীয় গাম্ভীর্য ও পেল কোথায়, কি করে নির্নিমেষে দেখতে পেরেছিল একটা পুরুষ প্রাণীর মৃত্যু? মেয়েটি এমনভাবে দাঁড়িয়েছিল—যেন কলকাতায় কোনো পথে আগে সে কখনও দাঁড়িয়ে থাকে নি এতগুলো চোখের সামনে—এবং এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যে ওকে মানায় না—সে সম্বন্ধে ও পূর্ণ সচেতনা।

আর ঘোড়াটা মহাকাব্যের করুণতম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। ঐ বলশালী, বিশাল, জোয়ান অশ্ব চিৎ হয়ে পড়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াবার। মুখে বল্গা, চামড়ার ফিতের জটের মধ্যে আটকে থেকে ছিঁড়ে উঠে দাঁড়াবার প্রয়াস, প্রকাণ্ড সাদা পেটটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, বিশাল চোখ ঘুরছে অসহায়, বিহ্বল, প্রবল ত্রাসে। ঘোড়া কোনোদিন বসে না, শোয় না, চিৎ হয়ে

ডা মানে তো নিশ্চিত মৃত্যু! এমনভাবে পা ছুঁড়ছে যে, কারুর সাহস নেই ওকে তুলে দেবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ আমার মনে হলো, এই যেন কলকাতার শেষ ল্যাণ্ডো গাড়ির শেষ ঘোড়া। অবলুপ্তির আগে আরেকবার শেষ চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াবার। ওর সুদৃশ্য দেহের বলবান পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে চেষ্টায়। পারবে না, তা তো জানিই কিন্তু এত পায়-হাঁটা মানুষের ভিড়ের মধ্যে ওর ঐ পতন, মৃত্যুর চেয়েও করুণ। ঘোড়াটার মুখ দিয়ে সাদা গেঁজলা বেরিয়ে শরীর নিথর হয়ে গেল।

একটাও মানুষ মরে নি শুধু নিতান্ত একটা ঘোড়া এ খবর জেনে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ছত্রভঙ্গ হলো কৌতূহলী জনতা।

১৬

*****

এমন গ্রীষ্মে এত অসংখ্য ফুল ফুটলো কেন এ কলকাতায় ? যেখানে যে-কোনো সবুজের অস্তিত্ব আছে, এরণ্ড কিংবা মহাদ্রুম, প্রত্যেক সবুজের সঙ্গেই অন্য একটা রঙের ফুল ফুটেছে, এমনকি, ময়দানের ঘাসেও ফুটেছে ঘাসফুল। এত ফুলের বাহার দেখে, হঠাৎ আমার অনুতাপ হলো, কেন আমি সব ফুলের নাম জেনে রাখি নি আগে। নাম না জেনে ফুলকে আদর করা যায় না। শেক্‌সপীয়র ভুল বলেছিলেন, কিংবা অনেক বদলে গেছে ফুল ও মেয়েরা, মেয়েদের যে-কোনো নামে ডাকা যায়, বিয়ের পর তো সব মেয়েরই নাম বদলে যায়, অনেক সময় ডাক নামও, কিন্তু গোলাপকে চামেলি নামে ডাকা কে সহ্য করবে ? 'গন্ধরাজ' শুনলেই যেমন অন্ধকারে পাতার আড়ালে লুকানো রাজমুকুটের মতো সেই ফুলটি চোখে ভাসে, ওকে আর অন্য নামে ডাকা সম্ভব ? 'রজনীগন্ধা' নামটা কোথাও উচ্চারিত হলে, কেন জানি না, আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, আরাকানের পাহাড়ে পাহাড়ে পলাতক সুজার কোনো এক যুবতী কন্যার শরীর। খুব স্পষ্ট মনে পড়ে, যেন গত বছরের স্মৃতি। যেমন ভাটফুল। ঐ নামের ফুল আমি কখনও চোখে দেখিনি কিংবা দেখলেও চিনি না, কিন্তু কি জোরালো নাম! শুনলেই শরীর কাঁপে। আমি নিশ্চিত জানি, যে দিন আমি প্রথম ভাটফুল দেখবো, আমাকে নতজানু হয়ে বসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। দোতলা বাসে যেতে যেতে ময়দানের একটা উঁচু গাছের মাথায় ঝাঁকে ঝাঁকে বসে থাকা হলুদ ফুল দেখলাম। ও ফুলগুলোর নাম কি ? কে যেন বললো, রাধাচূড়া। সব সময়ই কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছের উল্টো দিকে রাধাচূড়ার গাছ থাকে। কিন্তু যতক্ষণ না এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ হলদে ফুলগুলোকে পুরোপুরি তারিফ করতে পারছি না। ফুলের নামের মূল্য অনেক।

আমার বন্ধু সমীর আমাকে বিপদে ফেলে গেল। চৌরাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে

কিছুক্ষণ কথা বলছিলাম, ওর হাতে দুটো চাঁপা ফুল ছিল। একবার অন্যমনস্ক-ভাবে ওর হাত থেকে ফুল দুটো একটু নিতেই, সঙ্গে সঙ্গে ও বললো, ফুল দুটো তোমাকে দিলাম। তারপর আমাকে প্রতিবাদ করার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়ে —আচমকা কোনো মানুষকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে পালিয়ে যাবার মতো, ও ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি অসহায় ও বিমূঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতে চাঁপা ফুল দুটো। চাঁপা ফুল! ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে; এ-ফুল আমি হাতে রেখে কি করবো? অথচ আমার পকেটের অন্ধকারে সিগারেটের প্যাকেটের পাশাপাশি, কিংবা রুমালের সহবাসে এ-ফুল রাখার নয়। আমার হাতে দুটো চাঁপা ফুল নিয়ে আমি সারা রাস্তা ঘুরবো, এ দৃশ্য আমার কাছেই কল্পনাতীত। ফুল হাতে রাখার নয়, অন্য কারুকে দিয়ে দেবার। সমীর বোধহয় এ-ফুল দেবার মতো কারুকে পায় নি, তাই আমার হাতে তুলে দিয়েই লজ্জায় দ্রুত ছুটে পালালো। কিন্তু, আমি কাকে দেবো এই ফুল? তাছাড়া, আমার হাতে ফুল থাকা বেশীক্ষণ নিরাপদ নয়।

এখানে ফুল সম্পর্কে আমার একটি অত্যন্ত কুস্বভাব ব্যক্ত করি। আমি ফুল হাতে রাখা পছন্দ করি না। গাছ-টাছে ফুটে থাকলে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু হাতে নিলেই আমি তৎক্ষণাৎ মানুষের মতো হয়ে যাই। অর্থাৎ অত্যন্ত লোভ হয়। কোনো ফুল দেখে হঠাৎ খুব ভালো লাগলে আমার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। আমি অনেক ফুল খেয়েছি। ফুল খাওয়া দেখলে অনেকে চটে যায়। কি আশ্চর্য! যেন আমি মানুষ খুন করছি। কেউ কেউ বলে, ফুল নাকি বিষাক্ত হতে পারে। তারা নাস্তিক। আমি কোনো দ্বীপে গিয়ে 'লোটোস' নামের ফুল খেয়ে দেখি নি, কিন্তু, জবা কিংবা গন্ধরাজ, গ্যাঁদা কিংবা গোলাপ আমি খেয়ে দেখেছি, এমনকি পদ্মফুল, পোস্তফুলও, ওরা সবাই নিষ্পাপ। ফুলটাকে না খেয়ে শুধু গন্ধ শুঁকে বাহবা দেওয়া কিরকম অস্বাভাবিক লাগে আমার কাছে। ডলু মাসীর বাড়িতে গিয়েছিলাম, নিউ আলিপুরে জাপানী কায়দায় চমৎকার বাড়ি করেছেন, আমাকে করিডরের সারি সারি টবে ফুল দেখাচ্ছিলেন। জিনিয়ার সঙ্গে সন্ধ্যামালতীর ব্রিড করিয়ে উনি একটা হাল্কা রঙের নতুন ফুল তৈরি করেছেন। আমি দেখে এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে নিচু হয়ে ঝুঁকে গন্ধ শোঁকার ছলে একটা পাপড়ি দাঁত দিয়ে কেটে চিবিয়ে দেখলাম। ডলু মাসী এমন আঁতকে উঠলেন, বাড়ির সব লোকজনকে ডেকে এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা করলেন যে, বিরক্ত হয়ে আমি ও বাড়িতে আর যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি!

সেই থেকে খানিকটা সজাগও হয়েছি অবশ্য। এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি

যদি চাঁপা ফুল দুটো কচ্‌কচ্‌ করে চিবিয়ে খাই এখন, তবে এখুনি আমায় হয়তো এক হাজার লোক ঘিরে ধরবে। ভাবতেও আমার পিঠ শিরশির করে উঠলো অথচ ইচ্ছেও করতে লাগলো খুব। স্বাধীনভাবে শিল্প-চর্চা করার কত বাধা! দুনিয়াটাই ফিলিস্টিনে ভর্তি।

তবু আমি নোখ দিয়ে একটা পাপড়ির কোণ ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দেখলুম। নিখুঁত। তৎক্ষণাৎ আমার মনে হলো, এ ফুল নিশ্চয়ই উর্বশী চাঁপা। ফুলের শ্রেষ্ঠ চাঁপা, চাঁপার শ্রেষ্ঠ উর্বশী চাঁপা। দেখেই একটু মনে হয়েছিল। উর্বশীর মতোই এ চাঁপার গায়ের রং, উর্বশীর বাঁ হাতের মাঝখানের আঙুলের মতো এর গড়ন।

উর্বশী চাঁপা আমাকে প্রথমে চিনিয়েছিলেন ডি কে। সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত যখন এল্‌গিন রোডে থাকতেন, ওঁদের বাড়ির পাশে ছিল একটা বিরাট চাঁপা ফুলের গাছ। চাঁপা ফুলের অত বড় গাছ আগে কখনও দেখি নি, বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। ও গাছটায় বারো মাস ফুল ফুটতো। সব গাছেরই ফুল ফোটার একটা নির্দিষ্ট ঋতু আছে, কিন্তু এক একটা চাঁপা ফুল গাছ চির-যৌবনা। সারা বছরই ফুল ফোটায়, উর্বশীর মতই ভালোবাসার দিনক্ষণ মানে না। ডি কে আমাদের মাঝে মাঝে সেই ফুল দিতেন, আমি খেয়ে দেখেছি, ও-রকম স্বাদ অন্য ফুলে জীবনে পাই নি কখনও।

কিন্তু, এখন এই দুটো ফুল নিয়ে আমি কি করবো? তামাকের গুঁড়োর সঙ্গে মিশিয়ে ওদের আমি পকেটে রাখতে পারি না। আবার বেশিক্ষণ হাতে রাখার ধৈর্য নেই। হাতে নিয়েই বা কোথায় যাবো? কাকে দেবো? এই ফুল কোনো মেয়ের হাতে তুলে দেবার মতো সর্বনেশে কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। কোন্ নারীর কাছে গিয়ে আমি বলতে পারি, নাও, তুমিই এই ফুলের যোগ্য! মেয়েরা ফুল সহ্য করিতে পারে না, কিংবা ফুলের যোগ্যতা! আমি হর্টিকালচারল গার্ডেনে ফুলের প্রদর্শনী দেখতে প্রতিবার যাই। ওখানে অনেক মেয়ে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাজসজ্জা করে আসে। আমি ঠিক কাদের দেখতে যাই, নিঃসন্দেহে জানি না। তবে ঐ ফুলের বাগানে আমি সজ্জিত মেয়েদের শত শত দুঃখিত মুখ দেখেছি। ঈর্ষার দুঃখ। সঙ্গী পুরুষরা যখন রক্তগোলাপের ঝাড়ের দিকে উৎসুক মুখে চেয়ে থাকে, তখন দেখেছি মেয়েদের মুখে অন্যমনস্ক ঈর্ষা। ওরা সেই ফুলের পাশে কতখানি যোগ্য এই দ্বিধা। মেয়েদের হাতে যখন কেউ কোনো ফুল তুলে দেয়, তখন আমি লক্ষ করেছি সেইসব মেয়েদের মুখ। মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মুখগুলি ক্ষণকালের জন্য চলে যায় ভুল স্বর্গে। ভাবে, দাতা বুঝি কুসুমের বদলে গ্রহীতাকেই বিজয়িনী করলো।

যাক্ কিন্তু আমি ফুল দুটো নিয়ে কী করবো ? চেনা মেয়েদের কথা দূরে থাক্, পথের যে-কোনো সুন্দরী মেয়েকে হঠাৎ ডেকেও আমি ফুলদুটো দিতে পারি না,—দিয়ে বলতে পারি না, এই নিন্, এ শুধু আপনার সৌন্দর্যের প্রতি নির্লোভ স্তুতি। এ দেশে ওরকম নীতি নেই। স্তুতি জিনিসটাকে আজকাল আর কেউ নির্লোভ ভাবে না। সেইজন্যই তো কবিদের আর স্থান নেই এ সমাজে।

শেষপর্যন্ত আমি বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলুম, ফুল দুটো নিয়ে একি ঝঞ্ঝাট ! এই দুটো সুগন্ধ ফুল আমার সন্ধেবেলাটা নষ্ট করে দিচ্ছে, আমি এতক্ষণ চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি স্থাণুর মতো। কি করবো এদের নিয়ে, না জেনে। শেষ-পর্যন্ত কি ফুল দুটো শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে ? ঠিক করলুম, খুন করবো ওদের। কুসুম হত্যায় নারী হত্যার অপরাধ নেই। ইচ্ছে হলো, নির্মল আঙুলে ওদের ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলি। কিন্তু এমন রাগ চড়তে লাগলো আমার, মনে হলো ঐ শাস্তিও যথেষ্ট নয়। তখন ঠিক করলুম, ওদের ট্রাম লাইনের ওপর ফেলে দেবো, তারপর পরপর ট্রাম এসে ওদের থেঁতলে দেবে—সেটা আমি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখবো। আমি রাস্তার এ পাশে দাঁড়িয়ে ফুল দুটোকে দূরের ট্রাম লাইনের দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

ঘটনা গল্পের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক হয়। হুস করে একটা কালো মোটরগাড়ি এলো মাঝপথে, ফুল দুটো গাড়ির জানলা দিয়ে গিয়ে পড়লো একটি মেয়ের কোলে। আমি ভয় ও লজ্জায় সরু হয়ে গেলাম। আমি ফুল খেতে পারি, কিন্তু অচেনা মেয়ের গায়ে ফুল ছুঁড়ে দেবার মতো রোমান্টিক কু-কীর্তি করা আমার স্বপ্নের অতীত। সম্পূর্ণ আকস্মিক এই কাণ্ড। গাড়িটা একটু দূরে গিয়েই থেমে গেল। আমি চোরের মতো সরে গিয়ে গ্যাসপোস্টের আড়ালে লুকোলুম। মনে মনে তখন আমি হাতজোড় করে আছি। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবার ইচ্ছে হলো না, বা সাহস।

গাড়িটা একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো, আহা কি রূপ মেয়েটির, সরল দীর্ঘ শরীর বাটিকের কাজকরা সিল্কের শাড়িপরা, কালো কোঁকড়া চুলের মধ্যে যেন গন্ধরাজ ফুলের মতন মুখখানা ফুটে আছে। মেয়েটি এদিকে এগিয়ে এলো। তারপর গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো একটি যুবা। এর রূপেরও তুলনা নেই—আরবদের মতো দেহ, কিন্তু কমনীয়, সাহেবী পোশাকপরা, দাড়ি কামাবার পর ফর্সা মুখে নীলচে আভা পড়েছে। দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল, এ রকম সুসদৃশ জুটি কদাচিৎ চোখে পড়ে। এ রকম যৌবনবন্ত দম্পতি দেখলে সত্যিই আনন্দ হয়। এদের উচিত নয় আমাকে

রাগ করে শাস্তি দেওয়া। ওরা যেমন মনের সুখে যাচ্ছিল, তেমনিই চলে যাক্ না মনের সুখে। দুটো ফুল আর কি বিঘ্ন ঘটাবে!

ছেলেটি দ্রুত এসে মেয়েটির বাহু ছুঁয়ে বললো, আঃ সুনন্দা, এসো। গাড়িতে ফিরে এসো, কি দরকার!

—দাঁড়াও একবার দেখে যাই, লক্ষ্মীটি!

—কাকে?

—আমি জানি কে ফুল ছুঁড়েছে!

হঠাৎ পুরুষটি মেয়েটির বাহু থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে বললো, তুমি তাহলে আজও অজয়কে ভুলতে পারোনি?

মেয়েটি অসহায় ভাবে বললো, একটু দাঁড়াও। রাগ করো না। একবার অন্তত দেখা করে যাই। এখানেই কোথাও নিশ্চয়ই লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একবার শুধু···

মেয়েটি আকুলভাবে তাকালো এদিক ওদিক। যুবকটি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। ওদের দেখে, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলুম, এ রকম অসুখী মুখ আমি আর জীবনে দেখি নি। জানতুম উর্বশী চাঁপা সর্বনাশিনী!

১৭

*****

নিউ মার্কেটে অনেকে যায় রকমারি মনোহারী জিনিসপত্র দেখে-শুনে কিনতে। আবার কেউ কেউ যায়—যারা কিনতে এসেছে, তাদের দেখতে। আমার বন্ধু হরিশ ঐ দ্বিতীয় দলের। হাওড়ার দিকে একটা ইস্কুলে পড়ায় হরিশ, থাকে ঐ দিকেই। কিন্তু প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা তাকে চৌরঙ্গী এলাকায় দেখা যাবে। বিলিতি সিনেমা হলগুলির সামনে—কোন্‌টার কখন শো-ভাঙে তার মুখস্থ, চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকে, যেন কাকে খুঁজছে—অথবা কেউ আসবে ওর জন্য—এমন প্রতীক্ষার মুখে তাকায় চৌদিকে—তারপর যখন সকলেই ঢুকে যায় হলের মধ্যে—ও তখন ছোট্ট একটু হেসে এগিয়ে যায়। শ্লথ পায় ঘুরতে ঘুরতে নিউ মার্কেটের মধ্যে যায়, বারবার চক্কর দেয়, গভীর মনোযোগ দিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলি দেখে, প্রত্যেকটি মুখ, এমন অধ্যবসায় ওর যে কোনো দোকানের মধ্যে ঢুকে যে তরুণী মহিলাটি অনেকক্ষণ ধরে কিছু কেনাকাটা করছেন—যার শুধু পিঠটুকু দেখা যাচ্ছে—আমাদের হরিশ কোনো ছুতোয় গ্লাসকেসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে, সেই মহিলাটির মুখ না দেখা পর্যন্ত নড়ে না। ততক্ষণে সিনেমা হলগুলিতে ইণ্টারভ্যাল শুরু হয়েছে, সুতরাং ব্যস্ত হয়ে হরিশ আবার বেরিয়ে যায়, ভিড়ের মধ্যে মিশে একটা সিগারেট ধরিয়ে এমন ঘন ঘন টানতে থাকে যে মনে হবে হরিশও হল থেকে বেরিয়েছে ইণ্টারভ্যালে, সিগারেট শেষ করেই আবার ঢুকে যাবে। তারপর দমকা ঝড়ে সবকটা শুকনো পাতা উড়ে যাবার মতো ঘণ্টা শুনে টিকিট-কাটা নারী-পুরুষেরা এক মুহূর্তে উধাও হয়ে যাবার পর—সম্পূর্ণ ফাঁকা আলো ঝলমল প্রবেশ পথে একা দাঁড়িয়ে থাকে হরিশ। একটু পরে আস্তে আস্তে বাসস্টপে এসে অনেকগুলো বাস ছেড়ে দেয়। বেশ আসক্ত এবং প্রীতিভরা চোখে পথের বিশেষ বিশেষ চলন্ত মূর্তিকে খুঁটিয়ে দেখে—। এক সময় বাস ধরে বেশ খুশী মনে বাড়ি ফিরে যায়। ভুলেও কোনোদিন ও কোনো সিনেমা হলের ভেতরে ঢোকে নি, নিউ মার্কেট থেকে একটিও জিনিস কেনেনি আজ পর্যন্ত।

পর পর তিনদিন হরিশের সঙ্গে আমার একই জায়গায় একই সময়ে দেখা হবার পর জিজ্ঞেস করলুম, কি রে, তুই এখানে রোজ কি করিস?

—বেড়াতে আসি।

—শালুকের ছুতোর পট্টি থেকে তুই রোজ চৌরঙ্গীতে বেড়াতে আসিস?

হরিশের বয়েস প্রায় তিরিশ, দোহারা ছিপছিপে চেহারা, টিকোলো নাক, বিবাহিত, বাড়িতে ডিমওয়ালা এলে প্রত্যেকটি ডিম জলে ডুবিয়ে পরীক্ষা করে তবে কেনে, জামা ছিঁড়ে গেলে শীতকালে কোটের নিচে পরবার জন্য আলাদা করে জমিয়ে রেখে দেয়, এ বছরের দোলের জামা কেচে তুলে রাখে আগামীবারের দোলের জন্য, রাস্তায় চারটে পয়সা কুড়িয়ে পেলে সঙ্গে সঙ্গে দুটো পয়সা দেয় ভিখিরিকে—এ হেন হরিশ রোজ চৌরঙ্গীতে নিছক বেড়াতে আসে? শুনে কি রকম আশ্চর্য লাগে। কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই হরিশের। চলতে শুরু করেছে, আমাকে সঙ্গে আসতে বলে। ওর সঙ্গে সঙ্গে আমিও পূর্ব-বর্ণিত ভ্রমণ দর্শন সমাপ্ত করি, চোখ দুটো বিস্ময়ের চিহ্ন করে। আমার দেখা পেয়ে বিরক্ত হয় নি, বরং একটু খুশীই হয়েছে হরিশ, মনে হলো। বললো, সন্ধের দিকে আগে একটা টিউশানি করতুম, ছেড়ে দিয়েছি। এখন এখানে রোজ বেড়াতে আসি। মনটা বেশ ভালো থাকে।

—কেন, এখানে রোজ রোজ কি দেখার আছে?

—দেখতে জানলেই দেখা যায়। কত সুন্দর সুন্দর মেয়ে-পুরুষ এখানে···

—তা ঠিক। কিন্তু—

—চোখ জুড়িয়ে যায়, ভাই! সারা কলকাতার ছাঁকা জিনিস দেখতে পাওয়া যায় যে-কোনো সন্ধেবেলা চৌরঙ্গী পাড়ায় এলে। এই সিনেমা হলগুলোতে, নিউ মার্কেটে কেউ খারাপ পোশাক পরে আসে না। খারাপ চেহারারও কেউ আসে না বড় একটা। আমার বড় ভালো লাগে দেখতে এদের।

—সে কি রে, শুধু শুধু ভালো জামাকাপড় পরা মেয়ে-পুরুষ দেখতে—

—মেয়ে-পুরুষটা কথার কথা। আমি আসি শুধু মেয়েদেরই দেখতে, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি।

—এটা একটা কাজের কথা বটে। কিন্তু তুই তো বেশ স্পষ্ট স্বীকার করলি।

—করবো না কেন? সুন্দর জিনিস দেখার মধ্যে লজ্জার কি আছে? সারা কলকাতার মধ্যে মাত্র এ জায়গাতেই তুই একসঙ্গে এত সুন্দর মেয়েদের দেখতে পাবি। স্বাস্থ্যবান, মুখে হাসি মাখানো, কি সুন্দরভাবে পোশাক পরতে জানে, প্রসাধন করতে জানে। চকচকে মুখ—কিন্তু পাউডার কিংবা পেণ্ট দেখতে পাবি না। কারুকে দেখতে প্রজাপতির মতো, কেউ চন্দনা পাখি, কেউ হীরামন। তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চকিত-হরিণী-প্রেক্ষণা ইত্যাদি ইত্যাদি

সংস্কৃত বিশেষণের সব রকম নায়িকা দেখতে পাবি এখানে। দেখলে চোখ সুস্থ হয়। থাকি ভাই বস্তির পাশে—সেখানে দিনরাত নোংরার মধ্যে চেল্লাচেল্লি, ইস্কুলে দেখতে হয়, কতকগুলো হাড় জিরজিরে ছেলে, পথে-ঘাটে সবসময় ভিখিরি-ফিকিরি আর কুচ্ছিৎ মানুষের মেলা—ওসব দেখতে দেখতে চোখ পচে যায়। এখানে এসে তাই রোজ খানিকটা সৌন্দর্য দেখে যাই। তুই অবশ্য বলতে পারিস, কেন সৌন্দর্য কি শুধু মেয়েদেরই মধ্যে ? প্রকৃতির—

—না, আমি তা বলতুম না।

—অন্য কেউ বলতে পারে। কিন্তু কি জানিস, কয়েকদিন গঙ্গার ঘাটে কিংবা শিবপুরের বাগানে প্রকৃতি দেখতেও গিয়েছিলাম। পোষালো না। গাছপালার প্রধান দোষ ওরা বদলায় না। একই রকম। কিন্তু প্রত্যেকটি মেয়ে আলাদা। এমন কি, এক একটা মেয়ে এক একদিন আলাদা। জানিস, আজকাল আমি নভেল-নাটকও পড়ি না। পড়ার দরকার হয় না। এখানে এতগুলো গল্পের নায়িকা। এদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করি কোন মেয়েটি স্বামীর গরবে গরবিনী, কে লুকিয়ে প্রেম করছে, কার স্বামী লম্পট, কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে অনেকদিন পর ছেলেবেলার প্রেমিকের, কে হঠাৎ দেখতে পেল নিজের প্রেমিকের সঙ্গে অন্য মেয়েকে। আমি সব বুঝতে পারি। পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি। ঐ যে মেয়েটাকে দেখছিস একা একা উদাসিনীর মতো ব্লাউজ পিস্ কিনছে—পরশুদিনই ওকে দেখেছি একটা সুন্দর ছেলের হাত ধরে ঘুরতে, হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল তার গায়ে। আজ ওর দুঃখে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে। তুই আসবি মাঝে মাঝে ?

যখন কলেজে পড়তুম একসঙ্গে, তখন হরিশ বলতো, সব মেয়েই গুপ্তচর। সবকটা মেয়েই স্পাই জানিস ? ও বেশ জোর দিয়ে বলতো। ওরা পৃথিবীতে এসেছে শুধু খবর বার করে নেবার জন্য। মেয়েরা জানে না এমন কোনো জিনিস আছে ? এমন কোনো ছেলেকে দেখেছিস—যে মেয়েদের কাছ থেকে কিছু লুকোতে পেরেছে ? মেয়েরা কাছে এসে ছলাকলা দিয়ে হেসে অভিমান করে ছেলেদের পেটের সব খবর বার করে। পেট বা হৃদয় যাই বলিস।

ছাত্রজীবনে আমি শব্দতত্ত্ব নিয়ে খুব মাথা ঘামাতাম। হরিশের এই অভিনব থিয়োরিরও গূঢ় কারণ আমি শব্দতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলাম॥ সে সময় আমরা খুব ফিল্ম দেখতাম—হরিশও ছিলো পাঁড় সিনেমাখোর, অবশ্য যদি অন্য কেউ ওর টিকিট কাটতো। ভালো ভালো বই এলে ও কারুকে ওর টিকিট কাটার জন্য

প্রায় হাতে পায়ে ধরতো। সে সময়ে আমাদের হৃদয়েশ্বরী ছিল ইনগ্রিড বার্গমান। ওকে মনে হতো স্বর্গের দেবী। ছায়াছবিতে ওর হাসি, অশ্রু আমাদের ঘন ঘন হৃৎকম্প ঘটাতো। ইনগ্রিড বার্গমানের একটা ছবিও বাদ দিতুম না। ওর নামের আদ্যাক্ষর দুটি নিয়ে আমরা আদর করে ওকে ডাকতুম আই বি। আই বি! আই বি থেকে স্পাই ভাবা খুব সহজ, সেই থেকেই হরিশের কাছে সব মেয়েই স্পাই। কিন্তু হরিশ এক সময় সব মেয়েদের গুপ্তচর ভাবতো, এখন দেখছি ও-ই মেয়েদের পেছনে গুপ্তচরগিরি করে বেড়াচ্ছে। পুরনো কথা মনে পড়তেই হঠাৎ আর একটি কথা মনে পড়লো। আমি বিষম উৎসাহে বললুম, হরিশ, আই বি কলকাতায় এসেছে।

—কে ?

—তোর মনে নেই। ইনগ্রিড বার্গমান। কাগজে ওর আসার খবর পড়েছিলাম, আজ দুপুরে দেখলাম গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে বেরুচ্ছে। ওঃ, এখনও কি রূপ।

—জানি। হরিশ বিমর্ষ গলায় বলেই চুপ করে গেল।

—কি রে। ইনগ্রিডকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে না? এত সৌন্দর্য দেখবার ইচ্ছে।

দেখেছি কাল সন্ধেবেলা নিউ মার্কেটে। কি হতাশ হয়েছি কি বলবো। এখানে যত রূপসী মেয়েদের দেখি—কারকে চিনি না, নাম জানি না—কিন্তু ওদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা কল্পনা করতে আমার ভালো লাগে, মনে মনে আমি ওদের সম্পর্কে গল্প বানাই। কিন্তু যাকে আগে থেকেই মনে মনে জানি তাকে স্বচক্ষে দেখলে কি খারাপ লাগে! ইনগ্রিড সম্পর্কে সব জানি, কটা বিয়ে, কটা ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু সিনেমায় ওকে মনে হত নন্দন-কাননের অপ্সরী। জারের হারানো মেয়ে চিরযৌবনা আনাস্টাসিয়া কাল তাকে নিজের চোখে দেখলাম—এরকম সাধারণ নগণ্য কুচ্ছিৎ মেয়ে কম দেখেছি। একবার হাই তুললো, দেখলাম, ওক··

—কি হলো রে।

—হাই তোলা অবস্থায় দেখলাম। একটা বিকট মুখ। ঘোড়ার মতো দুটো বিরাট মাড়ি। কেন যে দেখলুম ওকে। ওর সারা মুখে যা মাখানো দেখলুম—তা স্বর্গীয় সুষমা নয়, নিরবচ্ছিন্ন বোকামি। আমি আর কোনো কল্পনার রূপসীকে কাছ থেকে দেখতে চাই না। কেন ওর কথা মনে করিয়ে দিলি? বাড়ি যাই।

১৮

✻✻✻✻✻

দোতলা বাসের ঠিক সামনের জানালায় বসেছিলাম, তাই অমন সুন্দরভাবে দেখতে পেলাম দৃশ্যটা। সন্ধেবেলা অন্ধকার হয়ে এসেছে, বিশাল চকচকে চৌরঙ্গি, জ্বলে উঠেছে আলো! কীড্ স্ট্রীট যেখানে এসে মিশেছে চৌরঙ্গিতে, সেখানে মসৃণ কালো চওড়া চৌরঙ্গির ঠিক মাঝখানে একটি লোক শুয়ে আছে।

হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা থেমে গেল। সমস্ত লোক হুড়মুড় করে এসে উঁকি দিল জানালা দিয়ে। চৌরঙ্গিতে এরকম দৃশ্য আগে কেউ দেখে নি, অথবা দেখেছে হয়তো—দু' পাশের সিনেমা হলগুলোর মধ্যে পর্দায়—কিন্তু এমন জীবন্ত, রক্ত-মাংসের দৃশ্য। সত্যিই দৃশ্যটির কম্পোজিশনের তুলনা হয় না। চৌরঙ্গি রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে ধূধূ করা বিশাল, রবিবারের সায়াহ্ন হলেও পথে আর একটি লোকও নামে নি, শূন্য, কালো রাস্তার ঠিক মাঝখানে সাদা পোশাক পরা লোকটি শুয়ে আছে। এই সন্ধেবেলা ঐ লোকটাই যেন এ রাস্তার অধিপতি। দু' হাত দু' দিকে সম্পূর্ণভাবে ছড়ানো, পা দুটো টান করা। মুখে একটু বিকৃতি নেই, দুঃখ নেই, রাগ নেই—খানিকটা যেন উদাসীনতা। কষ দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে, দেখা যায় কি দেখা যায় না।

আমার সঙ্গিনী বললেন, 'উঃ কি ভয়ংকর দৃশ্য!'

আমি বললুম, 'তোমার ভয়ংকর লাগলো? আমার তো সুন্দর লাগছে। ঠিক ফাঁকা রাস্তার মাঝখানে—অমন হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা। সিনেমায় দেখলে তো আর্টের প্রশংসা করতে!'

—বাজে বক্‌বক্ করো না। চলো নেমে পড়ি। এক্ষুনি বাস পোড়াবে। আমি বললুম, না দেখে মনে হচ্ছে খানিকক্ষণ আগে ঘটে গেছে। বাস পোড়াবার হলে এতক্ষণে শুরু হয়ে যেত! কাছেই দেখলুম কয়েকটি পুলিস ও একটি অক্ষত একতলা বাস দাঁড়িয়ে আছে।

—তাহলে সরিয়ে নিয়ে যায় নি কেন? এটা কি সকলের দেখার জিনিস?

—নেবে, নেবে। অনেক রকম নিয়ম-কানুন আছে তো! চট্ করে ডেড বডি ছোঁয়া যায় না। তুমি মুখ ফিরিয়ে বসো না!

বাসের মধ্যে ততক্ষণ হই-হল্লা. জুতোর শব্দ, জিব ও ঠোঁটের সংযোগে যাবতীয় বিচিত্র ধ্বনি ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। কয়েকজন উৎসাহী নেমে গিয়ে কাছ থেকে দেখতে গেল, একজন কনস্টেবল কাছাকাছি এসে সরবরাহ করে গেল কিছু তথ্য। আমরা ওপরতলায় বসেই জানতে পারলুম লোকটির পকেটে কোনো কাগজপত্র নেই। এখনও অজ্ঞাত পরিচয়। সঙ্গিনীকে বললুম, 'একজন অজ্ঞাত পরিচয় মানুষের এর চেয়ে মহান মৃত্যু আর কী হতে পারে? সকলের চোখের সামনে. রাজার মতো!'

তিনি বললেন, 'একজন মানুষ মরলো, আর—'

—কলকাতা শহরের কোথাও না কোথাও এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আর আর একজন লোক মরছে। সারা পৃথিবীতে কয়েক শো—

—একি কথা হলো?

—কেন না? মরা ইজ মরা। মানুষ মরছে এবং মানুষ মরবে—এইটাই আসল। নিজেরা কতক্ষণ বেঁচে আছি সেইটাই বড কথা. অন্য লোকের মরা নিয়ে দুঃখ করার কী আছে? তা ছাড়া এই লোকটা হয়তো আত্মহত্যা করেছে। মরা আর আত্মহত্যা তো এক নয়!

—যাঃ ভাল্লাগে না। চলো নেমে পড়ি। নিচে গোলমাল হচ্ছে। এখনও হয়তো বাসে আগুন লাগানো শুরু হতে পারে।

—না, না, ভয় নেই। আগুন লাগলে গোড়া থেকেই লাগে। তা ছাড়া ওটা আগুনের গোলমাল নয়। বাস ছাড়তে দেরি হচ্ছে কেন হয়তো তা নিয়ে। আবার কেউ কেউ হয়তো বলছে আর একটু পরে, আমার এখনও দেখা হয় নি।

—তুমি তো সব-জান্তা!

—তুমি আগুন লাগাবার ভয় পাচ্ছো। আমি অন্য দৃশ্যও দেখেছি। সকাল দশটার সময় অফিসযাত্রী ভিড়ভর্তি গাড়িতে—ইংরেজীতে যাকে বলে সার্ডিন প্যাকড্—লোকে অদৃশ্য হাতল ধরে ঝুলে চলেছে—এমন সময় একজন লোক পড়ে গেল, পিছনের চাকায় দুটো পা-ই কাটা গেল তার। গাড়ি থেমে গেল, পুলিস আসবে—তারপর কতক্ষণে ও গাড়ি ছাড়বে কে জানে! বাস ভর্তি লোক চেঁচিয়ে উঠলো—পাশ কাটিয়ে টেনে চলো না ড্রাইভার দাদা। ব্যাটাচ্ছেলে মরার আর সময় পেল না—এই অফিসের টাইমে, এই নিয়ে তিনদিন লেট্!

—সত্যি, এমনভাবে গাড়ি চালায় না! উঃ কে কতক্ষণে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরবে—

—কি মুশকিল। গাড়ি চালাবার কি দোষ। মনে করো না—গাড়ি চাপা পড়াটা একটা নতুন রোগ। আগে বন্যায় প্রতি বছর হাজার হাজার লোক মরতো এখন বাঁধ দিয়ে বন্যা বন্ধ করা হয়েছে। কলেরা টাইফয়েড-টি বি হলে লোকে বাঁচতো না। এখন ওসব অসুখ তো নস্যি। তার ওপর শান্তির বাণী দিয়ে পৃথিবীর বড় বড় যুদ্ধ আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সব লোক তো চিরকাল বাঁচলে চলবে না। কিংবা সবাই থুথুরে বুড়ো হয়ে মরলেও অনেক ঝঞ্ঝাট। তাই প্রকৃতি তার নিজের রাস্তা খুঁজে নেয়। এখন দেখা দিয়েছে গাড়ি-চাপা রোগ। ক্যান্সারেরও ওষুধ বেরুবে, কিন্তু গাড়ি-চাপা রোগের ওষুধ বেরুবে না। কাগজে পড়ো নি—প্রত্যেক বছর ক্রিসমাসের সময় আমেরিকায় পাঁচ-ছ' শো লোক মারা যায়।

এর থেকে বাবা, যুদ্ধও ভালো।

—যুদ্ধ আর কি এমন। হিটলার যত লোক মেরেছে, তার চেয়ে পৃথিবীর বেশী লোক মেরেছে মোটর গাড়ি। কত বড় সাঙ্ঘাতিক অসুখ তাহলে এটা ভেবে দ্যাখো।

—অসুখে তবু লোকে ভুগে ভুগে মরে। এ একেবারে—

—বাঃ। তুমি কখনো শোনো নি—একজন লোক কথা বলছেন কথা বলছেন হঠাৎ এমন সময় উঃ বলে একেবারে অক্কা। কিংবা কোনো লোক খবরের কাগজ পড়ছে বসে বসে—হঠাৎ মাথাটা ঝুঁকে পড়লো সামনে, শেষ? থ্রম্বসিসেও অনেক সময় এই রকম হয়। অথবা, মাঠের মধ্যে গাছতলায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে—হঠাৎ কড়াৎ করে বাজ পড়লো! কিছু দিন আগে বুলু দাসগুপ্ত নামে একজন খুব ভালো ফটোগ্রাফার মারা গিয়েছিলেন এইভাবে—কাগজে পড়ো নি? এরকমভাবে মরলে তুমি কার ওপর রাগ করবে? কিসে আগুন লাগাবে? যতো রাগ গাড়ির ওপর।

—নিজে যেদিন পড়বে, সেদিন বুঝবে।

—নিজে পড়লে তো আর দুঃখ করার জন্য পরে বেঁচে থাকবো না। তুমি না হয় দু' এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে।

ইস্, বয়ে গেছে আমার।

—ভূত হয়ে এসে তাহলে ঘাড় মটকাবো তখন বলে দিচ্ছি।

মনোযোগ অন্যদিকে দিতে হলো। রাস্তা থেকে নতুন গোলমাল শুনে আমরা

আবার জানলা দিয়ে মুখ বার করে দেখলুম। সত্যি সত্যি কি গাড়িতে আগুন লাগবে না কি? না, পুলিসের আর একটা গাড়ি এসেছে, সেই সঙ্গে মৃতদেহ নিয়ে যাবার ভ্যান। দু'জন খাকি হাফশার্ট পরা লোক হাত-পা ধরে ঝুলিয়ে চ্যাংদোলা করে তুললো মৃত লোকটাকে। মধ্যবয়স্ক, মাথায় অল্প টাক, জোয়ান পুরুষ, মুখখানি প্রশান্ত। বয়ে নিয়ে যাবার সময় লোকটার একটা হাত লট্‌পট্‌ লট্‌পট্‌ করে ঝুলছিল। 'মড়ার হাত মাটি ছুঁতে চায়—' কমলবাবুর লেখায় পড়েছিলাম। এতক্ষণ নজর পড়ে নি, এখন দেখলুম লোকটার এক হাতে তখনও একটা ক্যালেণ্ডার শক্ত করে ধরা। প্রাণ ছেড়েছে কিন্তু ক্যালেণ্ডারটা ছাড়ে নি। ওঃ, লোকটি তাহলে আত্মহত্যা করে নি, আমি বুঝতে পারলুম। কারণ সময় ও ভবিষ্যৎ জানার ওর লোভ ছিল। 'ডেথ কাপীস নো ক্যালেণ্ডার'—ছেলেবেলায় ওয়ার্ডবুকে পড়েছিলুম হঠাৎ মনে পড়লো।

আমাদের বাস তখন ছেড়েই ছুটে চললো হু-হু করে। শীত ফুরিয়ে এবার বসন্তের মিষ্টি হাওয়া লাগছে গায়। আমার সঙ্গিনী আর একটিও কথা না বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। ওঁকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাতে লাগলো সেই মুহূর্তে। বুকের দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে আর কোনো দিকে না চেয়ে বসে রইলেন। আমি আর তাঁকে বিরক্ত করলাম না।

আমরা বেরিয়েছিলাম থিয়েটার দেখবো বলে। বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটার পর আমার সঙ্গিনী অকস্মাৎ বললেন আমি আজ আর থিয়েটার দেখতে যাবো না।

—সেকি! কেন?

—আমার গা গুলোচ্ছে। আমি বাড়ি ফিরে যাবো। উঃ, এরকম দৃশ্য যেন আমার কোনো শত্রুও কখনো না দেখে!

—কি ছেলেমানুষ তুমি। এ রকম সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেউ নিজের মন খারাপ করে! কত কষ্ট করে পেয়েছি টিকিট আর তোমার সঙ্গে এই সন্ধেবেলা। তা নষ্ট করবে? আমরা যারা বেঁচে আছি, আমাদের তো আনন্দে থাকতেই হবে। চলো থিয়েটার দেখি—

—থিয়েটার তো দেখলাম! রাস্তায় ঐ রকম দৃশ্য—আর সেই তোমার লেকচার!

১৯

✻✻✻✻✻

তর্কাতর্কি হচ্ছিল বাড়ির ঝি-চাকরকে অবসর সময়ে লেখাপড়া শেখানো উচিত না কি এই নিয়ে। প্রায় সকলেই এতে একমত ছিলাম, কিন্তু একবন্ধু রেগে উঠে বললেন, কি বিশ্রী ধারণা তোমাদের! বাড়িতে ঝি-চাকরদের লেখাপড়া শেখানো খুব একটা মহৎ কাজ হবে মনে করছো? বাড়িতে ঝি-চাকর রাখাই যে কত অন্যায়, সেটা বুঝতে পারছো না? আর কতদিন এরকমভাবে মনুষ্যত্বের অপমান করা হবে? প্রত্যেকের উচিত, নিজের নিজের পরিবারের কাজ নিজেদের করে নেওয়া। তাকিয়ে দেখো আমেরিকার দিকে। জানো, সেখানে স্বয়ং রকফেলারের বাড়িতেও চাকর নেই?

অপর বন্ধু বিনীতভাবে বললেন, জানি, কথায় কথায় আমেরিকার কথা উল্লেখ করা তোমার একটা কু-স্বভাব। আমরা কেউ আমেরিকায় যাইনি, সে দেশ দেখিনি। তবে যতদূর শুনেছি, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করা বোকামি—না, না, তোমার ক্ষেত্রে বোকামি বলছি না, বরং বলা যায়, বুদ্ধি ব্যয় করার আলস্য। ঝি-চাকর রাখার প্রয়োজনটা পারস্পরিক। সকলেই যদি ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়, তবে লোকে বাড়িতে ঝি-চাকরের কাজ করতে আসবে কেন? রিক্শা চাপা অমানবিক বলে এখনই সকলে রিক্শায় চড়া বন্ধ করে রিক্শাওলাদের না খেতে দিয়ে মেরে ফেলার মধ্যে কোন্ মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা আছে, আমি জানি না। আমেরিকার কথা আপাতত ভুলে, তোমার উচিত রাস্তার একটি ভিখিরির ছেলেকে তোমার বাড়িতে চাকরের কাজ দেওয়া, আর—

—হাঁ, চুরি করে সব ফাঁক করে দিক আর কি!

—সেটুকু লোক চেনার ক্ষমতা নেই? তাকে কিছু কিছু লেখাপড়া শেখালে, সে বরং পরে স্বাধীন জীবিকা নেবার সুযোগ পেতে পারে। আর, ভিখিরি হয়ে

থাকলে, সে পড়ে না খেয়েই মরতো বা চোর-গুণ্ডা হতো। একটু লেখাপড়া শেখালে আমাদেরও সুবিধে। অন্তত চিঠি ফেলে দিয়ে আসতে বললে—চিঠিটা রাস্তায় গিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবে না, কিংবা ঘড়িতে চাবি দিতে বললে—সারা বাড়ি খুঁজে চাবি নিয়ে আসবে না, কিংবা সেই যে, একজন তার চাকরকে বলেছিল—"আমায় যখন কেউ ডাকবে, তখন আগে তাকে বাইরের ঘরে বসাবে—তারপর আমায় খবর দেবে, বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে না।" তারপর একদিন চাকর এসে বলেছিল, "আজ্ঞে আপনাকে একজন ডাকছেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বসাতে পারি নি, শেষটায় শুইয়ে রেখে এসেছি!"—অর্থাৎ টেলিফোন!

অপর একজন বন্ধু বললেন, চাকরদের লেখাপড়া শেখানো খুব ভালো। কিন্তু তাতে অনেক মূল্য দিতে হয় নিজেদেরও। আমাদের বাড়িতে শত্রুঘ্ন বলে একটি চাকর ছিল। বেশ জোয়ান, ছটফটে ছেলেটা। বড়দা তাকে লেখাপড়া শেখালেন। ছেলেটার মাথাও ছিল, চটপট অনেকখানি শিখে গেল। তারপর বড়দা তাঁর বন্ধুকে বলে কুলটির কারখানায় চাকরি করে দিলেন। এখন বেশ ভালো চাকরি করছে, স্কিল্ড ওয়ার্কার হয়ে গেছে, কাজকর্ম শিখে ওভারটাইম ইত্যাদি নিয়ে মাসে চারশোর মত রোজগার—আমার চেয়ে বেশী। একদিন ওর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা, চমৎকার ফিটফাট চেহারা, প্যাণ্টালুন, জুতোর সঙ্গে মোজা, নাইলনের হাওয়াই শার্ট! দেখে আমার খুব ভালো লাগলো, ছেলেটা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, শুনলুম বিয়েও করেছে। ওর প্রতিষ্ঠার সবখানি কৃতিত্বই আমাদের পরিবারের—এই কথা ভেবে বেশ গর্বও বোধ করলুম। কিন্তু তারপরই এমন একটা কাণ্ড করলো! একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে—একটা কায়দা করে ঠোঁটে আটকালো, তারপর কিছুক্ষণ এ পকেট ও পকেট হাতড়ে—ফস্ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "ছোড়দাবাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে?" আমার এমন খারাপ লাগলো।

—এটা তোমার অন্যায়। একজন চেঁচিয়ে উঠলেন।

—জানি তোমরা কী বলবে। রাস্তার যে-কোনো লোক, অচেনা কোন কারখানার শ্রমিক এমন কি কোনো ভিখিরিও দেশলাই চাইলে আমরা অপমানিত বোধ করি না। কিন্তু পুরনো চাকর চাইলেই অপমানিত বোধ করা আমার ডিকাডেণ্ট মেণ্টালিটি। তা হয়তো ঠিক। কিন্তু অপমানিত যে হয়েছিলুম, তা অকপটেই স্বীকার করছি। শকৃড্ হয়েছিলুম বলা যায়। আগে কখনও চাইতো না, এখন এরকম স্বাভাবিক ভাবে…। বলতে পারো, ওর

স্বভাব বদলাবার অধিকার আছে। কিন্তু তা হলে আমাকে 'ছোড়দাবাবু' কেন ডাকলো? 'এই যে অমুক বাবু' বলে নাম ধরে ডাকাই ওর উচিত ছিল। বাড়িতে এসে এ ঘটনাটা বলতে বাড়িশুদ্ধ সবাই, এমনকি বড়দা পর্যন্ত হঠাৎ বিষম চটে গেল শত্রুঘ্নর ওপর। সকলেই ওকে বললো নিমকহারাম।

উপস্থিত অনেকে আমার এ বন্ধুর গল্প শুনে হেসে ফেললেন। তখন আর কে যেন বললেন, কেন শরতের বাড়ির চাকরের গল্প? শরৎ বলো না! সে ঘটনাটা সত্যিই চমকপ্রদ। শরৎ বলতে শুরু করলেন:

ছেলেটা সত্যিই ভালো ছিল। মুখ বুজে কাজ করতো, মুখে কখনো, কোনো বিরক্তির ছায়া ছিল না। মেদিনীপুরের ছেলে, কী যেন ছিল ওর আসল নাম, আমরা ওকে ডাকতুম মদন বলে। আমাদের বাড়িতে সব চাকরের নামই মদন, পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। নিত্য নতুন চাকর এলে প্রত্যেকের নাম মনে রাখা কষ্ট, আর চাকরদের নাম সাধারণত বেশ গালভারী হয়—গোবর্ধন, বগলাপ্রসাদ, দীনতারণ, কালীয়াদমন এইসব - কাজেই ওসব ঝঞ্ঝাটের বদলে আমাদের বাড়িতে সবাই মদন। একমাত্র ঠাকুমারই এই নামে আপত্তি, ওঁর কাছে সব চাকরের নামই বদন, কারণ মদন হাজার হোক দেবতার নাম, আর চাকর-বাকরের নাম ঠাকুর-দেবতার নামে হলে ওঁর নাকি সব সময় বকুনি-ঝকুনি দিতে অসুবিধে হয়।

এ ছেলেটা আমাদেরই বাড়িতে এসেছিল খুব বাচ্চা বয়সে। নিজের নাম ভুলে ও মদন নামটাই বেশ মানিয়ে নিয়েছিল। সব সময় ফিটফাট পরিচ্ছন্ন থাকতো। স্মৃতিশক্তিও ছিল ভালো, বাজার থেকে যা-যা আনতে বলা হতো, প্রত্যেকদিন নির্ভুলভাবে সবকটা আনতো। ওরকম স্মৃতিশক্তি দেখেই ওকে লেখাপড়া শেখাবার কথা আমাদের মনে আসে। মা ওকে এক-দুই লিখতে শেখালেন। আমার বোন শেখালো অ-আ-ক-খ। তারপরও ওর প্রবল উৎসাহ দেখে আমরা সব ভাইরাই মাঝে মাঝে একটু-আধটু পড়াতে লাগলুম ওকে। দু'চার-খানা বই কিনে দিলুম। ছেলেটা সব কটা বই পড়ে পড়ে মুখস্থ করে ফেললো, হাতের লেখা লিখে লিখে লেখাটা করে ফেললো মুক্তোর মতো। ইংরেজীও পড়তে শিখলে কিছু কিছু। বিশ্বাস করো, ছ'সাত বছরের মধ্যেই ছেলেটা প্রায় ম্যাট্রিক স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত শিখে ফেললো। স্বভাব হয়ে গেল আরও ভদ্র, মার্জিত। চাকর বলে লোকে বুঝতেই পারতো না। অনেকে আমাকে ডাকতে এসে ওকে বলতো, তোমার দাদাকে ডেকে দাও তো! আমরাও ওকে একটু সমীহ করতে শুরু করলুম, সব-রকমের কাজের হুকুম করতে দ্বিধা করতুম।

ছেলেটা হয়ে উঠলো বইয়ের পোকা। আমাদের বাড়ির যাবতীয় বই পড়ে শেষ করলো—আমার আলমারীর তোমাদের দেওয়া আধুনিক কবিতার বইগুলো পর্যন্ত! দুপুরবেলা, বাড়ির রোয়াকে বসে রাজ্যের ঠাকুর-চাকররা যখন বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে এক এক বাড়ির কেচ্ছা বিনিময় করে, আমাদের মদন তখন ছাদের সিঁড়িতে বসে বসে গল্পের বই পড়ছে। অন্য চাকরদের সঙ্গে একদম মিশতো না। কোনো কুসংসর্গে পড়েনি, মাইনে পেয়ে প্রত্যেক মাসে দেশে টাকা পাঠায় নিজে মনি অর্ডার ফর্ম ফিল আপ করে। আমরা ওকে অন্য কোথাও একটা চাকরি জুটিয়ে দেবার কথা বলেছিলাম। যেতে চায় নি। মদন বলতো, এ বাড়িতে ও ঘরের ছেলের মতো আছে। যদি এ বাড়ির কাজ ছেড়েই দেয়—তবে অন্য কোথাও ও আর চাকরি করবে না—কারখানা না অফিসেও না, ও স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবে। সেজন্য পয়সা জমাচ্ছে।

যা হোক চাকর হিসেবে মদন আইডিয়াল। মালটিপারপাস চাকর। আমার বাবা চোখে ভালো দেখতে পেতেন না। দুপুরবেলা মদনের অতিরিক্ত কাজ হলো বাবাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো। সেজন্য ওর তিন টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হলো। ও পুরো কাগজটা, প্রথম লীড থেকে শেষ পাতার প্রিণ্টারস লাইন পর্যন্ত সব কথা, বিজ্ঞাপন সমেত তন্নতন্ন করে পড়ে শোনাতো। বাড়ি থেকে সকলে বেরিয়ে গেলেও মদনকে পাহারা রেখে যেতাম নির্ভয়ে। তারপর—

তারপর একদিন সকালে আর মদন নেই। একটা অল ওয়েভ রেডিও আর আমার মেজো ভায়ের একটা হাতঘড়িও নেই। আছে মদনের একটি চিঠি, টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া। অনবদ্য চিঠি। ঠিক ভাষাটা মনে নেই। তবে অনেকটা এই রকম। আমার মাকে লেখা :

শ্রীচরণকমলেষু মা,

কিছুকাল হইতে আমার একঘেয়ে লাগিতেছিল জীবন। তাই ভাগ্য পরীক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। ব্যবসাই করিব ঠিক করিয়াছি। এখন আপনার আশীর্বাদ পাইলে হয়। পুরা মূলধন হাতে নাই, তাই রেডিও আর ঘড়িটা লইয়া গেলাম। দুটাই আপনাদের অপ্রয়োজনায়। বড়দাদাবাবু একটি নতুন ট্রানজিস্টার রেডিও কিনিয়াছেন, সুতরাং এটাতে আর আপনাদের কি দরকার? এক বাড়িতে দু'টা রেডিও রাখার দরকার দেখি না। ট্রানজিস্টারটা বড়দাদাবাবুর শখের, তাই অলওয়েভটাই লইলাম। আর মেজদাদাবাবু, গত মাসে বিবাহে একটা সোনার হাত ঘড়ি পাইয়াছেন। সেটি লই নাই। কিন্তু তিনি পুরানোটি দিয়া

এখন কি করিবেন? বাড়ির আর সকলেরই হাত ঘড়ি আছে। মেজদাদাবাবু দুই হাতে দুইটি ঘড়ি পরিবেন না জানি। সে রকম কাহাকেও দেখি নাই। সুতরাং পুরানোটি আমি লইলাম। তবে শপথ করিতেছি, একদিন না একদিন এই দুইটি জিনিসের দাম ঠিকই আপনাদের শোধ করিয়া দিব। ইতি আপনার দাস—মদন।

আমাদের পরিবারে একটা মিটিং বসে গেল—পুলিসে খবর দেওয়া হবে কিনা, এই নিয়ে। মায়ের প্রবল আপত্তি। শেষ পর্যন্ত সবাই ঠিক করলো পুলিসে জানানো হবে না। মদনের চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দেওয়া হলো। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এলে মা তাঁর চাকরের গৃহ-শিক্ষার নিদর্শনটি গর্বের সঙ্গে দেখাতেন।

দিন পনেরো পর, আর একটা চিঠি এলো। মদন লিখেছে, সে বিষম অনুতপ্ত। সে খুব দুরবস্থায় আছে। পাপ কাজ দিয়ে শুরু করলে কোনো উদ্দেশ্যই সফল হয় না। তার ওপর আমাদের যে বিশ্বাস ছিল সেটা ভঙ্গ করে সে মহাপাপ করেছে। হাত ঘড়িটা সে বেচে ফেলেছে। কিন্তু রেডিওটা সে ফেরত দিতে চায়। তা ছাড়া চোরাই মাল বলে লোকে মাত্র ৬০।৭০ টাকায় কিনতে চায় ওটা কিন্তু মায়ের অমন দামী শখের জিনিসটা সে জলের দামে বেচতে পারে নি। ওটা সে ফেরত দেবে—কিন্তু নিজে মুখ দেখাতে চায় না। বউবাজারের একটা ঠিকানায় বলাই নামে একটি লোকের কাছে ওটা আছে, আমরা যেন কেউ গিয়ে নিয়ে আসি। এবং মদনকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি।

এবার পুলিসে খবর দিলাম। কারণ ঠিকানাটা বউবাজারের একটি কুখ্যাত পল্লীর। পুলিসের লোক তো পুরো ঘটনাটা শুনে হেসেই বাঁচে না। তারপর বললো, কাল ভোরে হানা দেবে। চোরাই মাল উদ্ধারের জন্য ভোরে হানা দেওয়াই নাকি প্রকৃষ্ট উপায়। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে আইডেন্টিফাই করতে।

গেলাম। একটু দূরে দুজন সেপাইকে নিয়ে ইন্সপেক্টার আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। একজন সাদা পোশাক পরা পুলিস চিৎকার করে ডাকতে লাগলো, বলাই, বলাই! তখনো ভালো করে ভোর হয়নি, সাড়ে চারটে-পাঁচটা বাজে। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর দোতালার জানলা দিয়ে একটা শুঁটকো মতো লোক গলা বাড়িয়ে বললো, কে? তারপরই কী ভেবে মুখটা সরাৎ করে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল আবার। আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। তখন ফের শুরু হলো ডাকাডাকি, দরজায় ধাক্কা। এবার একটি মেয়েছেলে দরজা খুলে জানালো, এখানে বলাই বলে কেউ থাকে না। আমরা সবাই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লুম

বাড়ির মধ্যে। ইন্সপেক্টার প্রবল ধমক দিয়ে বললেন, ডাক বলাইকে। দেখেছি সে দোতালায় আছে! বেগড়বাই করবি তো সবাইকে চালান দেবো!

বলাই নেমে এলো এবং মা কালীর দিব্যি করে জানালো, সে মদন বলে কারুকে চেনে না।

চিনিস্ না চিনিস্ রেডিওটা বার কর আগে।—

কিন্তু রেডিওর তো সব পার্টস খুলে ফেলা হয়েছে!—

নিয়ে আয় সেই খোলা পার্টস! এরপর ইন্সপেক্টার হুংকার দিয়ে উঠলেন, এবার বল্ সেই ধন্মপুত্তুর মদনটা কোথায়?—পেছন থেকে মেয়েটা হঠাৎ বললো, সে এখানে থাকে না, সত্যিই থাকে না, তাকে ছেড়ে দিন বাবু!

একটা জিনিস দেখে আগাগোড়া অবাক হয়েছিলাম যে, মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে মদন এসে কোন্ পরিবেশে উঠেছে! আগে সে কারুর সঙ্গে মিশতো না। বেশ একটা রুচিজ্ঞান ছিল। একটা অন্যায় করার সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের মতো আণ্ডার-ওয়ার্লড তাকে টেনে এনেছে। আবার একটা দরদ দেখানো মেয়েও জুটিয়েছে। মেয়েটা তখনও বলছে, মদনকে ছেড়ে দিন বাবু, সে বেচারী—

আমি আগাগোড়া চুপ করেই শুনছিলাম। শরতের গল্প শুনতে শুনতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ভৃত্যতন্ত্র সম্পর্কে আমার উৎসাহ কম, অভিজ্ঞতাও নেই। আমাদের বাড়িতে কোনদিন চাকর রাখা হয় নি। ফুট ফরমাশ বেশীর ভাগ আমাকে দিয়েই খাটানো হয়। কিন্তু হঠাৎ একটা মজার প্রশ্ন মনে পড়তেই আমি শরতের গল্প বলা থামিয়ে দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা একটা প্রশ্ন তোমাদের কারুর মনে এসেছে? মদন চুরি করা শিখলো কী করে? কারণ মদন খুব বাচ্চা বয়েস থেকে আছে শরৎদের বাড়ি। ওখানেই বড় হয়েছে। অন্য চাকরদের সঙ্গে মিশতো না। লেখাপড়া শিখেছে। শরৎদের বাড়ির পরিবেশেই মানুষ। আর পরিবেশ অনুযায়ীই তো মানুষের চরিত্র তৈরি হয়। তাহলে, চুরি করার কথা ওর মনে এলো কি করে? শরৎদের বাড়িতে নিশ্চয়ই চুরিবিদ্যের চর্চা নেই, আশা করা যায়। আর পাঠ্য বইগুলোর মধ্যেও বোধ হয় চুরি করতে শেখানো নেই। তবে ছোঁড়াটা শিখলো কোথা থেকে?

বন্ধুদের দু'একজন বললেন, আঃ আগে গল্পটা শেষ করতে দে না।

আমি বললুম, ছিঁচকে চুরির গল্প কী আর এমন রোমাঞ্চকর হবে। তার চেয়ে এ প্রশ্নটা অনেক জরুরী। আমার তো মনে হয়, ঐ যে বললে ও রোজ

দুপুরে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতো—সেই খবরের কাগজ থেকেই চুরি করতে শিখেছে। বিশেষ করে ওর ছিল ব্যবসা করার ইচ্ছে। খবরের কাগজে কি প্রত্যেক দিন ও পড়ে নি বড় বড় ব্যবসায়ীদের চুরির কাহিনী ? চুরির খবরেই তো ভর্তি। এক-একদিন এক-একজন বাঘা বাঘা ব্যবসায়ীর চুরির কাহিনী! আর একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট, মদন চুরি করল ঘড়ি আর রেডিও, কিন্তু শুধু রেডিওটা ফেরত দেবার কথা লিখেই সে নিজেকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা পাবার অধিকারী ভাবলো কী করে ? এটাও সে শিখেছে খবরের কাগজ পড়ে! সে শিখেছে, চুরি করার পর অর্ধেকটা ফেরত দিলেই আর কোনো শাস্তি নেই, অপমান নেই, একেবারে সসম্মানে মুক্তি। দেখো নি কাগজে কৃষ্ণমাচারীর ঘোষণা ? ব্ল্যাক মানির বাংলা চোরা টাকা—যাদের কাছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি চোরা টাকা আছে, তারা যদি স্বেচ্ছায় এসে স্বীকার করে—ব্যস, তা হলে শুধু ৬০ ভাগ জমা দিয়ে দিলেই হবে। আর সব মাপ, কোনো বিচার নেই, শাস্তি নেই। চম্বলের ডাকাতদেরও আত্মসমর্পণ করার পরও শাস্তি হয়েছিল। কিন্তু যে ব্যবসায়ীরা চোরা কারবার করে, খাদ্য বাজার থেকে লুকিয়ে, ওষুধে ভেজাল দিয়ে পরোক্ষভাবে বহু লোককে খুন করে কোটি কোটি টাকা জমিয়েছে—তারা শুধু এসে একবার স্বীকার করলেই হলো, ষাট ভাগ জমানো টাকা জমা দিয়ে দিলেই হলো, আর কোনো শাস্তি নেই! যে আসনে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। মদনও দেখেই শিখেছে নিশ্চিত। মদনের আর দোষ কি! মদনকে লেখাপড়া শিখিয়ে বেশ করেছিলে, কিন্তু খবরের কাগজ পড়তে দিলে কেন ? তাইতো ও মহাজনদের পথ অনুসরণ করতে চেয়েছে!

২০

*****

ভিড়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ, তেজী মেয়েগলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, নো, আ আম নট গননা সীট দেএর, আ আম অল্ রাইট!

লম্বা ট্রামের একপাশে আমি, অন্যদিকে এই ঘটনা। আমি ছটফটিয়ে উঠলুম। তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে উপস্থিত হতে ইচ্ছে হলো আমার, কিন্তু অত ভিড় ঠেলে সামনে এগুবার সাধ্য তখন বাতাসেরও নেই। ইচ্ছে হলো, লোকের কাঁধের ওপর উঠে উঁকি মেরে দেখি। যদিও কথাটা সাধারণ, এর মধ্য থেকে রোমাঞ্চকর কাহিনীর সূত্র আবিষ্কার করার কোনো কারণ নেই। নিশ্চিত কোনো মহিলাকে দেখে—লেডিজ সীটে বসে থাকা পুরুষেরা, পাশাপাশি দুটি সীটে চারজন পুরুষ—এ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে, কেউ জানালায় মুখ ফিরিয়েছে, কেউ অন্ধ ও বধির সেজেছে, প্রত্যেকেই আসলে একাগ্র হয়ে ভেবেছে, আঃ, অন্য সীটটা খালি করুক না,···আর সেই সময় ঘর্মাক্ত, পিষ্ট দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষরা জিঘাংসার মনোবৃত্তিতে বলেছে, কর্কশ গলায়, এই যে দেখতে পাচ্ছেন না, লেডিজ সীটটা ছাড়ুন!—আর তখন দুই সীটের লোকেরা আড়চোখে তাকিয়ে দূরত্ব মেপেছে—কোন্ আসন দণ্ডায়মান অপেক্ষমাণ মেয়েটির সবচেয়ে কাছে—সেই অনুযায়ী দু'জন লোক প্রবল অনিচ্ছা সারা শরীরে ফুটিয়ে গা মোচড়াতে মোচড়াতে—মুখে, ঈশ্বর জানেন, কী বিড়বিড় করতে করতে উঠেছেন। আর তখন এবংবিধ লাঞ্ছনার পর, সেই রমণী যদি আত্মসম্ভ্রমশীলা হন, বলেছেন, থাক, আপনারাই বসুন, আমি বসবো না। এতো খুব সাধারণ কাণ্ড! প্রতিদিনের অসংখ্য। কিন্তু আমি অন্যরকম গন্ধ পেয়েছিলাম। কারণ, গলার আওয়াজটা অত্যন্ত জোরে, কোনো মেয়ের পক্ষে। ইংরেজী উচ্চারণ বিদেশী ধরনের, 'নো' কথাটা এমনভাবে বলেছে, যেন সংস্কৃতের মতো বিসর্গ আছে, নোঃ।

তখন ওখানে গুঞ্জন চলছে, মেয়েটি আরও কিছু বললো, বোঝা গেল না।

আমি অতিকষ্টে আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আরও তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে—কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীকে একপলক দেখতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে চমৎকৃত হতে হলো।

জলজ্বলে হলদে রঙের স্কার্ট-ব্লাউজ পরা একটি কুচকুচে কালো মেয়ে। খুব সম্ভবত নিগ্রো, বয়েস উনিশ-বাইশ, ট্রাম একটা মিশনারি কলেজের সামনে একটু বেশি থেমেছিল, হয়তো সেখানকার ছাত্রী। মুখ দেখে মনে হলো, মেয়েটি কোনো কারণে খুব রেগে গেছে, আঁট-স্বাস্থ্যে উদ্ধত শরীর, সকালবেলার আপিস-মুখো ট্রামে একটি মূর্তিমান ব্যতিক্রম। এই সব জল রঙ মানুষ, যাদের পকেটে ময়লা রুমাল, ফর্সা জামার নীচে ছেঁড়া গেঞ্জি, পালিশ করা জুতোর মধ্যে ফুটো মোজা—যাদের জীবনে একমাত্র উত্তেজনা সহযাত্রীর পা মাড়িয়ে দিয়ে খানিকটা ঝগড়া-ঝাটি করা, (সব সময় ভেতরে ভেতরে সজাগ থেকে, মারামারি পর্যন্ত না এগোয়) —তাদের মধ্যে ঐ নিগ্রো মেয়েটি, ওর ঐ অটুট কালো শরীর ও হলদে পোশাক মিলে যেন একটা রঙের হৈ-হৈ পড়ে গেছে, তা ছাড়া ঐ তেজী, দ্বিধাহীন সরল কণ্ঠস্বর। এক টুকরো আবার শুনতে পেলাম: ইউ পিপ্‌ল হেইট মী! আমার আন্তরিক বাসনা হলো ঐ দৃশ্য কাছাকাছি গিয়ে উপভোগ করি কিংবা অংশ নিই, কিন্তু এমন ভিড়, নাঃ অসম্ভব! মেয়েটি কেন বলছে, লোকে ওকে ঘৃণা করছে? যদি ওর সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে পারতাম!

আমি বিদেশী নারী-পুরুষ দেখলেই অযাচিতভাবে কথা বলার চেষ্টা করি। দেখেছি তাতে ওরা খুশীই হয়। আমাদের দেশের যে সব লোক বিদেশে গেছে, তাদের অভিজ্ঞতা এই যে বিদেশের রাস্তায় হঠাৎ কোনো লোক ডেকে কথা বললে খুব ভালো লাগে। তাতে মনে হয়, ওদেশের সাধারণ লোকও তাকে গ্রহণ করেছে, স্বীকার করছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিদেশীদের সঙ্গে এমন ব্যবহার সচরাচর করা হয় না, সঙ্গে পাই আমি চেষ্টা করি, আমার ইনজিরি জ্ঞানের জন্য লজ্জা হয় না আমি বাঙালীদের সঙ্গে ভুল ইংরেজী বলে ফেললে লজ্জা পাই, সাহেব-মেমদের না। এখানে ভিড় ঠেলে এগুতে না পারায় দুঃখে মরমে মরে গেলাম। একবার চেষ্টা করে নাকে গুঁতো খেয়ে চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

অথচ ওখানে কেউই মেয়েটির সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলছে না। অনেকেই পরোক্ষে উক্তি করছে। কেউ বা বাংলায় মন্তব্য, ওরে বাবা কী তেজ রে···কালো মেম-সাহেবদের চোট সাদা মেমদের তিন গুণ বেশি হয়···আপিসের টাইমে ওঠা কেন বাবা!···

আমি তখনই ঠিক করলাম, নেমে যাবার সময় মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখন এগিয়ে যাবার যখন কোনো উপায় নেই। তা ছাড়া সবাইকে গোঁত্তা

মেরে ঠেলেঠুলে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা শুরু করলে—পঞ্চাশ জোড়া চোখ আমার দিকে চেয়ে থাকবে। কে কী মন্তব্য করে, তাই বা ঠিক কি! থাক। ততক্ষণ আমি মেয়েটির সঙ্গে মনে মনে কথা বলা শুরু করলাম। আমাদের কাল্পনিক সংলাপ নিম্নরূপ :

আমি : তুমি কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান না নিগ্রো ?

মেয়েটি : (তখনও মুখে ক্রোধ) অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ? কি বিশ্রী এই কথাটা। তোমরা এ নামটা বদলাতে পারো না। একটা জাতকে উল্লেখ করার সময়, সব সময় তাদের কুৎসিত জন্মবৃত্তান্তটাও উল্লেখ করতে হবে! না, আমি তোমাদের ঐ সো-কল্‌ড অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নই।

—ও, তবে নিগ্রো বুঝি ?

—নিগ্রো ? ছি, ছি, তোমাদের লজ্জা করে না ? 'নিগ্রো' কোনো জাতের নাম হয় বুঝি ? তুমি নিজে কি মঙ্গোলিয়ান না ড্রাভিডিয়ান ? আমি একজন আফরিকান! সাউথ আফরিকা আমার দেশ।

—ও, আচ্ছা, মাপ চাইছি। কিন্তু তুমি বড্ড রেগে আছো। ওখানে কী হয়েছিল ? কেউ খারাপ ব্যবহার করেছিল ?

—বিশেষ কিছু না, এমন খারাপ ব্যবহার তো তোমাদের দেশে সবাই করছে!

—কেন, একথা বলছো কেন ?

—তোমরা কালো লোকদের ঘেন্না করো। বিদেশের কালো লোকদের। তোমরা নিজেরাও যদিও কালো। তুমি নিজেই তো আবলুস কাঠের মতো কালো।

আমি একটু আহত হয়ে মনে মনে সংলাপের মধ্যেও আরও মনে মনে বললুম, যাঃ এটা কি বলছো, আমার চেনাশুনো মেয়েরা তো আমাকে বেশ ফরসাই বলে। তা যাকগে, এই ট্রামের মধ্যে কালো-সাদার কি দেখলে ?

আমাকে দেখেই দুটো লোক ধড়পড় করে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো—

—ওঃ, হো-হো, তুমি বুঝি এটা জানো না ? এতে কালো-সাদার কী আছে ? মেয়েদের দেখলে আমাদের দেশের গাড়ি-টাড়িতে সৌজন্য দেখিয়ে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়।

—ডোনট টক রট। ওসব জানি, এতদিনে জেনে গেছি—কতটা সৌজন্য আর কতটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু দুটো লোক উঠলো কেন ? একজন উঠলেই তো আমি আর একজনের পাশে বসতে পারি!

এবার আমি, মনে মনেই যখন কথা, তখন একটু ইয়ার্কির লোভ সামলাতে পারলুম না। বললুম, তোমাকে এমন সুন্দর দেখতে, তোমার জন্য তো গাড়ি সুদ্ধ সকলেরই জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান উচিত ছিল!

মেয়েটি একটু মুচকি হেসে বললো, তোমার এটা বাজে খরচ হলো। যাক, আমি আগেও দেখেছি, আমি বসলে পাশে আর কেউ বসে না। অত্যন্ত ভিড়ের গাড়িতেও একটা জায়গা ফাঁক পড়ে থাকে!

—তুমি ভুল বুঝেছো। অচেনা মেয়ের পাশে এসে বসে পড়া আমাদের দেশে এখনও চালু হয় নি। তুমি কালো বলে বা নিগ্রো…থুড়ি আফরিকান বলে নয়। শুধু শুধু তুমি একটা ধারণা করে বসে আছো যে, কালো বলে লোকে তোমাকে অপছন্দ করছে!

—শুধু শুধু? তুমি জানো তোমাদের একজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা বাচ্চা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিল।

—সে এক ধরনের কাঁদুনে বাচ্চা থাকে। যে কোনো অচেনা লোক দেখলেই কাঁদে। আমেরিকান বা জাপানী হলেও কাঁদতো।

—খুব লুকোবার চেষ্টা করছো। আমাদের দক্ষিণ আফরিকায় সাদা লোকরা আমাদের কুকুরের মতো ঘেন্না করে। সেইজন্য বাবা-মা আমাকে পড়াশুনোর জন্য পাঠালেন ভারতে। তোমাদের শুনেছিলাম জাতিভেদ প্রথা আছে। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষও কম নেই। তোমরা সবাই কালো—একটু রঙের হেরফের, এরই মধ্যে যে এক পোঁচ ফর্সা, তার অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। জানো, আমাদের ক্লাশের একটি বাঙালী মেয়ে বলছিল, তার দিদির বিয়ে হয় নি, কারণ রং কালো।

—সে নিশ্চয়ই শুধু কালো নয়, সেই সঙ্গে নাক থ্যাদা, কাঠিকাঠি হাত-পা, বেঁটে। এমনিতে সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবান হলে—শুধু কালো রঙের জন্য আজকাল আর বিয়ে আটকায় না। এই ধর না, তোমার তো রং কালো—কিন্তু তোমার মতো এমন সুন্দর চেহারার মেয়ে যদি বিয়ে করতে রাজী হয় তবে এদেশে হাজার ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে।

—যাও, যাও, শুধু ঠাট্টা করছো। কালো রঙের জন্য আমার মোটেই লজ্জা নেই। তোমাদের থাকতে পারে। আমি কালো রংকেই সব চেয়ে সুন্দর মনে করি।

হঠাৎ দেখি ট্রাম ওয়েলিংটনে এসেছে, আর সেই মেয়েটি ভিড় ঠেলে নামার চেষ্টা করছে। আমার চমক ভাঙলো। এতক্ষণ মনে মনে কথা বলছিলুম এবার মেয়েটির সঙ্গে সত্যিই দু'একটা কথা বলতে হবে। আমিও টুপ করে নেমে পড়লুম।

কি করে কথা আরম্ভ করি? মেয়েটি নেমে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর দেখি পানের দোকানে গিয়ে কি যেন জিজ্ঞেস করছে, দোকানদার বুঝতে পারছে না। এই সুযোগে আমি কাছে গিয়ে বলি, তোমায় কোনো সাহায্য করতে পারি?

মেয়েটি কালো মুখ আলো করে এক ঝলক হেসে বললো, এখানে ডকটরস লেন এই নামের রাস্তাটা কোথায় বলতে পারো?

—হ্যাঁ নিশ্চয়ই! কাছেই তো। আমিও ঐ দিকে যাচ্ছি—আমার সঙ্গে আসতে পারো।

—ধন্যবাদ।

কয়েক পা একসঙ্গে চলার পরই নাকি বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তাই আমি জিজ্ঞেস করি, ট্রামে কি তোমার কোনো অসুবিধে হয়েছিল?

—বিশেষ কিছু না। সামান্য ব্যাপার। আমার হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যায়—!

দেখলুম মেয়েটি বিশেষ কথা বলতে উৎসাহী নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে তো মনে মনে কথা বলে আমি ওর চরিত্র তৈরি করে ফেলেছি। মনে হলো, আমার রং যথেষ্ট কালো নয় বলেই বোধ হয় মেয়েটি আমাকে পছন্দ করছে না।

পার্কের ওপাশে একটি সাহেব দাঁড়িয়েছিল। টকটকে ফর্সা রং। সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান। ইউরোপীয় সম্ভবত, উচ্চবিত্ত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানও হতে পারে। সাহেবটি এই মেয়েটিকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো, 'হাই জেনি!'

মেয়েটি ওকে দেখতে পেয়েই চঞ্চলা, গতিশীলা হয়ে গেল। এক ছুটে গিয়ে সাহেবটির বাহুলগ্না হলো। আমাকে একটা বিদায় জানাবার কথাও মনে পড়ে নি। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা দু'জনে একসঙ্গে এগিয়ে গেল খানিকটা, তারপর কি মনে করে মেয়েটি হঠাৎ পিছন ফিরে আমার উদ্দেশে হাত নেড়ে দিল একবার।

২১

*****

একটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হলো, তিনি বারবার বলতে লাগলেন, এমন বদলে গেল! এমন বদলে গেল! কথা বলার সময় তাঁর কপালের একটি শিরা কাঁপে।

—এখানে তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা ছিল, কোথায় গেল?

পার্কের উল্টো দিকের ফাঁকা মাঠে চুন, সুরকি, বালি ডাঁই করা। মিস্ত্রিরা বসে বসে ইট ভেঙে খোয়া করছে, কয়েকটা বাঁশ পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছে ছাতা। এমন রোদ্দুর যেন মানুষগুলো চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। লাল শাড়িপরা একটি মেয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল. যেন বহে গেল একটা লাল ঢেউ. জাপানী ছবির মতো যেন অদৃশ্য চারিদিকের মধ্যে একটি লাল রেখার ঝলক। লাল রঙ গ্রীষ্মকে বেশী আকর্ষণ করে, মেয়েটি যেন এক দুপুরের সমস্ত গ্রীষ্ম সরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত প্রশান্ত ভঙ্গীতে হেঁটে চলে গেল। এই রোদ্দুরে তার সামান্য আক্ষেপ নেই। মেয়েরা শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় সময়েই সমুদ্বিগ্নমনা।

ভদ্রলোক মেয়েটির অপস্রয়মাণ মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে. ইট-ভাঙা মজুরদের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে পানের দোকানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা ছিল কোথায় গেল।

লোকটি বেশ লম্বা অথবা অত্যন্ত রোগা বলেই বেশী লম্বা দেখায়, রং কালো সুপুরুষ বলা যায় না, কিন্তু চোখে এমন এমন একটা ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা আছে যাতে তার মুখকে একটা আলাদা সৌন্দর্য দিয়েছে। ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে তিনি তেত্রিশ নম্বর বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছেন। লোকটির লম্বা ছায়া পড়েছিল ফুট-পাথে, অজান্তে সেই ছায়ার ওপর আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম বলেই হয়তো লোকটির সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যে আমার আত্মীয়তা হয়ে গেল।

—বাড়ি তো ছ'বছর আগে ভাড়া হয়ে গেছে!

—তা তো দেখছি। কিন্তু সে বাড়ির লোকেরা?

—পালবাবুরা? জীবনবাবু চলে গেলেন বোম্বাই, তার ভাই এ বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চম্পাহাটিতে বাড়ি করেছেন। আশী হাজার দাম পেয়েছিলেন. বাড়ির তো নয়, বাড়ি তো লঝ্‌ঝরে হয়ে গিয়েছিল, জমিরই তো দাম!

—না, না তুমি ভুল করেছো। আমি তেত্রিশ নম্বর বাড়ির কথা বলছি। সে বাড়িতে তো পাল বলে কেউ থাকতো না। ওটা ছিল রায়চৌধুরীদের বাড়ি। পরমেশ রায়চৌধুরী, অনিমেষ, অবিনাশ—

—না বাবু, আমি তো এসে পালবাবুদেরই দেখছি। আপনার বোধ হয় ঠিকানা ভুল হয়েছে। এ বাড়ি পালবাবুরাই বিক্রি করেছেন।

—না আমার ভুল হয় নি। দোতলা বাড়ি, সামনে ঝুল বারান্দা, বারান্দাটা পুরো ছিল জাল দিয়ে ঘেরা, ওখানে পরমেশবাবু ঝাঁক ঝাঁক মুনিয়া পাখি পুষতেন। বাড়ির দুপাশে রোয়াক, তিন চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে সদর দরজা—

কথা বলতে বলতে লোকটি আবার চুন-সুরকির স্তূপ আর মিস্ত্রি বসে থাকা ফাঁকা মাঠের দিকে তাকালেন। এই সময় এগিয়ে এসে আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলুম। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি বুঝি অনেকদিন পর কলকাতায় এলেন?

—হ্যাঁ, প্রায় পনেরো-ষোল বছর। ঠিক ষোল বছর চার মাস পর। আপনি রায়চৌধুরীদের চিনতেন?

—না, আমি এদিককার কিছু চিনি না। তবে মনে হচ্ছে, রায়চৌধুরী ও-বাড়ি বিক্রি করেছিলেন পালদের, পালরা আবার বিক্রি করে গেছে। এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে।

—কিন্তু রায়চৌধুরীদের তো এ বাড়ি বিক্রি করার কোনো কারণই ছিল না।

—ষোলো বছর বড় দীর্ঘ সময়।

—তা ঠিক।

লোকটি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। রাস্তার আশেপাশে অন্য বাড়িগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর আপন মনেই বলতে লাগলেন, অনেক বদলে গেছে। আর কোন্ কোন্ বাড়ি ভেঙে নতুন হয়েছে বা অদৃশ্য হয়েছে ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু বুঝতে পারছি, অনেক বদলে গেছে।

তারপর আমার দিকে ফিরে আবার বললেন, রায়চৌধুরীদের ঠিকানা কোথা থেকে পাই বলতে পারেন?

আমি আগেই জানিয়েছি যে আমি এ অঞ্চলের লোক নই, রায়চৌধুরীদের চিনি না, সুতরাং আমাকে ও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা অবান্তর। তবু লোকটির অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করে বললুম, আপনার অন্য কোনো চেনা লোকদের কাছে খোঁজ করুন, যাঁরা রায়চৌধুরীদেরও চিনতেন। তাঁদের কাছে ঠিকানা পেতে পারেন। আপনি কি আজই এলেন ?

—কাল রাত্রে। ষোল বছর পর প্রথম এলাম দেরাদুন থেকে। আগে কিছুদিন কার্সিয়াং-এ ছিলাম।

এরপর আর কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত কিনা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক নিজেই বললেন, আমার টি-বি হয়েছিল। বাঁচার কোনো আশাই ছিল না। অনেকের হয়তো ধারণা আমি মরেই গেছি। আমি কিন্তু এখন ভালো হয়ে গেছি, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি!—লোকটা শেষের কথাটা এমন ব্যগ্র ভাবে বললেন যেন আমার বিশ্বাস করা না করার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে।

—দশ বছর আগেই আমার প্রথম সেরে যায়। কিন্তু তখুনি আমি কলকাতায় ফিরে না এসেই ওখানেই থেকে গিয়েছিলাম। শরীরটাও সারিয়ে ফেরার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তারপর দু'বার আমার রিলাপ্স্ করে। রক্ত বমি করতে করতে আমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন সম্পূর্ণ সেরে গেছি। তিন বছর আগেই ডাক্তার আমাকে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন যে, আমার আর হবে না। তবু দীর্ঘ তিন বছর আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি। আর কোনো উপসর্গ দেখা দেয় নি। এখন আমি সুস্থ, প্রায় আপনাদের মতই স্বাভাবিক মানুষ। ভেবেছিলাম এদিকে আর ফিরবো না না। ও দিকেই থেকে যাবো। কিন্তু—

—শেষ পর্যন্ত কলকাতা টেনে আনলে।

—কলকাতায় আমার তেমন আকর্ষণ নেই। আমি চলে যাবার পর প্রথম দু'তিন বছর বন্ধু-বান্ধবরা খুব চিঠিপত্র দিতো—তারপর আস্তে আস্তে কমে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। বছরে একবার শুধু দাদা গিয়ে আমাকে দেখে আসতেন। দাদা মারা গেছেন গত বছর। শুধু আকর্ষণ ছিল এই তেত্রিশ নম্বর বাড়ির। যখন সুস্থ হয়ে উঠলাম, তখন বারবার মনে পড়তে লাগলো কৈশোর—প্রথম যৌবনে যখন আমি সুস্থ ছিলাম, সেই দিনগুলোর কথা। সেই সময়টা কেটেছে এই বাড়িতে। এ বাড়িতে আমার বন্ধু অনিমেষ থাকতো। আর ওর তিন বোন। লীলাদি, মায়া আর ছায়া। ওরা চার ভাইবোন ছিল কাছাকাছি বয়সের—সকলেই আমার বন্ধু। একটা আশ্চর্য কথা কী জানেন, তখন যে লাল

শাড়িপরা একটি মেয়ে গেল—তাকে দেখে আমি বিষম চমকে গিয়েছিলাম। আচ্ছা মেয়েটিকে আপনিও দেখেছিলেন, না আমার চোখের ভ্রম।

—আমিও দেখেছি।

—আশ্চর্য। বিশ্বাস করুন, অবিকল অনিমেষের ছোট বোন ছায়ার মতো দেখতে। ঠিক সেই রকম মন্থর অহংকারী হাঁটার ভঙ্গি। অথচ ছায়া তো হতেই পারে না, এত দিনে ছায়ার আরও ষোলো বছর বয়েস বেড়েছে। তা ছাড়া ছায়া ও-রকম একা রাস্তায় বেরুতো না, সব সময় সঙ্গে চাকর বা দারোয়ান থাকতো।

কী জানি, কী ভেবে হঠাৎ আমি বলে ফেললুম হয়তো আপনার দেরাদুনে থেকে যাওয়াই উচিত ছিল। না ফিরলেই পারতেন।

লোকটি ঈষৎ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর আমার অনধিকার চর্চায় বিরক্ত না হয়েই বললেন, ফিরবো না-ই ভেবেছিলাম।

কলকাতা থেকে যখন জ্বরে আচ্ছন্ন অবস্থায় চলে যাই, বিষম অভিমান নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এ শহর আমাকে চায় না, আমিও আর এ শহরের কাছে ফিরে আসবো না! কিন্তু কলকাতাকে মনে পড়ার একটা সাইকল আছে। পাঁচ বছর পর পর বিষম মন কেমন করে। গত বছর থেকেই ফেরার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। ওখানে থাকতাম একা একা। আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে! কিন্তু একাকীত্ব মানুষকে ক্রমশ নির্বোধ করে দেয়—কবিরা যাই বলুক, একাকীত্বই আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। কিন্তু যদি জানতাম তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা নেই—। জানেন, ঐ জায়গায়—ভদ্রলোক আমাকে আঙুল দিয়ে একটা শূন্যস্থান দেখিয়ে বললেন—ছিল সদর দরজা, তারপর একটা গলির মতন, পরে চাতাল, সেখানে এখানে একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চ পাতা থাকতো। ওখানে আমরা বসে রাস্তার মানুষ চলাচল দেখতাম চোখে পড়তো উলটো দিকের পার্ক, ফুচকাওলাকে ডেকে নিয়ে যেতাম ভেতরে। অনিমেষ বাড়িতে না থাকলেও আমি ওর বোনদের সঙ্গে বসে গল্প আর হাসি ঠাট্টা করতাম। তখন আমি বুঝতে পারিনি, লীলা ছায়া আর মায়া—এর মধ্যে কাকে আমি ভালোবাসতাম। পরে নির্জন প্রবাসে বসে অনেক ভেবেছি, বুঝতে পারি নি। ভেবেছিলাম, আর একবার ঐ বাড়িতে ঢুকে কাঠের বেঞ্চিটায় বসতে পারলেই মনে পড়বে। কিন্তু—

একটুক্ষণ চুপ। ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি বললে, যাক্ তবু বাড়িটা ভেঙে ফেলে এখন ও শূন্য মাঠ। আমি মাঠের মধ্যে বাড়িটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কল্পনায়। কিন্তু এর বদলে যদি দেখতাম, চৌকো লম্বা দেশলাই-এর বাক্সের মতো, আধুনিক বিশ্রী একটা নতুন বাড়ি, তা হলে খুব খারাপ লাগতো।

কথাবার্তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং সেন্টিমেণ্টাল দিকে চলে যাচ্ছে দেখে আমি ঘোরাবার চেষ্টা করে বললাম, কলকাতা শহরের আর কী কী বদল দেখলেন? আমাদের তো চোখে পড়ে না।

—কলেজ স্ট্রীট! চেনাই যায় না। সিনেট হলের গম্ভীর থামগুলো আর আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মূর্তিটাই নেই, সেখানেও উঠছে একটা দেশলাই-এর বাক্স বাড়ি। কাল রাত্রের দিকে চৌরঙ্গী অঞ্চলের দিকে ঘুরছিলাম. নতুন নিয়ন আলোয় এ শহর সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে আমার কাছে। কোন্ কোন্ জিনিস বদলে গেছে আমি ঠিক বলতে পারবো না, কিন্তু বুঝতে পারছি অনেক কিছু বদলে গেছে। অনেক, প্রায় একটা অন্য শহর। আমি বললাম, বৌদ্ধ গাথায় আছে, এক নদীতে কেউ দু'বার স্নান করতে পারে না। নদীর নাম এক থাকলেও নদীর জল বদলে যাচ্ছে অনবরত। সেইরকম একবার চলে গেলে এক শহরে বোধহয় কেউ আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে পারে না। ফিরতে হয় অন্য শহরে।

—হয়তো তাই। বুঝতে পারছি, এ শহর আমার সে চেনা শহর একটুও নয়। দেখি যদি রায়চৌধুরীদের ঠিকানা খুঁজে পাই। অনিমেষ আর ওর বোনদের সঙ্গে দেখা হলে হয়তো সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়বে।

বিদায় নেবার সময় আমি মনে মনে ভাবলুম, অনিমেষ রায়চৌধুরী আর তার বোনদের সঙ্গে এই লোকটির আর দেখা না হলেই বোধহয় ভালো হয়। সেই পুরোনো বাড়ির বদলে চৌকো দেশলাইয়ের বাক্স মার্কা বাড়ি দেখলে ভদ্রলোক যেমন দুঃখিত হতেন—সেই রায়চৌধুরীদের এখন দেখলে বোধহয় তার চেয়েও বেশী দুঃখিত হবেন। শহর আর কি বদলেছে, বদলেছে এ শহরের মানুষ। মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারছেন না। এরকম নিস্পৃহ, কঠিন, তিক্ত, সেকেণ্ড ব্রাকেট ভুরু মুখের মিছিল কি আগে ছিল এ শহরে? যে-কোনো মানুষের মুখ দেখলেই বুঝতে পারতেন। এমন কি আমার মুখ দেখেও।

২২

*****

শুনেছি ফরাসী দেশে পাঁচশো ফ্রাঙ্কের নোটের (ওল্ড ফ্রাঙ্ক) একটা ডাকনাম আছে : মিজারেবল। অর্থাৎ যন্ত্রণা! কারণটি এই, শুনতে যদিও পাঁচশো টাকা, কিন্তু ওর দাম আসলে পাঁচ টাকা। অত বড় একখানা নোট, অত টাকার ছাপ-মারা—কিন্তু কিছুই কিনতে পারা যায় না বিশেষ। পকেটে হাত ঢুকিয়ে এরকম একটা পাঁচশো ফ্রাঙ্কের নোট হঠাৎ বার করে খাঁটি প্যারিসিয়াম ঝংকার দিয়ে ওঠেন, 'ও, বন্ ফরতুন্! ম্যার্দ! মিজারেবল! (অনুবাদ : ওঃ, এ যে দেখছি লাখ টাকা! গু-গোবর! যন্তোন্না!)

ঐরকম নাম পাঁচশো টাকার (অর্থাৎ বর্তমানের পাঁচ টাকার) নোটেরই ভাগ্যে পড়ার একটা অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে। ফরাসী দেশই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে—সাহিত্যিকদের ছবি ছাপা হয় টাকার নোটে। রাসিন, কর্নেই ভলতোয়ার, ভিক্টর হুগোর ছবি আছে বিভিন্ন নোটে। পাঁচশো ওল্ড ফ্র্যাঙ্কের নোটে। ভিক্টর হুগোর ছবি। এবং হুগোর বিখ্যাত বই 'লে মিজারেবল' -এর স্মৃতির ঐ পরিণতি জনতার মুখে মুখে।

সে যাই হোক, সকলেই জানেন, ফরাসীরা স্বভাবতই অতিশয়োক্তিপরায়ণ। আমাদের দেশে কিন্তু পাঁচ টাকার অনেক দাম। সেজন্য আচমকা চৌরঙ্গীর বাস স্টপে দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়ে আমি ভীষণ খুশী হয়ে গেলুম। এই পাঁচ টাকায় আমি এখন একটা গোটা রাজ্য কিনতে পারি। কলকাতার পথে-ঘাটে টাকা-পয়সা ছড়ানো—এরকম প্রবাদ বহুদিন হলো সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত যে জন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দলে দলে লোক কলকাতায় ছুটে এসেছে ভাগ্য ফেরাতে। কথাটা মিথ্যে কি, এখনও তো অনেক ধনী ব্যক্তির মড়া পোড়াতে নিয়ে যাবার সময় পথে পথে খইয়ের সঙ্গে পয়সা ছড়ানো হয়। তবে এই পাঁচ টাকার নোটটি নিশ্চয়ই শ্মশানযাত্রীরা ছড়ায় নি। কোনো অতি

ব্যস্ত লোকের পকেট থেকে পড়ে গেছে অসাবধানে। খাঁটি পরিষ্কার পাঁচ টাকা—জাল নয়, এমন কি, আজাদ হিন্দ ফৌজের টাকাও নয়। আমি বিনা দ্বিধায় তুলে নিলাম।

আগে নিতাম না। বাবা মা, গুরুজনেরা এরকম একটা কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, কুড়ানো পয়সা নিতে নেই। পয়সা কুড়িয়ে নিলে নাকি পকেট থেকে তার ডবল আবার বেরিয়ে যায়। অনেকদিন এই কুসংস্কারটা রক্ষা করে-ছিলাম—আমার চোখ বিশ্রী রকম ভালো বলে অনেক কিছু দেখতে পাই—নর্দমার পাশে চকচকে সিকিটাও চোখ এড়ায় না। কিন্তু কখনও তুলিনি। আমার সততার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একবার মৌলালি থেকে কলেজ স্ট্রীট যাবার খুব দ্রুত দরকার ছিল। নয়া পয়সার অত্যল্প আগের যুগ, পকেটে আমার একটি নিঃসঙ্গ এক আনি, অথচ বাস ভাড়া সাত পয়সা। মৌলালি থেকে বৌবাজার সমান দূর, ওখান থেকে বাসের ভাড়া এক আনা। কিন্তু ওটুকু হেঁটে যাবার ধৈর্য ছিল না, সময় ছিল না—। সুতরাং ঠিক করেছিলাম, ঐ কয়েক স্টপ বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলতে ঝুলতে কণ্ডাক্টরকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবো—তারপর বউবাজার থেকে টিকিট কাটালেই হবে। কিন্তু এমন নিরাশ হলুম—একটা বাস এলো অস্বাভাবিক ফাঁকা। বিকেলবেলা ওরকম ফাঁকা বাস আসা অবিচার ছাড়া কি—যেখানে মানুষের হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে যাবার সুযোগ নেই। অগত্যা মনমরা হয়ে ভিতরেই ঢুকতে হলো—একটা বসবার পুরো জায়গা পেয়ে গেলাম পর্যন্ত, এবং দেখলুম, পায়ের কাছে একটা চকচকে আনি পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম না, আমারটা ঠিক আছে, এই দ্বিতীয়টি ঈশ্বর প্রেরিত। সুতরাং ঐ আনিটা তুলে নিয়ে সাত পয়সা ভাড়া দিলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। কিন্তু ঐ যে আমার ধর্ম ও সততা বোধ, কুড়ানো পয়সা নেবো না। আমি পয়সাটাকে জুতোর তলায় চাপা দিয়ে রাখলাম—মতলবখানা এই যে, বউবাজার পেরিয়ে গেলে আমি ঐ পয়সাটা ব্যবহার না করে, আমার নিজস্ব এক আনারই টিকিট কাটবো। আর তার সঙ্গে কণ্ডাক্টর এলে—আমি পয়সাটাকে পা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে তাকে বলবো, আমার পয়সাটা পড়ে গেছে, তুলে দিন তো! তারপর ওর হাত দিয়েই তুলিয়ে, আমি না ছুঁয়ে, টিকিট কাটবো সাত পয়সার, উড়ো খই যাবে গোবিন্দের কাছে। কণ্ডাক্টর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে দন্তারবিন্দ প্রস্ফুটিত করে তার পাটনারের সঙ্গে গল্প করছে। যথারীতি বউবাজারে বাস পৌঁছুতেই হুড়মুড় করে উঠলো বহু লোক—নতুন যাত্রী, পুরোনো যাত্রীরা মিশে গেল। কণ্ডাক্টর পরে এসে আমার টিকিট চাইতে আমি অম্লানবদনে

কাটলুম এক আনার। তারপর পা সরিয়ে বললুম, এখানে কার পয়সা আছে, আপনি তুলে রাখুন!

এখন আর ওসব ভাবি না। ঝট্ করে পাঁচ টাকাটা তুলে নিলাম। পকেট থেকে ডবল বেরিয়ে যাবার সম্ভাবনা কবে ঘুচে গেছে। এখন পকেট খুবই শোচনীয় অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। তা ছাড়া পাঁচ-পাঁচটি টাকা, এই টাকা ইচ্ছে করলে সূর্যের আলো গাঢ় করে দিতে পারে, সু-বাতাস বইয়ে দিতে পারে, আলো জেলে দিতে পারে অন্ধকার ময়দানে। পাঁচ টাকা অর্থাৎ এখন পাঁচশো পয়সা—এই কথা ভাবলেই তো সংখ্যাতত্ত্বের এক আশ্চর্য ভোজবাজি ঘটে যায়—মনে হয় কি বিপুল এর পারচেজিং 'পাওয়ার'। পাঁচশো পয়সায় ফুচকা পাওয়া যাবে আড়াই শো—চিনে বাদাম অন্তত এক হাজার। ছোলা আজকাল কিনতে পাওয়া যায় না, নইলে তা-ও পাওয়া যেতো তিন চার হাজার। সারা মাসের খবরের কাগজ কিনে যাবতীয় সু-সংবাদ ভোগ করা যেতে পারে। অথবা চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া যায় কুড়িবার। কিংবা বাসে চাপা যায় অন্তত পঞ্চাশবার। এ তো গেল শৌখিন ব্যবহারের কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্যও কিরকম কাজে লাগতে পারে। পাঁচশো পয়সার গম পাওয়া যাবে তের হাজারটি, চাল একুশ হাজার। চিনি পাওয়া যেতে পারে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টুকরো। ভাবলে মাথা ঘুরে ওঠে। যদি গুলি সুতো কিনি, পাঁচশো পয়সায় সাড়ে চার মাইল লম্বা সুতো আসতে পারে আমার অধিকারে। পাটকাঠি কিনলে ঘরভর্তি পাটকাঠি; মোমবাতিও পাওয়া যেতে পারে অন্তত পঞ্চাশটা। স্কুলের ছাত্রদের যদি রচনা লিখতে দেওয়া হয়, তোমাকে পাঁচ-পাঁচশো পয়সা দিলে কি করবে—তা হলে তারা নিশ্চয়ই লিখবে—এই পয়সায় একটা নাইট স্কুল খুলে দেবে—কিংবা গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ এনে দেবে কিংবা কিনে ফেলবে ঘুড়ির দোকানের যাবতীয় ঘুড়ি।

ঐ বিপুল মুদ্রার আর সদ্ব্যবহার করা যায় একটি বই কিনে। যে-কোনো বই নয় একটি পঞ্জিকা। পঞ্জিকা মেনে চললে সারা বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত। একাদশী অমাবস্যার উপবাস, যাত্রা নাস্তি, অশ্লেষা-মঘা, আজ অলাবুভক্ষণ নিষেধ, কাল বার্তাকু মানা, এই এই দিন আমিষ বর্জন। এমন মনের সুখে দিন কাটাবার আর কি পথ আছে। ছেলেবেলায় আমাদের ইস্কুলের দারোয়ানের মুখে যেমন তার আহার্য তালিকা শুনেছিলাম—ভাত, ভাত-সেদ্ধ আর ভাতের তরকারি। সেই সঙ্গে নুন তো আছেই। অর্থাৎ চার-কোর্সের ডিনার। যেদিন খুব শৌখিনতা করার ইচ্ছে হতো সেদিন মরিয়া হয়ে রাখতো পুঁইশাকের দেখনাই। অর্থাৎ

সকালবেলা পুঁইশাক রেঁধে সেটা না খেয়ে, শুধু দেখে দেখে খাওয়া। রাত্রিবেলা সত্যিকারের পুঁইশাক সমেত ভোজ।

দেখনাই প্রসঙ্গে ছেলেবেলার আর একটি গল্প মনে পড়লো। পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসবার পথে গোয়ালন্দের স্টীমার ঘাটের হোটেলে গরম গরম ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ঐশ্বরিক খাদ্য পেতাম ছ' পয়সায়। হোটেলে সাধারণের জন্য ছ' রকম রেট ছিল। ভাত খেঁসারির ডাল ও বেগুন কুমড়োর তরকারি—এই নিরামিষ খাবার জন্য তিন পয়সা। আর মাছের ঝোল সমেত ছ'পয়সা। আর একটা বিশেষ রেটও ছিল। মাছের দেখনাই। অর্থাৎ নিরামিষের সঙ্গে একটা প্লেটে মাছও রেখে যাবে একটা, কিন্তু প্লেট থেকে মাছ না ছুঁয়ে শুধু ঝোলটুকু ঢেলে নিয়ে, মাছটা দেখে দেখে ভাত খাবার পর আবার মাছটা ফেরত দিলে চার পয়সা। আমাদের পাশে এক পাইকার এসে খেতে বসে দেখনাই-এর অর্ডার দিয়েছে। পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে উঠে আবার মাছটা ফেরত দিয়ে ঢেকুর তুলে ম্যানেজারের কাছে দাম দিতে গেছে। গোয়ালন্দের ইলিশের তো ঝোলেই আদ্দেক স্বাদ। ম্যানেজার তাকে চার্জ করলো পাঁচ পয়সা। পাইকার তো রেগেই অস্থির। এ কি অন্যায় কথা, তার বেলা নতুন রেট, চার পয়সার জায়গায় পাঁচ পয়সা চাওয়া হচ্ছে তার কাছে। ম্যানেজার ঝিমুচ্ছিল, চোখ না তুলেই বললো, ও হালার বাই হালা, দেহি নাই বুঝি! তুই যে চসছোস্। (অনুবাদ : ওরে স্ত্রীর ভ্রাতাস্য ভ্রাতা, আমি বুঝি দেখি নি। তুই যে মাছটা চুষে নিলি একবার!)

বাস স্টপে দাঁড়িয়ে পাঁচশো পয়সার নোটখানির বিপুল সম্ভাবনার কথা ভেবে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন মনে পড়লো, কিছুদিন আগে কাগজে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, বীরভূম জেলার কোন্ চৌকিদার যেন এখনও দশটাকা মাইনে পায় মাসে। তাই নিয়ে খানিকটা টিপ্পনী আর হা-হুতাশ করা ছিল। কিন্তু কেন? ভেবে অবাক হলাম। দশ টাকা—একহাজার পয়সা কি কম হলো নাকি। ওর থেকেই লোকটা কত পয়সা জমাচ্ছে, কে জানে!

২৩

*****

আমার মামাতো বোনের স্বামীকে কেন যে আমি কোনোদিন আর পছন্দ করতে পারবো না—সে কথা কারুকে খুলে বলতে পারবো না। কিছুদিন আগে বিয়ে হলো, দেখতে খারাপ নয় ছেলেটি এবং তার চেয়েও বড় কথা, বেশ ভালো চাকুরি করে, হাসিখুশী, দরাজ হাতে সিনেমা থিয়েটার দেখাচ্ছে, অল্প বয়সী শ্যালক-শালিকাদের সঙ্গে প্রভূত ঠাট্টা ইয়ার্কি এবং গুরুজনদের দেখলেই টিপঢাপ্ করে প্রণাম করা, অর্থাৎ নতুন জামাই হিসাবে ঠিক যে-রকম হওয়া উচিত। আমি সম্পর্কে গুরুজন, কিন্তু ভারিক্কি নই বলে বেশ একটা মার্জিত রসিকতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। ছেলেটিকে অপছন্দ করার কোনোই কারণ নেই আমার, বরং খুবই ভালো লাগার কথা। কিন্তু আমি ওকে দেখলেই এড়িয়ে যাই। পারত-পক্ষে কথা বলি না। যদিবা কথা বলতে হয় কখনও, মুখে হাসি থাকলেও, ভিতরে একটা অদ্ভুত ঝাঁঝ ও ঘৃণা মেশানো থাকে।

কারণ, আমি ওকে চিনতে পেরেছি। ও আমাকে চেনে না, কিন্তু এ বিয়ে হবার অনেক আগে ওকে আমি একবার মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য দেখেছিলাম। সেই থেকে, ওর মুখ আমার চিরকাল মনে থাকবে। ওকে না ঘৃণা করে আমার উপায় নেই। অথচ সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে ওকে এখন আর অভিযোগ করা যায় না।

বাসে বিষম ভিড় ছিল, বছর পাঁচেক আগের কথা। অসম্ভব গরম, অন্য-লোকের ঘাম আমার গায়ে এসে লাগছে. পায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে রকমারি জুতো। এক একবার ঢেউয়ের মতো ধাক্কায় হেলে পড়ছি। হঠাৎ আমার পাশের সীটের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এবার নামবেন, একটা জায়গা খালি হবে এবং সে-জায়গাটা আমারই সবচেয়ে কাছে। ভদ্রলোক বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। হঠাৎ একটু দূর থেকে, দু'তিনজন লোকের পিঠ সরিয়ে একটা

ব্যাগ-সুদ্ধ হাত এগিয়ে এলো, ধপ্ করে ব্যাগটা রাখলো সেই জায়গায়। যেন জায়গাটা রিজার্ভড হয়ে গেল। তারপর শরীর এঁকেবেঁকে, দুমড়িয়ে ঠেলেঠুলে একটি যুবক এসে ধপ্ করে সেই জায়গায় বসে পড়লো। বসেই অন্য দিকে তাকালো যাতে আমাদের সঙ্গে চোখোচোখি না হয়। যুবকটির সেই চরম নির্লজ্জতায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। সুবেশ, সুদর্শন যুবকটি এমন নয় যে শরীর অসুস্থ, শুধু একটু বসবার জন্য ঐ রকম ঠেলেঠুলে জঘন্য অভদ্রতার পরিচয় দেবে—আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি বিষম অপমানিত হলুম। আমার পাশে দাঁড়ানো আর একটি লোক আমার দিকে সহানুভূতিসূচক হাসলো বলে অপমানে আমার শরীর আরও জ্বলে গেল।

আমার অপমান বসতে না পারার জন্য নয়। লোকটির অভদ্র ব্যবহারে। ও লোকটা আমাকে ভদ্র হবার সুযোগ দিল না। আমি ভিড়ের ট্রামে-বাসে কখনো বসি না। বিশেষত যদি একা থাকি। যদি দৈবাৎ আমার সামনে কোনো বসার জায়গা খালি হয়, আমি সেটার সামনে আগলে দাঁড়াই, তারপর তাকাই লোকের চুলের দিকে। দেখি, কার মাথার বেশী চুল পাকা। সেই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধোপম লোকের দিকে চেয়ে গলায় এক রাজ্যের বিনয় ঢেলে বলি, আপনি বসুন। তারপর, না, না, সেকি, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই না তা কি হয়, হ্যাঁ আপনি বসুন, বেঁচে থাকো বাবা, আজ-কাল এরকম! লোকটিকে শেষপর্যন্ত বসিয়ে ছাড়ি। হাতের কাছে বৃদ্ধ না পেলে, কোনো স্ত্রীলোক বা বালককে। এই বিনয় বা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমি গর্বোদ্ধত মুখে তাকিয়ে থাকি। বলা বাহুল্য, আমার উদারতার কথা এখানে লিখতে বসেছি, এতটা ক্যাড আমি নই। উদারতা নয়, ওটা আমার অহংকার। ঐ সীট-লোভী, শকুনের মতো জনতা—যাদের সবারই চোখ তখন ঐ একটি খালি সীটের দিকে—সেখানে আমি দাঁড়িয়ে অন্য রকম ব্যবহার করতে, সীট ছেড়ে দেবার উদারতা দেখাতে যে আনন্দ পাই, তার তুলনায় নিজে বসার পর সামান্য পশ্চাৎদেশের সুখ কিছুই না। তখন মনে হয়, ঐ সীটটার আমি মালিক, রাজা, যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দিতে পারি। মানুষের প্রতি দয়া দেখাতে পাবার সুযোগের মতো সুখের সুড়সুড়ি আর কিছুতে পাওয়া যায় না।

কিন্তু সেদিন ঐ যুবকটি ছিঁচকে চোরের মতো আগে থেকে ব্যাগ বাড়িয়ে জায়গাটা দখল করে নিতে, আমার অসম্ভব রাগ হয়। রাগ হয়, আমার ভদ্রতা দেখাতে না পারার ক্ষোভে। তাছাড়া, ঐ ছেলেটা, বা অন্য লোকেরা কি ভাবলো, আমিই ঐ জায়গাটায় বসার জন্য উৎসুক, লোভী ছিলাম? পাশের লোকটা, তবে আমার দিকে সমবেদনার হাসি হাসলো কেন?

তখন, ঐ সীটে বসা ছেলেটির মুখ দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হয়। ব্যাগ হাতে নিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে সুবেশ যুবকটি বসে আছে। কিন্তু, আসলে সাধু-বেশে একটি পাকা চোর। পরের জায়গা চুরি করে। ইতর, জোচ্চোর কোথাকার! তোমার মুখ না দেখে আমি ছাড়ছি না। তোমার মতো ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষকে আমার সারাজীবন চিনে রাখা দরকার।

আমি মুখ নিচু করে সেই যুবকটিকে জিজ্ঞেস করি, এখন কটা বাজে? ছেলেটি বোধহয় উৎকর্ণ হয়ে ছিল, নিজের অপরাধবোধে বোধহয় সজাগ হয়েছিল, কেউ কোনো মন্তব্য করে কিনা। যদিও তাকিয়ে ছিল জানালা দিয়ে বাইরে, কিন্তু কান খাড়া ছিল বোধহয় এদিকে। আমার প্রশ্নে ধড়মড় করে নড়েচড়ে উঠে বলে, অ্যাঁ?

—কটা বাজে?

—কী বলছেন?

—ক-টা বাজে, বলবেন দয়া করে? আমি চিবিয়ে চিবিয়ে প্রশ্ন করি। যুবকটি অবাক হয়ে আমার কঠিন লোহার মতো মুখের দিকে তাকায়। বোধহয় একবার ভাবে যে, আমি অসম্ভব রেগে গেছি, ওর উঠে আমাকেই সীট ছেড়ে দেওয়া উচিত। তা যদি ও করতো. অর্থাৎ আমাকে ও ওর নিজের মতো বা জনতার মতো সীট-লোভী মনে করে তা প্রকাশ করতো. তা হলে আমি সেই মুহূর্তে বোধহয় ওকে মেরেই বসতুম! তার বদলে, ছেলেটি বসে থেকেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, ভ্যাবাচ্যাকা গলায় বলে, দশটা বাজতে দশ! ততক্ষণ আমি ওর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, ওর মুখের ছাঁচ তুলে নিই আমার মনে, ঐ মুখ আমার চিরকাল মনে থাকবে, চিরকাল আমি ঘৃণা করবো।

আমারই ভাগ্যের দোষে, সেই ছেলেটি হয়েছে আমার মামাতো বোনের স্বামী। এখন দেখা যাচ্ছে, কি সুন্দর ভালো ছেলে। সবাই বলছে, হীরের টুকরো জামাই। সত্যিই অরুণার ভাগ্য বলতে হবে! আমিও ওর চরিত্রে কোনো খুঁত দেখতে পাই না, এমন মানানসই ব্যবহার, যেখানে ঠিক যেমন দরকার। কিন্তু সেই মুখ আমার মনে আছে, আমার কাছে বিষম ঘৃণ্য ঐ মুখ, দেখলেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। অথচ ছেলেটির আমাকে নিশ্চয় মনে নেই, আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার এত সহজ! অর্থাৎ বাসে ও বহুবার সীট চুরি করেছে, এখনও করে চলেছে বোধহয়, আমার সঙ্গে একটা ঘটনা ওর মনে থাকবে কি করে।

অথচ, একথা আমি কারুকে বলতে পারি না। বললে, বাড়ির সবাই নিশ্চয়

হো-হো করে হেসে উঠবে। বলবে, আগ বাড়িয়ে একটা খালি সীট পেয়ে বসেছিল, এটা আবার দোষের নাকি? তুমি বসতে পারো নি, এই জন্য তোমার রাগ? আহা, তখন কি আর পুলকেশ জানতো যে একদিন তুমি ওর গুরুজন হবে? তা হলে, নিশ্চয়ই তোমাকেই সীট ছেড়ে দিত।—এসব শুনে আমার মাথায় খুন চড়ে যাবে বলেই আমি কারুকে বলি না। ওর বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ, আমাকে দয়া দেখাবার সুযোগ না দিয়ে ও কেন নিজেই আগে জায়গা জুড়ে বসেছিল? আমি হয়তো ওকেই বসতে অনুরোধ করতুম।

আহা, অরুণা সুখী হোক্। কিন্তু অরুণার স্বামী পুলকেশকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবো না—যতদিন না ও নিজের মোটর গাড়ি কেনে। মোটর গাড়ি কিনলে একমাত্র তখনই হয়তো আমার মন থেকে ওর সীট চুরির অপবাদটা মুছে যাবে।

২৪

*****

জীবনে একবারই মাত্র কিছুদিনের জন্য আমি একটা দামী কলম ব্যবহার করেছিলাম। একটি ১৮ ক্যারেট সোনার নিব দেওয়া সেফার্স কলম। আমার বাবা খুব একটা উদার, মুক্ত হস্ত পুরুষ ছিলেন না। বিশেষত ছেলেদের উপহার-টুপহার দেবার দিকে তাঁর কোনো ঝোঁক ছিল না। কিন্তু সেবার আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে বাবা হঠাৎ দিলদরিয়া ভাবে ঘোষণা করলেন, অনেকটা সর্বসমক্ষেই, যে আমি যদি একবারেই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারি, তবে আমাকে তিনি একটা দামী কলম কিনে দেবেন। ও রকম আকস্মিক ঘোষণার কারণ, আমি ভেবে দেখেছি, তাঁর নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি কিছুতেই পাশ করতে পারবো না, আমি পাশ করলে বিশ্বসংসারে একজনও ফেল করবে না সে বছর, সুতরাং রীতিমত উদারতা দেখাবাব সুযোগে, তিনি ওরকম একটা দামী ঘোষণা করে ফেলেছিলেন। এবং তারপর থেকে, আমি দেরি করে বাড়ি ফিরলে বা দুপুরে সিনেমায় পালিয়ে গেলে কিংবা ইতিহাস বই চাপা দিয়ে গোয়েন্দা-গল্প পড়ার সময় ধরা পড়লে—বাবা আর আমাকে বকুনি না দিয়ে, মৃদু, রহস্যময় হাসি হেসে বলতেন, পাশ করলে আমি কিন্তু সত্যিই একটা কলম কিনে দিতাম!

অনেক অসম্ভব ব্যাপারই পৃথিবীতে ঘটে। আমার বন্ধুরা যদিও এখনও অনেকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু এ কথা সত্যিই, আমি কিন্তু ম্যাট্রিকটা অন্তত ঠিকই পাশ করেছিলাম এবং সেবার, ঐ প্রথম বারেই।

আমার পাশ করার খবরে বাবা বোধহয় খানিকটা বিমর্ষ হয়েই পড়েছিলেন। কয়েকদিন খুব মন-মরা অবস্থায় দেখেছি। এমন কি, অন্যের সঙ্গে আলাপ করতে শুনেছি পর্যন্ত, যে, আজকাল নাকি পরীক্ষা-টরীক্ষার স্ট্যাণ্ডার্ড এত নিচে নেমে গেছে, গরু-গাধাও পাশ করে যায়! তাঁদের আমলে, যখন উইলসন্ সাহেব ছিলেন—ইত্যাদি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটা কলম কিনে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শৌখিন, সেফার্স কলম। কলমটা আমি সব সময় পকেটে নিয়ে ঘুরতাম, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বসে গল্প-গুজব করার সময় অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে কলমটা পকেট থেকে বার করে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম, কাগজে হিজিবিজি কাটতাম। আসল

উদ্দেশ্য ছিল, কলমটা সকলকে দেখানো, আমি যে পরীক্ষায় পাশ করেছি তার নির্ঘাৎ প্রমাণ।

আমার জীবনের সেই একমাত্র সৌখিন কলম পকেটমার হয়ে যায় অল্পদিনের মধ্যেই। কিন্তু সে জন্য আমার দুঃখ হয় নি। আমার বাবার ধারণা ছিল, ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর যে মাস তিনেক ছুটি থাকে, সেই সময়টাতেই অধিকাংশ ছেলে মেয়ে বখে যায়। ইউনিভারসিটির অত্যন্ত অন্যায় এতদিন ছুটি রাখা। ঐ সময় ছেলেরা লেখাপড়া করে না, অলস মাথা শয়তানের কারখানা, ঐ সময়টাতেই প্রেম-ট্রেম করার দিকে মন যায়। এই সব কারণে, বাবা আমাকে ঠিকপথে রাখবার জন্য একটিও পয়সা হাত-খরচ দিতেন না। তা ছাড়া, ঐ রকম দামী কলম কিনে দেবার পর আর অর্থব্যয়ে তাঁর একেবারেই মতি ছিল না বোধহয়। এবং উনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রেম-টেম করার সময় পয়সা খরচ করতে পেলে ছেলেরা বিড়ি-সিগারেটও খেতে শেখে, সুতরাং পয়সা না পেলেই আর ওপথে যাবে না। আমাকে তিনি ট্রামের একটা মাসিক টিকিট কিনে দিয়েছিলেন, যাতে আমি গাড়ি-ভাড়ার ছুতো করেও একটা পয়সা চাইতে না পারি। কিন্তু আমার হাতে তখন বাজার করার ভার ছিল, এ ছাড়া রেশন আনা,—আমার খুব একটা দৈন্যদশা ছিল না।

একদিন একটা ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে আছি। সদ্য দোতলা রঙিন বাস বেরিয়েছে তখন কলকাতায়, অথচ আমি তাতে উঠতে পারি না—আমাকে ট্রামেই যেতে হয়। সেদিন একটা চমৎকার নীল রঙের বাস এসে থামলো আমার সামনে, জানলার পাশে একটি মেয়ে বসে আছে। আহা কি রূপ, মনে হলো বিশ্বসংসারে এর চেয়ে রূপসী মেয়ে আর নেই। আমি তৎক্ষণাৎ যেন বিশ্বসংসার ভুলে গেলুম! মনে হলো, এই সুন্দরীকে আর একটু সময় দেখতে না পেলে আমার জীবনই বৃথা। ট্রামের টিকিট থাকা সত্ত্বেও আমি লাফ দিয়ে বাসে উঠলুম। ঠেলে ঠুলে সেই সুন্দরীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু, বেশিক্ষণ মোহিত হবার সুযোগ পেলাম না, কারণ মেয়েটি তার পরের স্টপেই নেমে গেল। বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি পকেটে হাত দিলাম, দিয়েই চমকে উঠলাম, আমার বুকের মতো বুক-পকেটও ফাঁকা। পেনটা উধাও। ট্রামের টিকিট থাকা সত্ত্বেও বাসে ওঠার ঐ ফল। কিন্তু আমি দুঃখ করিনি। সুন্দরী নারীর জন্যে সেই প্রথম আমার আত্মত্যাগ।

জীবনে আমার পকেট মারা গেছেও সেই একবার। আর কখনও না। তার প্রধান কারণ অবশ্য, আমার পকেট স্বভাবতই ফাঁকা থাকে, কলম আর

জোটেনি। কিন্তু পকেট মারা না গেলেও একটি পকেট মারের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছিল।

বিকেলবেলা ভিড়ের বাসে আসছি, শিয়ালদা পেরুবার পর, হঠাৎ আমার নাকের কাছটা একটু চুল্কে উঠলো। নাকটা চুলকোতে গিয়ে—কি যেন একটা ব্যাপারে আমার খুব অস্বস্তি লাগলো। একটা কি যেন রহস্য। আমার এক হাতে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরা, একহাত নিজের পকেটে। তবে কোন্ হাতে আমি নাক চুলকোলাম? আমার তো তিনটে হাত হতে পারে না! এইতো টের পাচ্ছি পকেটে নিজের সেই হাত আর একহাতে সত্যিই হ্যাণ্ডেল ধরে আছি, আর একটা হাতে এই মাত্র নাক চুলকোলাম। তাহলে? আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই আমি বিদ্যুৎ গতিতে নাক চুলকোনো হাতটা দিয়ে পকেটের হাতটা চেপে ধরলাম। পকেটের মধ্যে দুটো হাতে খুব হুড়োহুড়ি হতে লাগলো, কিন্তু, আমি প্রবলভাবে দৃঢ় মুষ্টিতে সেই হাতটা ধরে আছি। মুখে কিছু বলি নি। সেই হাতটা অনুসরণ করে, সেই হাতের মালিককে দেখলাম। আমারই পাশে দাঁড়ানো রোগা চেহারার একটি যুবক। আমার পকেটে কিছুই ছিল না, কয়েকটা বাজে কাগজপত্র আর খুচরো পয়সা, কিন্তু সেই অনধিকার-প্রবেশকরা হাতটি আমি পকেটের মধ্যেই ধরে রেখেছি, এ অবস্থায় একবার 'চোর', 'পকেটমার' বলে চেঁচিয়ে উঠলেই সবাই,—বাসের সব কটা লোক, ছেলেটাকে মেরে একেবারে ছাতু করে দেবে। যে-সব লোক কোনোদিনও দুর্গাপুজো, কালীপুজো কিংবা রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে চাঁদা দেয় না, তারাও পকেটমারকে মারার সময় চাঁদা দিতে এগিয়ে আসে।

তখনও বজ্রমুষ্টিতে হাতটা ধরা, তাকিয়ে দেখি ছেলেটির চোখে বিষন্ন মিনতি মাখানো। অর্থাৎ কিছুতো নিতে পারে নি, এ অবস্থায় ওকে যেন আমি আর মার না খাইয়ে ছেড়ে দিই। আমি চোখ দিয়ে ওকে ভস্মসাৎ করলুম প্রায়। মুখে একটুও কথা হলো না। কিন্তু চোখে চোখে আমাদের কথা হলো কিছুক্ষণ। ছেলেটি চোখ দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে। আমি চোখ দিয়ে ওকে ধমকাচ্ছি। যে-কোনো মুহূর্তে ওকে মার খাওয়াতে পারি। হঠাৎ দেখি ছেলেটির চোখ দিয়ে সত্যিসত্যিই এক ফোঁটা জল গড়িয়ে এলো। তখন হাসি পেল আমার। আমি বন্দী হাতটাকে মুক্তি দিলাম পকেট থেকে। ছোকরাটা সঙ্গে সঙ্গে বাস থেকে নেমে গেল।

কিন্তু সেই যে ছেলেটির চোখে চোখে এতক্ষণ তাকিয়েছিলাম, ফলে ছেলেটির মুখ আমার মনে আঁকা হয়ে গেল। সম্ভবত ওর মনেও আমার মুখ।

একদিন বাসে উঠতে যাচ্ছি, পাশ থেকে একজন বলে উঠলো, ওঃ, আপনি এ

বাসে উঠছেন? থাক্, তাহলে আমি আর উঠবো না! তাকিয়ে দেখি সেই পকেটমার ছেলেটা, আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আমিও হাসলাম। আরও একদিন বাসের ভিড়ের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার দেখা। এবারও ছেলেটা বললো, আমি নেমে যাচ্ছি স্যার, কিছু বলবেন না। চট্ করে সত্যিই নেমে গেল।

তারপর থেকে ছেলেটার সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হতো। একদিন অনেক-ক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্পও করেছিলাম। পকেটমারদের জীবনের সুখদুঃখের কথা কিছু শুনতে হয়েছিল। ওদের অভাব-অভিযোগ, ওদের প্রতি পুলিশের অবিচার। সেদিন একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, প্রত্যেকেরই যে-কোনো ব্যাপারে নিজস্ব অনেক দাবি থাকে। ওর দাবি শুনে মনে হলো, পকেটমার-সমাজেরও জীবিকার একটা প্রোটেক্‌শান দরকার, ওদের কাজের বোনাস ও ইনক্রিমেণ্ট, এবং সাধারণ লোকের পকেটে যথেষ্ট টাকা থাকা ও মানুষজনের চরিত্র কিছুটা আপনভোলা ও উদাসীন করে দেওয়া—সরকারেরই দায়িত্ব। নইলে ওদের জীবিকা চলবে কি করে? এই যে, এখন বেশীর ভাগ লোকের পকেটেই টাকা থাকে না—এটা তো একটা নিশ্চিত সরকারি ষড়যন্ত্র, পকেটমারদের জব্দ ও বেকার করার জন্য।

আমি ছেলেটিকে বললাম, ওসব কথা থাক্। শুনেছি তোমাদের সারাদিনের সব রোজগার এক জায়গায় জড়ো হয়। তারপর পেন—ঘড়ি ইত্যাদি বিক্রি করার ব্যবস্থা হয় একসঙ্গে। ভাই, আমার একটা সেফার্স কলম চুরি গিয়েছিল বাসে। তোমাদেরই কারুর কাজ। সেটা আমায় ফেরৎ দিতে পারো? আমি সেটার দাম দিতেও রাজি আছি। কিন্তু ওটা আমার বাবার স্মৃতিচিহ্ন।

—আপনার পেন? কবে গেছে?

—বছর তিন চার আগে।

—ওঃ, অতদিন আগের জিনিস পাবেন না। এরপর কিছু চুরি গেলে—আমায় বলবেন। আপনার জিনিস আমি ঠিক ফেরৎ দিয়ে দেব।

—কিন্তু ওটাই দেখো না চেষ্টা করে। আমার কলমের গায়ে আমার নাম লেখা আছে। ওটা আমার বাবা দিয়েছিলেন। বাবা মারা গেছেন, তাই ওটা আমি রাখতে চাই।

—না স্যার, ওটা পাবার আর চান্স নেই। আপনি অন্য কলম চান তো বলুন। খুব ভালো কলম এনে দেবো—ঐ সেফার্সই।

—না না, সে দরকার নেই। তোমাদের কাছ থেকে কলম নিয়ে মরি আর কি! শেষে রাস্তায় কোন্ লোক নিজের কলমটা চিনতে পেরে···

—আপনার কলমটা কোথায় মারা গেছে?

—কলেজ স্ট্রিটে, এক শীতকালের সন্ধেবেলা।

—হুঁ, ওটা গগনলালের এলাকা। আচ্ছা, দেখবো এখন গগনলালকে জিজ্ঞেস করে।

—দেখো না, ওটা আমার খুবই শখের!

—আপনি যাবেন গগনদার বাড়ি?

—আমি যাবো? সে কি হে?

—হ্যাঁ স্যার! গগন আমাদের মতো নয়, রীতিমত ভদ্দর লোক, বিরাট তিনতলা বাড়ি। তিন পুরুষ ধরে ওদের এই ব্যবসা। উনিই তো আমাদের সর্দার।

—যাঃ! তিন পুরুষ ধরে পকেটমারের ব্যবসা?

—বিশ্বাস করুন! বাড়ি শুদ্ধু সকলের। আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন, কারুকে বলবেন না, তবে আপনাকে আমি গগনদার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। অবশ্য, পুলিশকে হাত করা আছে গগনদার!

সত্যরক্ষার খাতিরে আমি গগনলাল সামন্তের বাড়ির ঠিকানা জানালাম না। কিন্তু সেখানে গিয়েছিলাম। গগনলাল সামন্ত একটি মধ্য বয়স্ক ঘাড়-ছাঁটা লোক, দেখলে মনে হয় রাজনীতি করেন। আমাকে তিনি খুব একটা পছন্দ করলেন না। আমার সঙ্গীর দিকে আড়চোখে বারবার ভ্রূকুটি করলেন। আমার সঙ্গী সারা দেহটা মুচড়ে অশেষ কৃতজ্ঞতার ভঙ্গিতে জানাতে লাগলো, যে একদিন আমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি, সেইজন্যই,—মানে সামান্য একটা উপকার, কলমটা আমার বাবার স্মৃতি—ইত্যাদি।

গগনলাল বললেন, চার বছর আগের কলম পাবার কোনো উপায় নেই। এরপর যদি আবার কোনো—ইত্যাদি। সেই সঙ্গে, পকেটমারের সর্দার আমাকে একটি উপদেশও দিলেন, ট্রামে-বাসে সাবধান হয়ে চলাফেরা করাই ভালো, বুঝলেন!

কথা হচ্ছিল বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় হিলতোলা জুতোর টক্‌টক্ শব্দ করতে করতে একটি ঝলমলে পোশাক পরা যুবতী বেরিয়ে এলো বাড়ি থেকে। এক ঝলক তার দিকে তাকিয়েই চার বছর আগের সেই সন্ধেবেলার স্মৃতি মনে পড়লো। হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, এই সেই বাসের মধ্যে জানলার ধারে বসে থাকা সুন্দরীর মুখ। যা দেখে আমি মোহিত হয়েছিলাম। হ্যাঁ, নিশ্চিত, কোনো সন্দেহ নেই। মেয়েটিকে দেখেই আমার মনে হলো, আমার যদি আর একটা কলম থাকতো, আমি ওর পায়ে অর্ঘ্য দিতাম আবার।

২৫

*****

আমি একটি অলীক শহরের অধিবাসী। যখন একা একা পথ হেঁটে যাই, তখন আমি আমার ছায়ার মুখোমুখি থাকি, পাশাপাশি নয়। আমি ঠিক কোন্ দিকে যাবো বুঝতে পারি না, আমার ছায়া পথ-নির্দেশ করে। অনেক সময় বলে, রাস্তাটা বাঁ-দিকে বেঁকে গেছে, তোমার যাবার দরকার সামনে, কিন্তু তুমি এখন ডান দিকেই যাও। এমন অবাস্তব, অলীক, অভ্রপুষ্প, মায়া, দৃষ্টিবিভ্রম এই পথগুলি।

বস্তুত, যে-কোনো বাস্তব শহরের রাস্তাই হওয়া উচিত সোজা। কখনও বাম-দক্ষিণে বেঁকে যাবে না। রাস্তা তো আর নদী নয় যে, যে-কোনো দিকে ঘুরে যাবার অধিকার আছে! নদী ইচ্ছেমতো যায়, ইচ্ছেমতো লুকোচুরি খেলে, নারী-শরীরের মতো প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে নতুন সৌন্দর্য দেখানো তাকে মানায়—কারণ খেয়ালীপনা প্রকৃতিরই ভূষণ। কিন্তু মানুষ যেখানে সম্মিলিতভাবে কাজ করে সেখানে খেয়ালীপনার কোনো অবকাশ নেই—সেখানে শুধু কেজো, দরকারী, শ্রীহীন—সরকারী চিঠির ভাষা ও কাগজের মতো কঠোর ও কুৎসিত হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন, নদী আঁকাবাকা হয়, কিন্তু মানুষের কাটা খাল হয় সোজা আর লম্বা। মঙ্গলগ্রহে কিংবা চাঁদে প্রথম মানুষের অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞানীদের মনে আসে—যখন দূরবীনে কয়েকটা লম্বা লম্বা খালের মতো দেখা গিয়েছিল। ওরকম সোজা বলেই মনে হয়েছিল—ওগুলো নদী নয়, প্রাকৃতিক নয়, প্রাণীর তৈরি। সেই নিয়মে, প্রতি শহরের পথ হওয়া উচিত চওড়া সোজা, বিচার-বিভাগীয় তদন্তের মতো দীর্ঘ। তার বদলে আমার এই অলীক কলকাতা শহরে সব রাস্তাই কুটিল ও বক্র, মানুষের মনের মতো অলিগলি।

আরেকটি অদ্ভুত কাণ্ড এই শহরের বাড়িগুলি। এক-একটা বাড়ির দেয়াল এক-এক রঙের হয় কেন? বাড়ি চিনতেই পারি না। এমন নানান রঙের বাড়ি

হলে কি সহজে চেনা যায়! আমার কোনো একটা বাড়িতে যাবার দরকার হলে —আমি যে-কোনো রাস্তায়, যে-কোনো দিকে মোড় ঘুরে যে-কোনো বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলি, অমুক আছে? ঠিক কোনো না কোনো অমুক বেরিয়ে আসে। বাংলা ভাষায় দু'টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শব্দ আছে, 'অমুক' আর 'ইয়ে', অধিকাংশ বাক্যালাপ আমি এই দুটি শব্দপ্রয়োগে সেরে ফেলি। কোনো অসুবিধে হয় না। কিন্তু বাড়িগুলো নানা রঙের হওয়ার কোনো যুক্তিই নেই। 'ঈশ্বর গ্রাম সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষ সৃষ্টি করেছে নগর'। তাহলে, মানুষের গড়া নগর ঈশ্বরের সৃষ্টির চেয়ে আলাদা হবে না? লাল-নীল-হলুদ-গোলাপী কেন বাড়ির রং, ওসব তো ফুলের রং হয়. বাস্তব শহরের যে-কোনো বা প্রতিটি বাড়ির রং হওয়া উচিত কালো, কালোই হওয়া উচিত সমস্ত মানবসমাজের রং। প্রকৃতির একমাত্র কালো অঙ্গ তো যা দেখছি কয়লা, তাও থাকে মাটির নিচে, মানুষ সেগুলো ওপরে তুলেও পুড়িয়ে ছাই রং করে দিচ্ছে। সুতরাং, সমস্ত শহরের বাড়ির রং কালো করে দেওয়া উচিত আইন করে, কোনো বাড়ি আর ময়লা দেখাবে না, কুৎসিত দেখাবে না, আলাদা দেখাবে না। একমাত্র আলাদা রং, সাদা রঙের হোক দেবালয়গুলো,—মন্দির মসজিদ চৈত্য গীর্জা সিনাগগ্। দেবালয় আর মানুষের বাড়ির রং যদি এক হয়, তবে দেবালয়গুলো আলাদা করে করে তৈরি করার দরকার কি? 'হৃদয় মন্দির' শব্দটা যে আজকাল অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে. তার কারণ হৃদয়ের কোনো রং নেই, মানুষের দেহকে দেবতার আয়তন হিসেবে ভাবতে অনেক কষ্ট হয়, কেননা মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবে চিনতেই বহু সময় কেটে যায়।

আঃ, কল্পনা করেও কত সুখ! যেদিন আমার শহর বাস্তব হয়ে উঠবে— প্রতিটি পথ পিচবাঁধানো চকচকে, যতদূর দৃষ্টি যায় সোজা—দু-পাশের প্রাসাদসারি নিখুঁত কালো রঙের, কোথাও অন্য রঙের মলিনতা নেই—মাঝে মাঝে দু একটি শ্বেত-শুভ্র দেবালয় ছাড়া। প্রকৃতি জানে কিভাবে সুন্দরের দর্শন করতে হয়, মানুষ জানে না। প্রকৃতি জানে, সুন্দর জিনিস সব সময় দেখতে নেই, মাঝে মাঝে চোখের আড়াল করতে হয়—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের আকর যে নারী— তাকেও অনবরত দেখলে পুরোনো ও মলিন হয়ে যায়—মানুষ তবুও নারীকে মলিন করে। আমি এই তত্ত্ব জেনে একটি বিশেষ নারীকে ঘনঘন দেখতে যাই নি। কিন্তু নারীও মলিনা হতে চায়—সে আমাকে ভুলে গিয়ে অপর ঘনঘন-আসা পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠা হয়েছে। প্রকৃতির যে-টুকু কালো রং, সেটুকু সৃষ্টির নয়, বিস্মৃতির, অর্থাৎ রাত্রি। প্রকৃতির যত সৌন্দর্য দিনের বেলায়

দেখায়, সেগুলো আবার আড়াল করে রাখে সারারাত। সেইজন্তই প্রকৃতি মলিন হয় না, হয়তো।

না, শুধু তাই নয়। রাত্রিবেলা চাঁদ ও তারাগুলো দেখার জন্ত অমন চমৎকার অন্ধকার পটভূমিকা তৈরি করে। দিনের আলোয় যাঁরা চাঁদ দেখেছেন—তাঁরা জানেন, সে চাঁদ ব্যবসায়ীর লাল রঙের বাড়ির পাশে লাল রঙের মন্দিরের মতই কুৎসিত দেখায়। শুভ্র দেবালয় দর্শনের জন্ত শহরের প্রতিটি বাড়ি কালো না হলে চলে না।

এই অলীক শহরের মানুষগুলোও এমন দুর্বোধ্য যে, আজ পর্যন্ত কারুকে এক-বিন্দু বুঝতে পারলুম না। একদা আমি দু'টি লোকের সংলাপ শুনেছিলাম একটি জটিল রাস্তার মোড়ে। দু'টি লাল ও বেগুনী রঙের মানুষ। বলা বাহুল্য, ওদের গায়ের রং লাল কিংবা বেগুনী ছিল না, স্বাভাবিক মানুষের গায়ের রং যেমন হয়, ময়লা ঘোলাটে জলের মতো। কিন্তু ওদের একজন একটা কটকটে লাল রঙের র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ছিল, বাকিজন বেগুনী রঙের স্যুট। ওদের দু'জনের পোশাকই এমন চড়া রঙের যে দেখলে প্রথমেই মনে হয় ওদের কোনো নাম নেই—দু'টি লাল ও বেগুনী রঙের মানুষ মাত্র। ওদের সংলাপ এই রকম: বেগুনী লালকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে বললো, এই যে বাবলু, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হলো, তিরিশটা টাকা দেতো।—লাল একটু উদাসীন ভঙ্গীতে বললো, টাকা নেই তো ভাই।

—বাড়ি গিয়ে দিবি চল্! আমার হঠাৎ বিশেষ দরকার পড়েছে!

—আমার বাড়িতেও টাকা নেই।

—মহা মুশকিল হলো তো। আচ্ছা, তুই একটা চেক্ লিখে দে না, আমি কাল দশটার মধ্যেই ভাঙিয়ে নেবো এখন।

—আমার ব্যাঙ্ক চেক্-বই দেয় না।

—সে কিরে, তোর কোন্ ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট?

—ব্লাড ব্যাঙ্কে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে এই বাক্যালাপ শুনলাম। সারাদিনটা সেদিন আমার দুশ্চিন্তায় গেল—ওদের কথার মর্মার্থ বুঝতে না পেরে নয়, অন্ত কারণে, ওদের রং বুঝতে না পেরে। যে-লোকের ব্লাড ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট তাকে দেখে লাল মানুষ মনে হতে পারে, কিন্তু যে ঋণ চাইছে সে বেগুনী কেন? কি যুক্তি থাকতে পারে এর? সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য এই কাণ্ডটি ওরা করে গেল আমার চোখের সামনে!

আরেকদিনও এরকম সংলাপ শুনেছিলাম আমি। সেদিন আমার মনে হয়েছিল—কোনো বাস্তব শহরে চিড়িয়াখানা থাকা উচিত নয়। সম্পূর্ণ অবান্তর পাগলামি বলা যায়। একদিন আমার এই অলীক শহরের চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলাম আমি—তখন শীতের মৌসুমী পাখি এসেছে। কিন্তু পাখি দেখার বদলে—হিংস্র জন্তু-জানোয়ারগুলো দেখার কৌতূহলই বেশী হলো আমার—কারণ ওদের তো সহজে দেখতে পাই না। একটি ঝোপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ঝোপের আড়ালের বেঞ্চি থেকে টুকরো সংলাপ কানে এলো। একটি বিরক্তি ও ভয়-মিশ্রিত বালিকার চাপা কণ্ঠ, না, একি অসভ্যতা হচ্ছে, ছাড়ুন!

গলার মধ্যে আস্ত পান্তুয়া ঢোকানো অবস্থার মতো স্বরে একটি পুরুষের উক্তি, একি লীলা, তুমি রাগ করছো!

—না, সত্যি ভাল্লাগেনা। চলুন এবার যাই।

—একটু বসো! আমাকে বুঝি তোমার একটুও ভালো লাগে না?

—ওসব কি কথা। আঃ না, চলুন।

—তোমাকে আমার এমন ভালো লাগে। সত্যি লীলা, তোমার মতন—

—একি একি! না আপনার সঙ্গে আমার আসাই উচিত হয় নি।

—আমাকে তুমি ভুল বুঝছো। আমি সত্যি তোমাকে এত—। তোমাকে কাছে পাবার জন্য—

—ইস্, ছি-ছি-ছি। ছাড়ুন, ছাড়ুন. উঃ, দূর হয়ে যান! আমি একাই যেতে পারবো। অসভ্য, জানোয়ার কোথাকার!

—হা-হা-হা। সত্যি তুমি রেগে যাচ্ছো—

আমার পায়ের নিচ দিয়ে দুটো শিকড় বেরিয়ে আমাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে রেখেছিল। নইলে, আগেই আমি স্থানত্যাগ করতুম। কিন্তু পরেও বহুক্ষণ আমি ওখান থেকে নড়তে পারলুম না। ওই একদৃশ্যের বেতার নাটকটার জন্য নয়, ওরকম তো যেখানে-সেখানে আকছার ঘটছে, এমন কি বেতারেও ওরকম কুচ্ছিৎ নাটক শোনা যায় অসংখ্য। কিন্তু, আমি অনড় হয়েছিলাম, কারণ মেয়েটির 'জানোয়ার' বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকটির হা-হা করে হেসে ওঠার মধ্যে আমি অবিকল একটি হায়নার ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। চিড়িয়াখানার রেলিঙের বাইরে, খোলামেলা মাঠে ঝোপের পাশে হায়নার ডাক শুনতে পাই। তা হলে আর চিড়িয়াখানায় ও-সব জানোয়ার পুষে লাভ কি? সেদিনই আমার উপলব্ধি হয়েছিল এ কথা যে, ক্লাইভ ষ্ট্রীট কেন রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখে নি। ক্লাইভ ষ্ট্রীটে একদিন প্রকাশ্য দিনমানে আমি দু'টি কুমীরকে পাশাপাশি বুকে হেঁটে যেতে

দেখেছিলাম। তাদের দু'জনেরই মাথায় পাগড়ি এবং হাতে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। কুমীর দু'টো গল্প করতে করতে পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল এবং একটা সর্ষের তেলের পুকুরে নেমে সাঁতার কাটতে লাগলো।

কিন্তু এর সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না সেই বৃদ্ধের। এই অলীক শহরের দুর্বোধ্যতম মানুষ। কাল রাত্রে।

আমার এক বন্ধু আমাকে একবার বলেছিল যে, যে-কোনো অচেনা মেয়েকেই 'আপনাকে আগে অনেকবার দেখেছি' বললে খুব খুশী হয়। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার উপায়—এবং রোগ শুনলেই ওষুধের নাম বলা—পৃথিবীর যাবতীয় লোকের স্বভাব। নাই হোক, বন্ধুটির উপদেশ মতো আমি একবার এক জন-সম্মিলনীতে একটি অচেনা রূপসী যুবতীকে বলেছিলাম, আমায় চিনতে পারছো, ইন্দ্রাণী? কেমন আছো?—এর উত্তরে মেয়েটি বলে যে, সে আমাকে একটুও চিনতে পারে নি, তার নাম ইন্দ্রাণী নয় এবং আমাকে দেখার পরমুহূর্ত থেকে সে আর ভালো নেই। একটুও দমিত না হয়ে আমি তবু বলেছিলাম—আমি তাকে বহুকাল ধরে চিনি, একজন্ম আগে থেকে, গতজন্মে তার নাম ছিল ইন্দ্রাণী। আমার সব মনে আছে, আমি জাতিস্মর! মেয়েটি এ কথায়ও একটুও বিচলিত হয় নি, এবং এর পরবর্তী আখ্যান এখানে আর বিবৃত করার দরকার নেই—শুধু এটুকু বললেই হবে—সেদিনের স্মৃতি আমার পক্ষে সুখকর নয়।

কিন্তু, কাল রাত্রে আমি একজন সত্যিকারের জাতিস্মরেরই দেখা পেয়েছিলাম হয়তো। সন্ধের পর আকাশ-জোড়া মেঘ, আমি একা ছিলাম। এই শহরে আমার কোথাও যাবার জায়গা ছিল না, কোনো একটি মুখও মনে পড়ে নি, যার কাছে গিয়ে নির্ভয়ে বলতে পারি, কতদিন তোমায় দেখি নি, তুমি কেমন আছো? মেঘলা আকাশের নিচে বোধ হয় সব মানুষই নিজেকে খুব একা মনে করে, কারণ সেসময় তার ছায়াও পড়ে না। একা থাকতে থাকতে আমার মন বিষম ভারী হয়ে গেল। আমি রাস্তার মানুষদের মুখের দিকে চেয়ে রইলুম, এরা সন্ধেবেলায় কে কোথায় যায় বোঝা যায় না। কে এখনই বাড়ি থেকে বেরুলো, কে বাড়ি ফিরে চলেছে—কে এইমাত্র একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করে এলো, কে এখন দেখা করতে যাচ্ছে—এসব কিছুই কারুর মুখে লেখা নেই। এমন কি, একটা ফার্নিচারের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আয়নায় দেখতে পেলাম—আশ্চর্য, সব মানুষের মুখই আমার মতো দেখতে, কোনো তফাত নেই। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ময়দানের মধ্যে বহুক্ষণ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থেমে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, একটু পরেই ঘুম আসে।

যখন ঘুম ভাঙে, তখনও বৃষ্টি আসে নি, বরং মেঘ কেটে জ্যোৎস্না উঠছে। নীল রঙের জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রং এমন স্পষ্ট নীল দেখায় যে আমি অবাক হতে গিয়েও ভাবি—অভিসারে যাবার সময় রাধাও নিজেকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য নীল রঙের শাড়ি পরতো। ফলে, আমি জ্যোৎস্না থেকে অন্যমনস্ক হয়ে রেড রোড ধরে হাঁটতে শুরু করি। সেই সময় সেই জাতিস্মরের সঙ্গে আমার দেখা হয়। লোকটি বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে ছিল। অত রাত, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম দুর্বৃত্ত। কিন্তু, লোকটি অতিশয় বৃদ্ধ। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটাও অস্বাভাবিক—গাছে হেলান দিয়ে বাহুতে মুখ ঢেকে। আমি কাছে এগিয়ে বলি, আপনার কি শরীর অসুস্থ লাগছে ? আমি কোনো সাহায্য করতে পারি ?

লোকটি আমার দিকে ভারী কাচের চশমার মধ্য দিয়ে তাকালেন ! তারপর বললেন, না, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন তো ?

আমি একটু বিব্রত হয়ে বলি, ও আচ্ছা, বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা চাইছি। এত রাত্রে—এভাবে, সেইজন্যই—

—আমি রোজ এখানে আসি। অনেক রাত পর্যন্ত থাকি। এই গাছটি আমার বন্ধু !

আমি একটু কাষ্ঠ হাসির চেষ্টা করে বলি, তা বটে, গাছপালা ছাড়া খাঁটি বন্ধু আজকাল পাওয়াই মুশকিল।

—না, মানুষই মানুষের বন্ধু হয়। গাছ গাছের।

আমি চলে যাবার ভঙ্গিতে দু-এক পা এগিয়েছিলাম, এবার লোকটির দিকে আবার ঘুরে তাকালাম। লোকটি আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললেন, যদি বলি, আমি আর জন্মে গাছ ছিলাম ? আমার মনে আছে !

আমি বললাম, 'যদি বলি' আর সত্যি সত্যি বলার মধ্যে অনেক তফাত।

—সত্যিই আমি আগের জন্মে গাছ ছিলাম। এই গাছটার পাশে। এ তখন ছিল আমার বন্ধু। আমার ফুল থেকে মৌমাছি উড়ে গিয়ে ওর ফুলে বসতো। আমি জাতিস্মর। আমার মনে আছে।

আমি এবার বৃদ্ধকে যা সন্দেহ করার তাই করি। একটু হেসে বললাম, তা নয়, আপনার আগের জন্মের কথা মনে আছে। কিন্তু এ জন্মের সব কথা মনে আছে কি ? যেমন আপনার নাম কি, বাড়ি কোথায়, আজ কি বার ? কত তারিখ, এখন ক'টা বাজে—এই সব ?

লোকটি বললেন, সব জানি, সব মনে আছে। আর এও জানি, তুমি একটি

অজ্ঞান ছোক্‌রা! তোমার চোখ খুব খারাপ। তুমি অবিলম্বে চশমা নাও। নইলে হোঁচট খেয়ে মরবে!

—আচ্ছা ধন্যবাদ, চলি এবার।

আমার খিদে পেয়েছিল, তাই একটু জোরে হাঁটতে থাকি। তারপর শর্টকাট করার জন্য রেড রোড ছেড়ে মাঠের মধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে একটা গর্তে পড়ে হোঁচট খেয়ে পা মুচকে পড়ে যাই। কিন্তু ব্যথার বদলে বিস্ময়ে ককিয়ে উঠি আমি। আশ্চর্য, বৃদ্ধ কি করে জানলো আমি হোঁচট খাবো। অথবা, ও বলেছে বলেই আমি হোঁচট খেলাম। ইচ্ছে হল জাতিস্মর বৃদ্ধের কাছে ফিরে গিয়ে গাছের পাশে যদি বৃদ্ধকে দেখতে না পাই, যদি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে—তবে এই মধ্যরাত্রে শুধু শুধু ভয় পেতে হবে আমাকে। অথবা, বুড়োটাকে সত্যিই ওখানে এখন দেখতে পেলে আমি এবার ভয় পাবো—দেখতে না পেলে বরং নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু, ঝুঁকি নিয়ে আমি আর ফিরে গেলাম না।

তাহলে, হোঁচট খাওয়া সম্পর্কে বুড়োর কথা সত্যি হলে—আগের কথাগুলোও সত্যি। আমার চোখ খারাপ—এটা ওই বুড়ো পুরু কাচের চশমা দিয়ে দেখতে পেলো! আমার দেখার ভঙ্গি খারাপ, অনেকেই বলেছে, আমি মানতে চাই না, আমি বলি, আমি বিশেষভাবে দেখি। সে যাই হোক, আমার আই সাইট অত্যন্ত ভালো—আমি এক মাইল দূর থেকে কোনো বন্ধুর পকেটের দশ টাকার নোট দেখতে পাই—এত শক্তিশালী আমার দৃষ্টিশক্তি, অথচ, আমার চোখের দেখা খারাপ, সেটাকে স্বাভাবিক করার জন্য আমাকে চশমা নিতে হবে—তবে আমি হোঁচট খাবো না—এ কথা আমাকে বলে। এক চশমা-পরা জাতিস্মর—যুক্তির জালে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি! দূরে, শহরের সবকটা বাড়ির রং এখন কালো দেখাচ্ছে।

জ্যোৎস্নায় আমার একটা ছোট্ট ছায়া পড়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে আমি টুকরো হেসে নিচু গলায় বলি, থাক, যথেষ্ট হয়েছে। নীললোহিত, আর তুমি 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' লিখো না।

২৬

*****

বলুন তো আলোতে কি দেখা যায় না ? বলুন, বলুন, একমাত্র কোন্ জিনিস আলোতে দেখা যায় না ?

আমি রেবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। বেণী দুলিয়ে, কচি মাথাটা ঝাঁকিয়ে রেবা বললো, বলুন, বলুন, বলতে পারছেন না ?

আমি মাথা চুলকে বললুম, না তো।

—ভাবুন একটু। কী, পারবেন না ঠিক ? অন্ধকার ! আলোতে অন্ধকার দেখা যায় না। বাঃ আপনি কিচ্ছু জানেন না।

রেবা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। শুধু আমি কেন, ঘরে আরও দুতিনজন ছিল, রেবার ধাঁধার জবাব কেউই তো দিতে পারে নি।

রেবা আমার বন্ধু নীতীশের বোন। দশ-এগারো বছর বয়েস থেকে ওকে দেখছি, ভারী সুন্দর ছটফটে মেয়ে রেবা। আমরা নীতীশদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দিচ্ছি বা তাস খেলছি, রেবা হঠাৎ ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকে আমাদের এক একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করতো। ওর মুখ চোখ দেখে মনে হতো, এই মাত্র ও নিজেই ধাঁধাটা বানালো—এবং তখুনি ও কারুকে পরীক্ষা করতে চায়। বেশীর ভাগ ধাঁধাই রেবার নিজস্ব, আমি আগে অন্য কারুর মুখে শুনিনি। আরেকবার ও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বলুন তো, ভগবানকে সব সময় কোথায় পাওয়া যায় ?

আমি বলেছিলুম, এ আবার একটা ধাঁধা নাকি ? ভগবান সারা পৃথিবীতেই সব সময় ছড়িয়ে থাকেন, শুনেছি।

—বাঃ, তা নয়। কোথায় আপনি সব সময়ই ইচ্ছে করলে দেখতে পাবেন ?

—এটা বড় শক্ত, রেবা। এটা আমি পারবো না।

রেবা খিলখিল করে হেসে বললে, কী যে আপনি, মোটেই মাথা ঘামাতে চান না। একটু ভাবুন, এটা খুব সহজ !

আমি একটুক্ষণ মাথা চুলকে বললুম, কোথায় সব সময় ভগবানকে দেখতে পাবো? উঁহু, এটা খুব শক্ত, আমি কিছুতেই পারবো না।

—পারলেন না? ডিক্‌শনারিতে! যে কোন ডিক্‌শনারির মধ্যেই ভগবান পাবেন।

তখন রেবার বয়েস পনেরো-ষোল হবে। ছেলেবেলা থেকেই ওকে দেখছি, তাই ওর বড়ো হয়ে ওঠাটা মনে থাকে না। ওকে ছেলেমানুষই মনে হয়। আমি হয়তো রেবাকে দেখে একদিন বললুম, কী রেবা এবার কোন্ ক্লাস হলো? তোমার স্কুল-ফাইন্যাল কোন্ বছর?

রেবা বললো, বাঃ, জানেন না বুঝি! আমি তো এখন কলেজে পড়ি, সেকেণ্ড ইয়ার আমার।

আমি চমকে গেলুম। সত্যি তো, সময় বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেছে। রেবা এখন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি, বিনুনির তলায় আর লাল রিবনের ফুল বাঁধে না। দিব্যি একটা কলেজের মেয়ের মতনই তো দেখাচ্ছে। অথচ, এতদিন একেবারেই লক্ষ্য করিনি। সেদিনও রেবা একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করেছিল। দু' একটা কথার পরই আমায় জিজ্ঞেস করলো, নীলুদা, বলুন তো বাটা বানান কি?

আমি সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এর মধ্যে আবার কিছু চালাকি আছে বুঝি? এ বানান তো সবাই জানে!

রেবা হাসি চেপে বললো, বলুন না! ভয় পাচ্ছেন কেন?

—বাংলায়?

—ইংরাজীতে।

আমি তখনও অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে চেয়ে থেকে বললুম, বাটা বানান বি এ টি এ। কেন?

রেবা গম্ভীর মুখ করে বললো. হয়ে গেছে?

আমি বললুম, হ্যাঁ।

—সত্যি?

আমি এমন গোবর গণেশ ধরনের যে তখনও ধাঁধার সে ইয়ার্কিটা ধরতে পারিনি। রেবা রাস্তার ওপরই দাঁড়িয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ে বললো, ওমা, আপনার বিয়ে টিয়ে হয়ে গেছে? কবে হলো? আমরা নেমন্তন্নই পেলুম না! দাঁড়ান মাকে বলছি—

আমি দেখলুম, রেবা এখন কলেজের মেয়ে হলে কি হয়, সেই রকমই ছেলেমানুষ আছে। আমি ওর পিঠে ছোট একটা কিল মেরে বললুম, গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি না?

রেবা ঠোঁট উল্টে বললো, ইস্, ভারী গুরুজন !

তারপর নীতিশ চলে গেল পশ্চিম জার্মানিতে। এক বছরের নাম করে গিয়ে আর ফিরলো না। নীতিশের বাড়ির আড্ডাটা আমাদের উঠে গেল। রেবার সঙ্গেও আর দেখা হয় না। ক্বচিৎ হয়তো পথে টথে দেখা হয়ে যায়। একবার গড়িয়াহাটার মোড়ে দেখা হলো, আরো তিনচারটি রঙিন মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। আমি হাসিহাসি মুখ করে জিজ্ঞেস করলুম, কি, ভালো আছো ?

রেবা দল ছেড়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বললো, উঃ, কদ্দিন বাদে দেখা। আর আসেন না কেন আমাদের বাড়িতে ?

আমি বললুম, যাবো একদিন, মা ভালো আছেন তো ? তোমার এবার ফোর্থ ইয়ার না ? কি অনার্স নিলে ?

রেবা বললো, আপনার কিছু মনে থাকে না। কতদিন কেটে গেছে তা খেয়াল আছে ? আমি এখন সিক্‌সথ ইয়ারে পড়ি, এ বছর ফিলজফিতে এম. এ দেবো।

সত্যি তা হলে অনেকদিন কেটে গেছে। রেবা তা হলে এখন আর মেয়ে নয়, নারী যাকে বলে। মেয়েরা বোধহয় সময়ের চেয়েও আগে আগে এগিয়ে যায়। গত ছ' সাত বছরে আমি যত বড হয়েছি, রেবা তার চেয়েও অনেক বেশী বড হয়ে গেছে মনে হয়। সেই রকমই ঝলমলে মুখ, শিশুর মতন চাহনি, অথচ এরই মধ্যে এম. এ পড়ে ? ভোজবাজী নাকি ?

রেবা বললো, আপনি কোন্‌দিকে যাচ্ছেন ? চলুন আমাকে এগিয়ে দেবেন বাড়ি পর্যন্ত। আমি রাজী হলুম।

রেবার কিন্তু সেই ধাঁধা জিজ্ঞেস করার স্বভাব তখনো যায় নি। একটু দূর হাঁটতে না হাঁটতেই আমাকে একটা কঠিন ধাঁধা জিজ্ঞেস করে বসলো। একটি ওজন যন্ত্রে তিনখানা মাত্র বাটখারা দিয়ে তেইশ সের কি করে মাপা যায়—এই ধরনের জটিল অঙ্ক। আমি বললাম, তুমি পাগল হয়েছো ? একেই ধাঁধাটাধা আমার মাথায় ঢোকে না, তার ওপর আবার অঙ্ক। ছি ! সবাইকে সব ধাঁধা জিজ্ঞেস করতে নেই !

রেবা হাসতে হাসতে বললো, আচ্ছা, এইটা বলুন। খুব সোজা, আপনাকে তিনটে বানান জিজ্ঞেস করবো, খুব চটপট উত্তর দিতে হবে। পারবেন ?

—বাংলা না ইংরিজি ? ইংরিজি হলে ভয় আছে, বাংলা হলে পারতেও পারি।

—বাংলা। খুব সোজা। তিনটে বানান জিজ্ঞেস করবো, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে হবে। বলুন, পিপীলিকা।

আমি বললুম, প্রথমটা হ্রস্ব-ই, তার পরেরটা হবে দীর্ঘ-ঈ, আবার হ্রস্ব-ই।

—পরিণাম?

—র-এ হ্রস্বই, মূর্ধন্য-এ আকার।

—উঁহু।

—কী হয় নি? কি বলছো তুমি?

—আবার বলুন, গোড়া থেকে তাড়াতাড়ি বলুন পিপীলিকা?

আমি বললুম।

—পরিণাম।

একটু ভেবে আমি আগের বারের মতো বললুম। রেবা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, উঁহু। আমি বেশ ছদ্ম ক্রোধের সঙ্গে বললুম, পরিণামে তুমি বলতে চাও দন্ত্যের ন? মোটেই না, তোমাদের ক্লাসে বুঝি আজকাল এই রকম বানান শেখানো হয়? স্পষ্ট ণত্ব বিধান—

রেবা কুলকুল করে হাসতে হাসতে বললো, আপনি যে কি ছেলেমানুষ? পরিণাম বানান ভুল কে বলেছে? কিন্তু উঁহু কথাটার বানান কে বলবে? আমি তিনটে বানান জিজ্ঞেস করবো বলেছিলুম, পিপীলিকা, পরিণাম আর উঁহু! পারলেন না তো!

রেবা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল। আমি বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলুম। রেবাকেও আমি এই একবার ঠকিয়েছি। এই ধাঁধাটা আমি আগে থেকেই জানতুম। তবু ইচ্ছে করে বলিনি। ধাঁধা জিজ্ঞেস করে ঠকাতে পারলে যে-রকম উজ্জ্বল ভাবে হাসে, তা দেখতে আমার ভারী ভালো লাগে। ধাঁধার উত্তর দিয়ে কি লাভ হতো? কিছুই না। কিন্তু ঠিক উত্তর না দিয়ে আমি ওর মধুর হাস্যময় মুখখানি দেখতে লাগলুম।

তারপর আবার অনেকদিন রেবার সঙ্গে দেখা হয় নি। মাঝখানে কার মুখে যেন শুনেছিলাম রেবার বিয়ে হয়ে গেছে বেশ রোমহর্ষক ভাবে। বাড়ির অমতে, বাড়ি থেকে চলে গিয়ে রেবা বিয়ে করেছে ওর গানের মাস্টার মশাইকে। তার সঙ্গে রেবাদের জাত মেলে না, সামাজিক অবস্থা মেলে না, বয়সে মেলে না— লোকটি প্রায় প্রৌঢ়, রেবা তবু তাঁকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। খবরটা শুনে আমি ভেবেছিলুম, রেবার স্বামী খুব ভাগ্যবান—কারণ রেবার মতন এমন সরল প্রাণবন্ত মেয়ে খুব কম দেখা যায়।

তারপর কাল দুপুরে আবার রেবার সঙ্গে দেখা হলো। এসপ্লানেড ট্রাম গুমটির কাছে দারুণ রোদ্দুরে একটা হলদে শাড়ি পরে রেবা দাঁড়িয়েছিল। আমি

দূর থেকে দেখেই চিনতে পেরেছি। চুপিচুপি পিছন দিক থেকে এসে আমি ওর কানের কাছে মুখ দিয়ে বললুম, এই খুকী!

দারুণ চমকে রেবা মুখ ফেরালো। মুখখানা একটু শুকনো। তবু হাসি ফুটিয়ে বললো, ওমা, আপনি! কতদিন দেখা হয় নি।

আমি বললুম, খুব তো নিজেই এবার বিয়ে সেরে ফেললে, আমাদের নেমন্তন্নও করলে না।

ও বললো, আপনার পাত্তাই পাওয়া যায় না! প্রায়ই তো কলকাতার বাইরে দেশের বাইরে থাকেন শুনেছি!

—এখন তো আছি। কোথায় বাড়ি তোমার? একদিন নেমন্তন্ন করো, তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ করি, গান শুনি।

—আমি তো বাড়িতে থাকি না। আমি একটা কলেজে পড়াই আর মেয়েদের হোস্টেলে আলাদা থাকি।

—আর তোমার স্বামী?

—তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।

—কেন? এই তো দু' এক বছর মাত্র বিয়ে হলো।

—বিয়ের কয়েক মাস পরে জানতে পারলুম, ওঁর আর একজন স্ত্রী আছে। পাঁচ-ছ বছর ধরে ওঁকে চিনি, কিন্তু কোনোদিন একথা জানান নি।

—সে কি! এতো দারুণ বে-আইনী ব্যাপার। কেস করলে ওর লম্বা জেল হবে।

—আমি সে সব কিছু চাই না। ও কথা থাক।

এরপর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর কী কথা বলবো ভেবে পেলুম না। খুবই অস্বস্তিকর অবস্থা। এখন ট্রাম এলে রেবা উঠে পড়লেই ভালো হয়। এখন রেবার মুখের দিকে তাকাতেই পারছি না আমি, পৃথিবীর সমস্ত গানের মাস্টারদের প্রতি রাগে আমার শরীর জ্বলতে লাগলো।

একটুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর রেবা আস্তে আস্তে বললো, নীলুদা, কোনো মানুষকে যদি কেউ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে, তবু সে সেই বিশ্বাসের মূল্য দেয় না কেন বলতে পারেন?

আমি ধীরস্বরে বললুম, রেবা আমি এ প্রশ্নের উত্তর জানি না। রেবা মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

এই প্রথম আমি রেবার ধাঁধার উত্তর দিতে পারলুম না, তবু রেবা নিজে খিলখিল করে হেসে উঠতে পারলো না।

২৭

❋❋❋❋❋

বাস শুদ্ধ সব লোক হেসে উঠলো হো-হো করে। উচ্চ হাস্য, হাসির ঢেউ, একজনের হাসি গড়িয়ে যাচ্ছে অন্যের মুখে।

অফিস যাবার সময় কেউ আবার হাসে নাকি কলকাতা শহরে? সকলেই মনে মনে কাঁদে অথবা প্রকাশ্যে ক্রুদ্ধ, কপালে ঘাম, চারদিকে মানুষের দেয়াল। অফিস যাবার সময় মাত্র দু'টি জিনিস মনে থাকে, যে-কোনো বাস বা ট্রামের একটা হ্যাণ্ডেল ছোঁয়ার সামান্য অধিকার আর অফিসের হাজিরা খাতায় লাল পেন্সিলের দাগ। বাড়িতে স্ত্রীর কপালের সিঁথির সিঁদুর মুছে যাক ক্ষতি নেই, তবু অফিসের খাতায় যেন লাল দাগ না পড়ে। আমি একবারে বাসের মাঝখানে, জমাট ভিড়ের ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে ছিলুম, হাসির কারণটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। এ ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে ঝগড়া করবে, অথবা উচ্চকণ্ঠে তেতো রাজনীতি অথবা লেডিজ সিটের সামনে বেশী ভিড় কেন—এই নিয়ে প্রকৃত আলোচনা—এই তো সকাল সাড়ে ন'টার ট্রাম-বাসে স্বাভাবিক নিয়ম, হঠাৎ নিয়ম ভেঙে এই প্রবল গ্রীষ্মে বসন্তের এক ঝলক হাওয়ার মতো কী করে এলো হাসির ঢেউ? বাস থেমে আছে। সম্ভবত ট্রাফিক পুলিশের কর-রেখা এখন বিচার করছে ড্রাইভার। আমি ছটফটিয়ে উঠে এদিক ওদিকে মাথা ঘুরিয়ে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করতে লাগলুম, কি হয়েছে? কী হয়েছে? সবাই হাসিতে ব্যস্ত, কেউ উত্তর দিচ্ছে না। আমি পাশের দৈত্যাকার লোকটিকে অনুনয় করলুম, আমায় একটু দেখতে দিন না। আমিও একটু হাসতে চাই। লোকটির ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আশপাশের সকলের মাথা ডিঙিয়ে প্রায় জানলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খ্যা-খ্যা-খ্যা করে হাসছে। আর বলছে, উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন, ওদের উঠতে দিন!—সঙ্গে সঙ্গে সকলের আবার হাসির হুল্লোড়।

আমি বেপরোয়া হয়ে, কী অসম্ভব উপায়ে কে জানে, ঠেলেঠুলে জানলার

কাছে চলে এলুম। এসে যা দেখলুম, তাতে চোখ জুড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের দু'পাশে এলো স্মিত হাস্য। একজোড়া টাটকা নবদম্পতি বাসে ওঠার চেষ্টা করছে।

দমদম থেকে বাস আসছে কলকাতায়। বিদেশ থেকে অনেক টুরিস্ট এসে গাইডদের সঙ্গে নিয়ে দমদমের বাসের ছবি তুলে নিয়ে যায়—কলকাতার বাসে কতটা ভিড় হয় তার প্রমাণ হিসেবে। সেই বাসে, অফিসের সময় উঠতে এসেছে নবদম্পতি। হাসবে না লোকে?

বরের চেহারা রোগা, কালো, বছর তিরিশেক বয়েস, মুখময় পাউডার, গায়ে ঝলমলে সিল্কের পাঞ্জাবী, হাতে টোপর। সে অনুনয় করে বলছে, একটু উঠতে দিন না! বিশেষ দরকার!

আর সেই কথা শুনে পা-দানির ওপর থিকথিক করা লোকগুলো, যারা জানলা ধরে ঝুলছে, যারা মাডগার্ডে বসে আছে, যারা কিছুই না ধরে চুম্বকের মতো স্রেফ বাসের গায়ে লেগে আছে, তারা সবাই অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে বলছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উঠে পড়ুন, উঠে পড়ুন! উঠতে দিন না! কনডাকটার হাসছে, গাড়ি থামিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ড্রাইভারও হাসছে।

বরের পাশে নতমুখী বধূ। তখনও লাল চেলী পরনে, গলায় বাসি ফুলের মালা, নিশ্চয়ই চোখে জল। আমি মেয়েটির মুখ দেখতে পাইনি, চোখ দেখতে পাইনি, কিন্তু নিশ্চয়ই সেই ছোট্টখাট্টো মেয়েটি সুন্দরী, অন্তত বিয়ের দু'তিন দিন কোন্ মেয়ে সুন্দরী নয়? ওদের সঙ্গে আরও দু'তিনজন লোক দাঁড়িয়ে, একজনের হাতে ফুল আঁকা টিনের সুটকেস।

বরকে দেখে মনে হয় কোনো কারখানার ভদ্র মজুর। কী এমন ওদের জরুরী দরকার কে জানে, যে বাসি বিয়ের দিনে এমন সময়েই ফিরতে হবে। ছেলেটিকে কি বিকেলের সিফ্‌ট্-এ যেতে হবে কারখানায়? কিংবা অন্য কিছু ব্যস্ততা। কিন্তু বিয়ের পরদিন বর-বউয়ের প্রথম একসঙ্গে যাত্রা, তাও এই ভিড়ের বাসে? ওরা পাগল নাকি! অবশ্য, যদি যেতেই হয়, কী করেই বা ওরা যাবে! বর-বউ হেঁটে যাচ্ছে, এ দৃশ্য আরও হাস্যকর। হয়তো ট্যাক্সী করা ওদের পক্ষে কল্পনাতীত বিলাসিতা, কিন্তু জীবনে এই একবারও কি বিলাসিতা চলে না! অবশ্য, তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়লো, এই সময় কোনো ট্যাক্সী পাওয়ার চেয়ে একটা মোটর গাড়ি কেনা অনেক সহজ।

হাসছিলুম আমিও, কিন্তু ভিতরে একটা গভীর দুঃখবোধও জেগে উঠেছিল। এই পৃথিবীতে বেঁচে থেকে, সকাল সাড়ে ন'টায় বাসে একটি সদ্যবিবাহিত

দম্পতিকে ঠেলেঠুলে ওঠার চেষ্টা করতে দেখবো—কোনোদিন ভাবিনি। আমি জানতুম, যত অকিঞ্চিৎকরই হোক, যে কোনো বঙ্গ যুবকই বিয়ের দু'তিনটি দিনের রাজা। অথচ এই বর্বর বরটা আজও বাসযাত্রীদের মধ্যে উঠে দুশো জনের একজন হতে চাইছে! রাস্তা দিয়ে কত মোটর গাড়িও তো যাচ্ছে, কেউ তো হুস্ করে হঠাৎ থামিয়ে ওদের বলতে পারতো, চলো, আমি তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসছি। থাক্, ওরা ঘোর দুপুর পর্যন্ত ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক্, ততক্ষণ রাস্তার মজাখোর জনতা ওদের দেখে হাসুক!

বাস একটু বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণ ধরে রস উপভোগ করার ধৈর্য সবারই নেই। দুম্দুম্ করে টিনের গায় আওয়াজ হলো, একদল চেঁচিয়ে উঠলো, চলুন, আর নয়! অফিসে লেট হয়ে যাবে দাদা এই বর-বউ দেখতে দেখতে। রোগা চেহারার বরটি তখনও ওঠার নিষ্ফল চেষ্টা করে যাচ্ছে।

বাস স্টার্ট নেবার শব্দ, বিশ্রী কডকডে আওয়াজ। খুব আস্তে চলতে শুরু করলো, আরও বিশ্রী ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, স্পীড নিল না। আবার ঘটাং ঘট্ আওয়াজ, আস্তে আস্তে চলতে চলতে দু' পা গিয়েই বাস থেমে গেল। সবাই চেঁচিয়ে উঠলো, কী হলো! কী হলো!

বাস থেমেই রইলো, বেশ কিছুক্ষণ, আরও বিদঘুটে ঘট্‌ঘটাং আওয়াজ; তারপর ড্রাইভারের উদাত্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ব্রেক ডাউন, নেবে পড়ুন, বাস আর যাবে না!

একটু আগে ছিল হাসির ঢেউ, কিন্তু এখন ক্রুদ্ধ কলরোল। অবশ্য একথা সবাই জানে, একবার 'ব্রেক ডাউন' বললে, সে বাসে থেকে আর কোনো লাভ নেই। প্রবল চিৎকার করতে করতে সবাই নেমে যেতে লাগলো, কে যেন বলে উঠলো, কী অপয়া বর-বউ দেখলুম রে বাবা! দেখা মাত্র গাড়ি খারাপ!

এখন এসব লোক কী করে পরের বাসে উঠে যাবে, তা কল্পনা করা ঈশ্বরের পক্ষেও শক্ত। আমার অফিস টফিসের ব্যাপার নেই, অন্য একটা কাজে যাচ্ছিলুম, এখন বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলুম, যাক, আজকের মতো ছুটি! অফিস যাবার সময়ে মাঝপথে বাসে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব।

বর-বউ তখনও দাঁড়িয়ে, বহুলোক তাদের ঘিরে আছে, দুটি সং দেখছে যেন তারা সত্যিই, অফিস যাবার ঘণ্টায় প্রকাশ্য রাস্তায়, বর-বউ দেখা হাস্যকর ছাড়া আর কি! বউটির নিচু করা মুখ বুকের সঙ্গে মেশানো, নিশ্চয়ই চোখে জল!

আমার ইচ্ছে হলো, অযাচিতভাবেই বরকে গিয়ে ধমকে বলি, কী তোমার এমন জরুরী কাজ! যাও ফিরে যাও! অন্তত আর একটা বেলা শ্বশুরবাড়িতে

গিয়ে জামাই আদর খাওগে। তা, নয়, নতুন বউকে এই রোদ্দুরের মধ্যে দাঁড় করিয়ে···হাতে আবার টোপরটিও ধরে রাখা হয়েছে!

আমাদের ভূতপূর্ব বাসের ড্রাইভারটি বুড়ো মতন, এদিকে এলো, মুখে চাপা হাসি। ড্রাইভার এসে বললো ওদের, আপনারা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকবেন কতক্ষণ! এখন কোনো গাড়িতে উঠতে পারবেন না। তার চেয়ে, যান আমার এই খারাপ গাড়িতে উঠে বসে থাকুন!

মনে মনে আমি ড্রাইভারটিকে ধন্যবাদ জানালুম। বর টিনের স্যুটকেস নিয়ে ফাঁকা বাসের মধ্যে উঠে বসল লাজুক মুখে। সেই রকম নিচু মুখেই উঠে গেল ছোট্ট বউ আর তার সঙ্গের দু'তিনজন। লোকের চোখের আড়ালে গিয়ে যে ওরা বসতে পারলো এতে খুশী হলুম আমি। যেন সমস্যাটা ছিল আমারই।

হঠাৎ দেখি বাসটা ছেড়ে দিয়েছে। দারুণ চমকে তাকালো ভিড়ের লোকেরা। চলতে আরম্ভ করেই বাসটা দারুণ স্পীড নিয়েছে। দু' দরজার দুই কণ্ডাকটার মুখ বাড়িয়ে, আর জানলা দিয়ে ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে চওড়া মুখে হাসছে। কয়েক সেকেণ্ডের চমক, তারপরই ভিড়ের মধ্যে অট্টহাসি উঠলো। সে হাসি আর থামতেই চায় না। এই লোকগুলি বোধহয় আজ আর অফিসেই যেতে পারবে না, তবু হাসছে হো-হো করে!

২৮

*****

আমাদের বাড়ির সামনে একটা আতা গাছ ছিল। একটা জমিদারবাড়ি এখন ফ্ল্যাটবাড়ি করা হয়েছে, কিন্তু বাগানে দু'একটা শৌখিনতার চিহ্ন এখনো থেকে গেছে। আমাদের বাড়ি ছাড়া, কলকাতা শহরে আমি আর দ্বিতীয় আতা গাছ দেখিনি।

গাছটা আমাদের ফ্ল্যাটের খুবই কাছে, দোতলা সমান লম্বা, আমাদের দোতলা ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে ওর পাতাগুলো পর্যন্ত ছোঁয়া যায়। ফিঙে, শালিক আর ইষ্টকুটুম পাখি এসে বসে, মেটে সিঁদুর আর কালোয় মেশানো বড় সাইজের ইষ্টকুটুম পাখিগুলো অন্য পাখিদের তাড়িয়ে দিয়ে আতায় ঠোক্কর দেয়। বিশেষ কিছু পায় না অবশ্য, এ গাছের আতাগুলো কেমন শুকনো শুকনো, ছোট. ভেতরে সারপদার্থ কম। বাংলাদেশের জমিতে ভালো আতা গাছ হবার কথা নয়, তাই এ গাছটার রূপিণী অন্য রকম, দেওঘর-মধুপুরে যেমন বহু ডালপালা ছড়ানো জননী-চেহারার আতা গাছ দেখেছি, এটা মোটেই সে-রকম নয়। কেমন যেন লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা, সুদৃঢ় সরু হয়ে উঠে এসে, মাথার দুদিকে দুটি মাত্র ডাল বেরিয়েছে। যাই হোক, তবু তো আতা গাছ! বাড়িতে কেউ এলে আমি ডেকে ডেকে দেখাই। যেন ঐ গাছটা আমারই কীর্তি।

আমাদের ঠিক নিচের ফ্ল্যাটেই একটি হিন্দুস্থানী পরিবার থাকেন, ভদ্রমহিলাটি কাশীর মেয়ে, বেশ চমৎকার ভাঙা বাংলা শিখেছেন। কেন জানি না, তিনি ঐ আতা গাছটি দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। বলেন, হাগ্, এ আবার আতা গাছ আছে নাকি? জাত নষ্ট! ধ্যুৎ ধ্যুৎ!

বাড়ির কেয়ার-টেকারকে ডেকে তিনি প্রায়ই বলেন, গাছটা কেটে ফেলতে। ঘরের সামনে একটা গাছ, দেখতে ভালো না আছে, এটাকে কেটে দেও না।

মালিকের ভয়ে কেয়ার-টেকার কাটতে রাজী হয় না। আমরা বলি, ভাবীজী,

গাছটা কাটবে কেন, থাক না। এত চেনা গাছের মধ্যে একটা আতা গাছ দেখতে বেশ ভালোই লাগে।

ভাবীজী বলেন, আতা কখনো দেখেন নি নাকি ? এটা গাছ না মর্দা ? ধ্যুৎধ্যুৎ !

বাড়িতে কোনো বন্ধু-বান্ধব এলে প্রশ্ন করে, এটা কি গাছ রে ?

আমি অন্যমনস্ক হবার ভান করে আলতো ভাবে বলি, আতা গাছ ! তারা বলে, বাঃ, আতা গাছ এ রকম হয় নাকি ? এরকম লম্বা ?

আমি প্রমাণ হিসাবে দু'একটা শুকনো আতা গাছের ডালে ঝুলছে দেখাই। কোনোটা আধখাওয়া, কোনোটা শুকনো কাঠরঙা। সারা বছরই দু' একটা থাকে। ফ্ল্যাট বাড়ির গাছ—যে ইচ্ছে নিতে পারে, আমরা হাত বাড়িয়ে বা লাঠি দিয়ে অনায়াসেই আতাগুলো পেড়ে নিতে পারি, কিন্তু নিই-না, গাছটার জাতের প্রমাণ হিসেবে ফলগুলো গাছেই রেখে দিই। ওপাশের দিশি আমড়া গাছটার পাতা হয়, আবার পাতা ঝরে যায়, কিন্তু আতা গাছটা একটা রুক্ষ, তেরিয়া ভাব নিয়ে সারা বছর এক রকম। পাখিরা, কেন জানি না, আমড়া গাছটার চেয়ে আতা গাছটাকেই বেশী পছন্দ করে, একটা কাঠঠোকরা পাখি ঠুকরে ঠুকরে ওটায় গর্ত করতে চায়।

ভাবীজী কাপড় টাঙাবার জন্য একটা লোহার তার টান করে বেঁধেছেন আতা গাছটা আর নিজের ঘরের জানলার সঙ্গে। তারটা এমন টান যে, আতা গাছটা সামান্য হেলে গেছে, আমি বলেছিলাম, ভাবীজী, গাছটাকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি ?

ভাবীজী বললেন, ধ্যুৎ ধ্যুৎ, এ গাছ না মুর্দা ? জাত নষ্ট। আতা গাছ কি দেখেন নি আপনি ? আমাদের কাশীতে আতা গাছ আছে, ইয়া ইয়া আতা হচ্ছে। আর এটাতে কি হয়, আতা না মোমকালি ?

আমি বলেছিলাম, গাছটা দেখতে তো ভালো। বেশ অন্যরকম—

একবার দেশে বেড়াতে গিয়ে ফিরে এসে ভাবীজী আমাদের জন্য অনেকগুলো আতা নিয়ে এলেন। বললেন, দেখুন আতা কাকে বলছে। হাঁ—এ হচ্ছে আসল আতা—

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আমি কি আতা দেখিনি নাকি ? আতা এমন কিছু ভালো লাগে না খেতে।

—খেয়েই দেখুন, এ হচ্ছে আসলি জিনিস। মিষ্টি কি, গুড় !

আমার ভাই বোনেরা বললো, সত্যি কি বিরাট বিরাট আতাগুলো, টুসটুসে হয়ে পেকে ফেটে গেছে।

ভাবীজী ছেলেমানুষী মুখে গর্ব ফুটিয়ে বললেন, যে-রকম গাছ সে-রকম তো ফল হোবে। আতা গাছ এই রকম চওড়া, অনেক ডাল হবে, এমন ফল হোবে কি মাটি থেকেই হাত দিয়ে পেড়ে নিতে পারবেন। আর এখানে এটা কি আছে? গাছ নাকি? হাথ্—

আমি বললুম, শুধু ফল দেখেই গাছের বিচার করতে হবে? মনে করুন না, এটা শুধু গাছ, এমনই ভালো—

—তাহলে আতা গাছ কেন? এমনি গাছ বললেই হয়? আপনার বন্ধু টন্ধু এলেই বলবেন কি, আতা গাছ, আতা গাছ—তারা ভাববে কি—আতা গাছ এই রকমই আছে, আতা গাছ এ রকমই দেখতে হয়! কেন, আমড়া গাছভি তো গাছ আছে, ওটা কেন দেখান না?

—আমড়া গাছ তো সবাই চেনে। ওটা আর দেখবার কি আছে? আতা গাছ তো কলকাতায় চট্ করে দেখতে পাওয়া যায় না—

সেবার আতা গাছটার ওপর ভাবীজীর রাগ যেন আরও বেড়ে গেল। সন্ধের দিকে তারটা ধরে এমনভাবে হ্যাঁচকা টান মারেন যে গাছটা দুলে দুলে ওঠে। কিন্তু বেশ শক্ত গাছ, কলকাতার মাটি তার অপরিচিত হলেও দৃঢ়ভাবে ধরে আছে। সত্যিকারের ফল ফলাতে চায় না, কিন্তু প্রবলভাবে বেঁচে থাকতে চায়।

ভাবীজীর কিন্তু গাছপালার খুব শখ, নিজের ঘরের চারপাশে নানান ফুল গাছ লাগিয়েছেন, ওর হাতের গুণে অল্প দিনই থরে থরে ফুল ফুটে উঠলো। একটা পেঁপে গাছও দু'এক বছরের মধ্যে দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠে দিব্যি বড় বড় পেঁপে ফলতে লাগলো। ভাবীজী আমার মাকে নিজের গাছের পেঁপে উপহার পাঠিয়ে দিলেন। কি খুশিতে ঝলমল তাঁর মুখ। শুধু আতা গাছটার ওপরেই যত রাগ। গাছটাকে ধরে ঝাঁকাতে দেখে আমি এক একদিন হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছি, ও ভাবীজী, গাছটাকে ও রকম করছেন কেন?

ভাবীজীও হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, ওটা মরে গেলে, এটাকে কেটে বাগানের বেড়া বানাবো।

তারপর একদিন রাত্তিরবেলা প্রচণ্ড ঝড় উঠলো। সে কি ঝড়, বিশ্ব সে-দিনই ধ্বংস হয়ে যাবে—এইরকমই কাণ্ড, ভয়ংকর শোঁ-শোঁ আওয়াজ, ইলেকট্রিকের পোস্ট উল্টে গিয়ে সমস্ত তল্লাটটা অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায়, পৃথিবী সত্যিই ভয় পেয়েছে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন, খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করে প্রায় সারা রাতই ঝড়ের গর্জন শুনলাম। ঝড়ের মাঝপথে

বৃষ্টি নামলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আচ্ছন্ন তন্দ্রায় সেদিন মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে বেঁচে থাকা সত্যিই একটা বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার। কি রকম মাথার ওপর একটা কংক্রিটের ছাদ ও নিশ্চিন্ত বিছানা পেয়ে গেছি ভাগ্যবলে। গাছের পাখিদের আজ কি অবস্থা! কাল সকালে কি আর একটাও পাখি বেঁচে থাকবে?

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে উঠেই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের বাড়ির সামনের বাগানটির অবস্থা একটা যুদ্ধক্ষেত্রের মতন। সারা বাগান লণ্ডভণ্ড, গেটের কাছটায় আমগাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ছে ইলেকট্রিকের তারে, একটা লাইট পোস্ট কাৎ হয়ে আছে, রিফিউজি কলোনির খড়ের চালগুলো থেকে গাদাগাদা খড় উড়ে এসে ছড়িয়ে আছে যেখানে সেখানে।

আতা গাছটা কাৎ হয়ে আছে। বৃক্ষেরা নাকি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ, যেদিকে বাড়ি থাকে সেদিকে সাধারণত গাছ হেলে পড়ে না। আতা গাছটা আমাদের বারান্দার উল্টো দিকে অনেকখানি হেলে পড়েছে, অনেকগুলো শিকড ছিঁড়ে উপড়ে এসেছে। কিন্তু সম্পূর্ণ পড়ে যায় নি, কিছু শিকড় এখনো মাটি আঁকড়ে আছে—যেন গাছটা এখনো বাঁচতে চায়, বাঁচার তীব্র ইচ্ছায় সম্পূর্ণভাবে ভূমিশয্যা নেয় নি। কেউ যদি গাছটাকে ঠেলে আবার সোজা করে দেয় ও হয়তো আবার বেঁচে উঠবে।

ভাবীজী শিশুর মতন আনন্দে বাগানময় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ওঁর বাগানের ছোট ছোট ফুল গাছ বা পেঁপে গাছটার কোনো ক্ষতি হয় নি। কাপড় টাঙানো তারটা ধরে ভাবীজী বারবার হ্যাঁচকা টান মারতে লাগলেন। আতা গাছটা নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগলো, তবু প্রবল প্রতিরোধের চেষ্টা। আমার কেমন মনে হলো, গাছটা শারীরিক কষ্ট পাচ্ছে, যন্ত্রণায় শিউরে শিউরে উঠছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারলো না, কাশীর মেয়ের গায়ে বেশ শক্তি, একবার তারটা ধরে খুব জোরে টান দিতেই আতা গাছটার শেষ শিকড়গুলো পটপট করে ছিঁড়ে ঝপাস করে মাটিতে গিয়ে পড়লো। ভাবীজী আনন্দে হাততালি দিলেন।

ভূপাতিত বৃক্ষ কি আমি আগে দেখিনি? কিন্তু সেদিনকার সেই দেখার তুলনা হয় না। আগে, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে মাটিতে পড়ে থাকা গাছ দেখেছি। কিন্তু উঁচু থেকে, ওপরে দাঁড়িয়ে মাটিতে শুয়ে পড়া একটা গাছকে দেখার অনুভব অন্যরকম। গাছটার সমস্ত পাতা সবুজ, জীবন্ত শরীর, দেখলে মনে হয়, এইমাত্র মৃত্যু হলো। বিশাল লম্বা শরীর, মাথার কাছে দুটি মাত্র ডাল, হাতের মতন ছড়িয়ে অবিকল মানুষের মতন গাছটা যেন এইমাত্র অসহায়ভাবে মরে পড়ে গেল। বুঝি একটা শালিকের বাসা ছিল, দুটো শালিক পিড়িং পিড়িং শব্দ করে গোল

হয়ে ঘুরছে মাথার কাছে, অবিলম্বে দুটো শান্ত চেহারার গরু গাছটার একেবারে ডগার দিকের কচি পাতাগুলো—গরুগুলো যা কোনোদিন ছুঁতে পাবার আশাই করে নি, এখন নির্বিকারভাবে ছিঁড়ে খেতে শুরু করেছে। দৃশ্যটা এমনই ট্র্যাজিক যে হঠাৎই আমার চোখ দুটো জ্বালা করে উঠলো, বুঝি জল এসে যাবে।

গাছটাকে দেখে তখন আমার মানুষের মতনই মনে হয়েছিল। কোনো নিষ্ফল মানুষেরই মতন অসহায়ভাবে শুয়ে আছে। যেন কোনো মহাকাব্যের ট্র্যাজিক চরিত্র—মহাভারতের কর্ণ। পরের ঘরে মানুষ হয়ে যে সারাজীবন শুধু দুঃখই পেয়ে গেল।

২৯

✻✻✻✻✻

যেসব মানুষ একা ভয়ংকর পর্বত শিখরে ওঠেন, যাঁরা দুঃসাহসে সমুদ্র সাঁতরে পার হন, তাঁদের কারুর সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয় নি। অথচ খুব ইচ্ছে হয়। দেখা হলে একটা সামান্য প্রশ্ন করতুম। জিজ্ঞেস করতুম, এই যে দুঃসাহসের কৃতিত্ব স্থাপনের প্রয়াস, এর মধ্যে একটা উপকারী অহংকার আছে ঠিকই, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু আমার অন্য একটি কৌতূহলের উত্তর দিন দয়া করে। সেই বিপদ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে কোনো এক সময় কি আপনার জীবনের সব কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে? আপনি জীবনে যা-যা ভুল করেছেন, তার জন্য ক্ষমা চাইতে ইচ্ছে করে? আজ পৃথিবীতে মানুষ কোথাও আর স্বেচ্ছায় ক্ষমাপ্রার্থী নয়। কিন্তু যখন সে অত্যন্ত নির্জন, তুষার ঝড়ের মধ্যে পাহাড় শিখরে কিংবা হিংস্র জলজ জন্তু ও তরঙ্গ-সঙ্কুল মধ্য-সমুদ্রে, যখন প্রতি মুহূর্তের মৃত্যু ভয় তার নির্জনতাকে চরম করে, তখন একবারের জন্যও কি, জীবনের কোনো অপরাধ বা ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে হয়?

অন্যসময় আজকাল আর কেউ ক্ষমা চায় না। পৃথিবীতে মানুষের যত ঝগড়া, পরস্পরের মনে দুঃখ দেওয়া—তার অধিকাংশই তো ভুল কারণে, ভুল বুঝে—একবার অকপট ক্ষমা প্রার্থনায় হয়তো সব মিটে যেতো। খুব সামান্য দু'একটা ঘটনা উল্লেখ করি।

আমার পাশের বাড়িতে একদিন সকালবেলা তুমুল কোলাহল শুনতে পেলাম। যেন সে সম্পর্কে আমার কোনো উৎসাহই নেই—এমন ভঙ্গি করে দাঁড়িয়েছিলাম বারান্দায়, অথচ সেদিকেই কান ফেরানো আমার, চোখ বারবার সেদিক থেকে ঘুরে আসছে।

গণ্ডগোলটা পরেশকে নিয়ে। পরেশকে বেশ কিছুদিন ধরেই সন্দেহ করা হচ্ছিল, আজ সকালে সাড়ে তিনশো টাকা পাওয়া যাচ্ছে না—নিশ্চয়ই পরেশের

কাজ। সত্যসিন্ধুবাবু হুঙ্কার দিয়ে বললেন, নিমোখারাম কোথাকার! জানি তো, মানুষের উবগার করলে আজকাল কোনো লাভ নেই, সবাই নিমোখারাম! দে টাকাটা বার করে দে, তারপর দূর হয়ে যা! নইলে তোকে আমি পুলিশে দেবো!

পরেশের বয়েস উনিশ-কুড়ি, রোগা, লাজুক, কমার্স নিয়ে বি এ পড়ে, আমার সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে। পরেশ সত্যসিন্ধুবাবুর বাড়িতে আশ্রিত, গ্রাম সম্পর্কে না কি রকম যেন খুব দূরত্বের আত্মীয়তা আছে, অনাথ ও নিঃসম্বল বলে সে ওবাড়িতে থেকে দেখাশুনো করে। অর্থাৎ কিছুটা চাকরের কাজ, কিছুটা ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনা—অনেক সচ্ছল বাড়িতেই এরকম দু'একটা ছেলে থাকে, যে বাড়ির ইলেকট্রিক খারাপ হলে সারাবার ব্যবস্থা করে, দুধের কার্ড করতে লাইনে দাঁড়ায়, গৃহিণীর জন্য ম্যাটিনির টিকিট কাটে, বাগবাজারের ঘাটে ইলিশ উঠেছে শুনে যাকে পাঠানো যায়, বাড়িসুদ্ধ সবাই বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলে যে বাড়ি পাহারা দেয়—পরেশও ঠিক সেইরকম, ঠিক চাকর নয়—কারণ মাইনে পায় না, খাওয়া ও পরার বিনিময়ে 'বাড়ির ছেলের মতো' থেকে কাজকর্ম করে।

পরেশকে আমি মোটামুটি ভালো ছেলে বলেই জানতুম, কিন্তু আজ ওবাড়ির কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, পরেশই চুরি করেছে। সত্যসিন্ধুবাবুর অফিসে যাবার কোটের পকেটে টাকা ছিল, পরেশ তাঁর শোবার ঘরে আজ সকালে দুবার ঢুকেছিল কেন? পরেশের উত্তর বড় নড়বড়ে, একবার খবরের কাগজ নিতে, আর একবার—ক'টা বেজেছে দেখার জন্য। কেন, একতলার বসবার ঘরেও তো ঘড়ি ছিল? ও ঘড়িটা খুব স্লো!

কাল অফিস থেকে ফিরতে রাত হয়েছিল, টাকাটা কোটের পকেটেই রেখে-ছিলেন, এই সকালের মধ্যে আর কে নেবে? রান্না করার ঠাকুর দোতলায় ওঠে না, ঠিকে ঝি আজ আসেই নি, নিজের ছেলেমেয়েরা তো নেবে না, আর নেবে কে, পরেশ ছাড়া?

মেজ মেয়ে ঊর্মিলা বললো, হ্যাঁ আমিও দেখলুম ও তোমার ঘর থেকে বেরুচ্ছে সাড়ে আটটার সময়, আমাকে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে চমকে উঠেছিল।

পরেশ শান্তভাবে বললো, আপনাকে আমি সব সময়ই ভয় করি!

সত্যসিন্ধুবাবু বললেন, টাকাটা বার কর! আজকাল রক্তের সম্পর্কের লোকদেরও বিশ্বাস নেই—তার এইসব বাজে…তখনই তোমাকে বলেছিলাম… দুধ কলা দিয়ে…ওঁর স্ত্রী বললেন, আগে তো কোনোদিন খারাপ কিছু দেখিনি… নিজের ছেলের মতো আদর যত্নে রেখেও যদি…। পরেশ বারবার দৃঢ়স্বরে

বলছে, সে টাকা নেয় নি। সত্যসিন্ধুবাবু হঠাৎ রাগের মাথায় পরেশের বাবা-মাকে জড়িয়ে একটা গালাগালি দিয়ে ফেললেন। পরেশ বললো, ওসব নোংরা কথা বলবেন না। আমরা গরীব ঠিকই কিন্তু···।

এরকম ঝগড়া কিছুক্ষণ গড়ালো। সত্যসিন্ধুবাবুর অফিসের বেলা হয়ে যায়। তিনি পরেশের গালে জোরে একটি চড় কষালেন, গৃহিণীর অনুরোধে তাকে আর পুলিশে দিলেন না—তদ্দণ্ডেই তাকে দূর হয়ে যেতে বললেন বাড়ি থেকে। একটা টিনের স্যুটকেশ আর রংজ্বলা সতরঞ্চির বিছানা নিয়ে পরেশ চলে গেল—যাবার সময় শুধু তিক্তস্বরে, একটু চেঁচিয়ে বলে গেল—পুলিশে দেবার উপায়ও ছিল না আপনার। যে টাকাটা আপনার হারিয়েছে, সে টাকাটা আপনি কোথা থেকে পেয়েছেন তাও তো পুলিশকে বলতে হতো! ঘুষের টাকা!

দুদিন পর, সত্যসিন্ধুবাবুর ছোটছেলে আমাদের বাড়িতে লুডো খেলতে এসে ফিসফিস করে বললো, জানেন পরেশদা চোর নয়! বাবা টাকাটা খুঁজে পেয়েছেন! —শুনে আমি শিউরে উঠলুম। টাকা যদি না নিয়ে থাকে তবে টিনের স্যুটকেশ আর বিছানা নিয়ে পরেশ কোথায় গেল? এই শহরে নিঃসম্বল অবস্থায় সে কি করবে? তার ওপর আবার ভুল আপনাদের গ্লানি। ছেলেটা আত্মহত্যা করবে না তো!

কিন্তু পরেশের সঙ্গে আমার শিয়ালদা স্টেশনেই দেখা হয়ে গেল। সে স্টেশনে রাত্রে শোয়, দিনের বেলা পোস্ট অফিসের সামনে বসে মনিঅর্ডার ফর্ম লিখে বারো আনা একটাকা উপার্জন করে। এখন আর কলেজে যাচ্ছে না, চোখে মুখে তার একটা ভয়ংকর প্রতিজ্ঞার ছাপ পড়েছে।

একদিন সুযোগ পেয়ে সত্যসিন্ধুবাবুকে আমি একথাটা জানিয়ে দিলুম যে, পরেশ এখন শিয়ালদা স্টেশনে রাত্রে শোয়। সত্যসিন্ধুবাবু হঠাৎ বিব্রত মুখে বললেন, যাও, ওর ঐরকম শাস্তি হওয়াই উচিত। টাকাটা তুই নিসনি, তা বললেই পারতিস! তা নয়, মুখে মুখে কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা! আমি ওর বাপের বয়েসী, এতদিন মানুষ করলুম, একটু শ্রদ্ধাভক্তি নেই! গেছে আপদ গেছে!

সত্যসিন্ধুবাবু এ-পাড়াতে বেশ একজন শ্রদ্ধেয় লোক। খুব বড় চাকরি করেন, সুদর্শন প্রৌঢ়, পাড়ার ক্লাবের তিনি সভাপতি, একটি স্কুলের সহসভাপতি, দুর্গাপুজোয় প্রচুর চাঁদা দেন। পরেশকে তিনি অন্যায় সন্দেহ করেছিলেন, এজন্য পরেশের কাছে যদি তিনি ক্ষমা চাইতেন—তাঁর গৌরবের একটুও হানি হত না—কিন্তু পরেশের জীবনটা হয়তো বদলে যেত। তার বদলে পরেশ কোন্ ছন্নছাড়া

জীবনে চলে গেল! একদিন হয়তো পরেশ এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে আসবে। কিংবা, সে না পারলেও, পরেশের ছেলে হয়তো একদিন এসে প্রতিশোধ নেবে সত্যসিন্ধুবাবুর ছেলের ওপর। এইরকমই চলবে। তার বদলে, আমি কল্পনা করলুম, রাত্রি সাড়ে দশটায় সত্যসিন্ধুবাবু নিজের গাড়ি নিয়ে গেছেন শিয়ালদা স্টেশনে, ছেঁড়া সতরঞ্চি পেতে পরেশ শুয়ে আছে বিমর্ষ মুখে, হয়তো বিকেল থেকে কিছু খায় নি, চোখ দুটো খরখর করছে তার, এমন সময় তিনি যদি ওর মাথার পাশে গিয়ে—বলতেন, বাবা পরেশ, তোকে আমি ভুল ভেবেছিলাম, আমায় ক্ষমা কর! পরেশ নিশ্চয়ই তখন চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখে, একটুপরে অভিমানে কেঁদে ফেলতো। সেই মধুর দৃশ্যটি সম্ভব হতো, একটি মাত্র ক্ষমা প্রার্থনায়। কিন্তু, তা সম্ভব হবে না। কারণ, আজকাল কেউ ক্ষমা চাইতে জানে না।

আমিও পারি নি। জীবনে কত ভুল করেছি, কত মানুষের ওপর অন্যায় ব্যবহার করেছি, পরে মুখফুটে ক্ষমা চাইতে পারি নি। আমি ভেবেছি, ক্ষমা চাইলে যদি অনাধুনিক হয়ে যাই, যদি মনে হয় সেটা ন্যাকামি! কোথাও কেউ ক্ষমা চায় না—বাধ্য হয়ে বিপদে পড়ে বা ভয়ে ভয়ে ক্ষমা চাওয়া নয়, এমনিই স্বাভাবিক ভাবে হঠাৎ একদিন নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিঃশর্তভাবে আর কেউ ক্ষমা চায় না। পৃথিবীর বহু বড় বড় ভুলের কথা জানি, কিন্তু আমার একটি সামান্য ভুলের কথা বারবার মনে পড়ে, আমি তার জন্যও ক্ষমা চাইতে পারি নি।

আমি এক মনোরম বিকেলবেলা এক বান্ধবীর সঙ্গে চৌরঙ্গি দিয়ে যাচ্ছিলুম। এমন সময় দূর থেকে একটি পরিচিত লোককে আসতে দেখতে পাই। একধরনের পরিচিত লোক থাকে—যাদের সঙ্গে বারবার শুধু পথেই দেখা হয়। আমি তার বাড়ি চিনি না, সে আমার বাড়ি চেনে না, অথচ পথে পথে দেখা হয়—সারাজীবনই এইরকম পরিচয় থেকে যায়। এই লোকটিও সেইরকম।

লোকটি অতিশয় ভালোমানুষ, দেখা হলেই কোনো রেস্টুরেণ্টে বসতে চান, নিজে পয়সা খরচ করেন, পরিবর্তে কোনো উপকার চান না, কিন্তু অনেকক্ষণ কথা বলতে চান।

লোকটির সঙ্গে প্রায় মাস তিনেক পরে দেখা, কিন্তু সেই মুহূর্তে লোকটির সঙ্গে কথা বলার আমার কোনো ইচ্ছে ছিল না। বান্ধবীর সঙ্গে সময় কাটাবার অতি লুব্ধতায় আমি লোকটিকে না-দেখার ভান করেছিলুম। তবু লোকটি পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, এই যে কী খবর? আমি সাদামুখ করে বললুম, ভালো।

লোকটি তখনও উজ্জ্বল হাস্যে বললেন, তারপর সেদিন যে কথা ছিল—।
আমি তখনও নির্বিকারভাবে বললুম, কি কথা বলুন তো!

লোকটি একটু থতমত খেয়ে বললেন, কী চিনতে পারছেন না নাকি? আমি বললুম, হ্যাঁ, মানে, ঠিক কোথায় আলাপ মনে পড়ছে না, তবে···

লোকটি বিবর্ণমুখে বললেন, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না? আমি বললুম, হ্যাঁ, মুখ চেনা চেনা লাগছে তবে···। লোকটি আবার বললেন, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না?—আমি তখনও মরীয়া হয়ে প্রচণ্ড ক্যাডের মতো বললুম, হ্যাঁ, তা, আপনার নামটা···।

লোকটির মুখ পাংশু হয়ে কুঁকড়ে গেল, মৃদুস্বরে বললেন, আচ্ছা থাক! তারপর হনহন করে চলে গেলেন।

আমার পাশে দাঁড়ানো বান্ধবী বললেন, ঐ লোকটির নাম তো অনিমেষ ভট্টাচার্য! তুমি চিনতে পারলে না?—আমি বললুম, তুমি কি করে নাম জানলে, তোমার চেনা? বান্ধবী হেসে বললেন, বাঃ, একদিন সেই যে আমরা চায়ের দোকানে বসেছিলাম, এই ভদ্রলোক এসে বসলেন, তুমি আলাপ করিয়ে দিলে, উনি খুব মজার মজার গল্প বলছিলেন, আমার মনে আছে, আর তোমার মনে নেই!

—আমার সবই মনে ছিল, তবু কেন যে ওরকম ব্যবহার করলুম ওর সঙ্গে আজও জানি না। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার চোখে ভেসে উঠলো সেই বিবর্ণ, অসহায় অপমানিত মুখ। এবং তাঁর চকিত পলায়ন। নিজের প্রতি ঘৃণায় আমি ছি-ছি করতে লাগলুম। ইচ্ছে হলো, ছুটে গিয়ে লোকটির কাছে ক্ষমা চাই। কিন্তু অনিমেষ ভট্টাচার্য তখন ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছেন। যে বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলার লোভে আমি লোকটিকে তাড়াতে চেয়েছিলুম, লোকটিকে তাড়িয়ে দেবার পর—সেই বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলতেও আর আমার ভালো লাগলো না।

অনিমেষ ভট্টাচার্যের কাছে আমার আর কোনোদিনই ক্ষমা চাওয়া হয় নি। কারণ, তাঁকে কোথায় খুঁজে পাবো জানতুম না। কীরকমভাবে ক্ষমা চাইবো, মনস্থির করতেও বেশ কয়েকদিন কেটে গিয়েছিল। তা ছাড়া, হঠাৎ পথের মধ্যে দেখে ওঁকে ডেকে যদি বলতুম, শুনুন, সেদিন আপনাকে যে আমি চিনতে পারি নি—সেটা আমার ভুল হয়েছিল—তা হলে রাস্তার লোকেরাও আমার কথা শুনে হতভম্ব হয়ে যেতো। তবু, আমি অনিমেষ ভট্টাচার্যকে খুঁজতে লাগলুম। যদি পথে আবার কখনো দেখা হয়, সেইমত পথের সমস্ত মানুষের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ-ভাবে নজর রেখেছি। কিন্তু অনেকদিনের মধ্যেও তার দেখা হলো না। ভদ্র-

লোকের ঠিকানাও আমি জানতুম না। সামান্য একটা ব্যাপার, তবু আমার মনের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে রইল।

তারপর আমার অপর এক বন্ধু কথায় কথায় একদিন বললেন, তুই অনিমেষ ভট্টাচার্যকে চিনতিস? গালুডিতে যাদের বাড়িতে গিয়ে আমরা ছিলাম সবাই? শুনলুম, গত সোমবার সেই ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেছেন!

আমার ইচ্ছে আছে, পর্বতশিখরে উঠে কিংবা গভীর সমুদ্রে সাঁতার দিতে দিতে একদিন আমি অনিমেষ ভট্টাচার্যের কাছে ক্ষমা চাইবো।

৩০

*****

প্যাণ্ট-সার্ট পরে সবে মাত্র জুতোয় ফিতে বেঁধেছি, এমন সময় হৈ-হৈ করে বৃষ্টি এলো। অথচ বেরুতেই হবে আমায়। কয়েকদিন বুক পোড়ানো গরমের পর বৃষ্টির জন্য আকাশের পায়ে ধরে সাধাসাধি করেছিলুম, কিন্তু এখন এমন জরুরি সময় বৃষ্টি আমার মোটেই পছন্দ হলো না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অসহিষ্ণুভাবে পা ঠুকতে লাগলুম।

মিনিট দশেক পরেই বৃষ্টি থামলো যাহোক। গলির মোড়েই আর এক বিপত্তি। একটা বাস একটা গমবোঝাই লরিকে গোঁয়ারের মতন ধাক্কা মেরেছে। কেউ ভেঙে টুকরো হয় নি একটা মানুষও মরে নি, কিন্তু দু'জনেই এমন বেঁকে দাঁড়িয়েছে যে, পথ জোড়া, অর্থাৎ কিছুক্ষণ বাস চলবে না। এখান থেকে হেঁটে অন্য বাসের রাস্তায় যেতে হলে দশ মিনিট হাঁটতে হয়। হেঁটেই যেতুম, কিন্তু বৃষ্টিতে সামনে এক জায়গায় জল জমেছে, ওখানটা আমায় পেরুতে হলে জুতো প্যাণ্ট ভেজাতে হয়। একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এখন যদি জুতোটা ভিজে পা স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে, তাহলে তো কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরুবে না। অথবা, সব কথাই বোকাবোকা শোনাবে।

আমাদের এখানে সাইকেল রিকশা। দূরে একটি খালি রিকশার টিনটিনি আওয়াজ শুনতে পেলুম। রিকশাওলা বলাই আমার চেনা, প্রায়ই ওর গাড়িতে বাজার থেকে আসি। হাত তুলে বললুম, বলাই দাঁড়াও!

বলাই আমার সঙ্গে চোখাচোখি না করে বলল, এখন আমি ভাড়া যাব না।

আমি একটু অনুনয়ের সুরে বললুম, ঐদিকেই তো যাচ্ছো, নিয়ে চলো না।

—যেতে পারি, এক টাকা ভাড়া লাগবে।

আমি শুনে অনড়। তিরিশ পয়সার রাস্তা, চল্লিশ কি পঞ্চাশ বলুক, তার বদলে সোজা। আমি কড়া গলায় বললুম, ব্যাপারটা কি? একটাকা চাইতে তোমার লজ্জা করে না। আট আনা দেবো, চলো—

—বললুম তো ভাড়া যাবো না।

বলাইয়ের প্রত্যাখ্যান সপাং করে আমার মুখে লাগলো। ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে ছোঁড়াটার দু'গালে দুই থাপ্পড় কশিয়ে দি। কিন্তু তার আর সময় পেলুম না। একজন সুসজ্জিত প্রৌঢ়, হাতে চামড়ার ব্যাগ, মেঘলা দিনেও চোখে কালো রোদ-চশমা, ভারী গলায় বললেন, চলো এক টাকাই দেবো! এই বলে তিনি বলাইয়ের রিকশায় উঠে বসলেন!

আমি অপমানে নীল-লাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে, প্যান্টের পা দুটো ইয়াঙ্কি কায়দায় হাঁটু পর্যন্ত মুড়ে জুতো খুলে হাত ঝুলিয়ে উদাসীন মুখে জলের মধ্যে সপ্ সপ্ করে হাঁটতে লাগলুম।

পরদিন সকালে মুদি দোকানে ব্লেড কিনতে গেছি। আমি একবেলা না খেয়ে থাকতে পারি, কিন্তু দাড়ি কামাবার সময় পাতলা বিলিতি ব্লেড না হলে আমার চলে না। ডিভ্যালুয়েশনের পর এসব ব্লেডের দাম বেড়ে গেছে। কিন্তু দোকানের মালিক অধিকারীদা বললেন, আপনার কাছ থেকে বেশী দাম নেবো না, আমার পুরোনো কেনা ছিল, অন্যের কাছ থেকে বেশী নিচ্ছি, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাদা কথা। বসুন, বসুন, ঐ টুলটায় বসুন।

এই সামান্য কৃপার পরিচয় পেয়ে আমি অভিভূত হয়ে গেলুম। আমি তো বেশী দাম দেবার জন্য তৈরি হয়েই ছিলুম। অধিকারীদা মুদির দোকানের মালিক হলেও অনেকটা বন্ধুর মতন। আমার সঙ্গে রাজনীতি আলোচনা করতে খুবই ভালোবাসেন। ওর এখনো দৃঢ় ধারণা হিন্দুস্থান-পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে।

পাকিস্তান থেকে এসে ব্রজকিশোর অধিকারী এখানেরই একটা রেফিউজি কলোনিতে উঠেছিলেন, একটা প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করতেন, উনি আই এ পাশ এবং সংস্কৃতে বেশ ভালো জ্ঞান। প্রাইমারী স্কুলের হেড মাস্টারও হয়েছিলেন, হঠাৎ মাস্টারীতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে চাকরি ছেড়ে দিলেন। ইস্কুলের সেক্রেটারি অর্থাৎ আমাদের এলাকার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি হরিজীবন কুণ্ডুর সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি লাগতো। হরিজীবনবাবু সেই ইস্কুলের আবহমানকাল ধরে সেক্রেটারি এবং ওখানে একটি অলিখিত আইন এই যে, সেক্রেটারির যে কন্যারত্নটি আবহমানকাল ধরে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছে, তাকে হেড মাস্টার বিনা পয়সায় পড়াবেন। এবং প্রত্যেক বছর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার পর ছাত্রীর বদলে শিক্ষক মাথা পেতে গালাগালি খাবেন। এই সব ব্যাপারে চটাচটি করে অধিকারীদা মাস্টারী ছেড়ে মুদিখানা খুলেছেন। উনি এখন বলেন, দূর শালা! মাস্টারী করে পেটও

তোষামোদ করতে হতো। এখন মুদি হয়েছি, এতে সম্মান থাক না থাক, পেট তো ভরছে।

পেট যথেষ্টই ভরছে, অধিকারীদা এই দু'তিন বছরেই যথেষ্ট উন্নতি করেছেন, শুনেছি রিফিউজি কলোনীর মধ্যেই তিনি তিনতলা বাড়ির ভিত খুঁড়েছেন, সম্প্রতি। অধিকারীদা'র একমাত্র উচ্চাভিলাষ, একটি স্কুল খোলা—এবং তিনিই হবেন সেই স্কুলের সেক্রেটারী।

হরিজীবন কুণ্ডুকে আমি চিনি। ওঁর দশবারোখানা লরির ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা, আলু-পেঁয়াজের হোল-সেলার, পাঁচ-সাত খানি বাড়ির ভাড়া খাটানো ইত্যাদি নানান কাণ্ড। ওঁর ছেলে শম্ভু আমার সঙ্গে কলেজে এক সঙ্গে পড়তো, প্রায়ই ওদের বাড়ি যেতাম। শম্ভু বছর চারেক আগে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কিন্তু হরিজীবনবাবু এখনও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, এমন কি ওঁর কন্যারত্নটিকে বিয়ে করে আমায় ধন্য হয়ে যাবার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন এক সময়। আমি অবশ্য, ওকে দেখলেই সংসার ছেড়ে সাধু হয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করি।

যাই হোক, মুদির দোকানে বসে অধিকারীদা'র সঙ্গে ভিয়েৎনাম বিষয়ে তুমুল আলোচনা চালাচ্ছি, এমন সময় একটি খদ্দের এলো। তাকিয়ে দেখি, কালকের সেই রিকশাওলা বলাই, সর্ষের তেল কিনতে এসেছে। অধিকারীদা ওকে গ্রাহ্য না করেই বললেন, তেল নেই।

বলাই ক্ষুণ্ণ হয়ে বললো, একটুও নেই? আমার যে একেবারে বাড়ন্ত!

—আছে, কিন্তু তোকে আমি বিক্রি করব না।

—কেন?

—ছ' টাকা কিলো দিতে পারবি?

—ছ' টাকা? গত হপ্তায় নিয়ে গেলুম চার টাকা চল্লিশ।

—আমার স্টকে দু'এক টিন আছে, তা তোকে দিতে যাবো কেন তবে? আমার বাঁধা বড় খদ্দেরদের ফিরিয়ে দেবো? ছ'টাকা করে পারিস তো দে, নিয়ে যা। তোরা তাও পারিস্, তোদেরই তো এখন রাজত্ব!

—চার টাকা থেকে ছ'টাকা! গরীবদের ওপর—

বলাই তেল না নিয়েই ফিরে গেল। অন্য কেউ হলে আমি ব্যাপারটায় বিরক্তি হয়ে অধিকারীদাকে দু'চার কথা বলতুম। কিন্তু বলাইয়ের ব্যাপারে আমার মনে হলো, বেশ হয়েছে। ওর কালকের ব্যবহারে এখনও আমার রাগ পড়ে নি। অধিকারীদাকে কিন্তু আমি বলাই সম্পর্কে আগে কিছুই বলিনি। উনিই

বরং বললেন, তুমি হয়তো ভাবছো, আমিও পাকা কালোবাজারী হয়েছি। কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে অনেক কিছু ঠেকে শিখতে হয়। কাল হরিজীবনের (এখন আর বাবু বলেন না) গোডাউন থেকে আলু-পেঁয়াজ আনতে গেলুম, আলুর দাম চাইলো আশী পয়সা কিলো। অথচ বাজারে তখনও সত্তর দাম যাচ্ছে। কী বললে জানো? আলুর স্টক কমে এসেছে, বড় বড় পাইকারদের না দিয়ে তোমাকে দিতে যাবো কেন, যদি বেশী দাম না দাও! নিতে হয় নাও, নইলে পথ দেখো। কথাটা ঠিক, বড় খদ্দেররাই লক্ষ্মী, জিনিস সট পড়লে তাদেরই আগে দিতে হয়। আমি আর কথা না বাড়িয়ে অধিকারীদার দোকান থেকে উঠে পড়লুম।

পরদিন বিকেলবেলা আবার বৃষ্টি, আবার রাস্তায় জল। তবু ভাগ্যি এখনো বাস বন্ধ হয় নি। চলন্ত গাড়ি থেকে কাদা ছেটার ভয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে আছি। এমন সময় বাসের বদলে একটা মোটর গাড়ি এসে থামলো আমার সামনে। হরিজীবন কুণ্ডু মুখ বাড়িয়ে বললেন, কোথায় যাবে বাবাজী? উঠে পড়ো গাড়িতে।

উঠলুম। প্রশস্ত নতুন গাড়ি, ভাঙা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, তবু ঝাঁকুনি সামান্য। যাক্, বন্ধুদের আড্ডাখানা পর্যন্ত বিনা ভাড়ায় আরামে যাওয়া যাবে। হরিজীবন-বাবু মোলায়েম গলায় বললেন, কোথায় থাকো বাবাজী, আজকাল আর দেখি না তোমাকে? আমি বললুম, এই আর কি। আজকাল আর কিছুই ভালো লাগে না।

—কোথায় চললে এখন।

আমি উদাস হয়ে গিয়ে উত্তর দিলাম, দেখি, কোনো ঠিক নেই। ভাবছি গোয়াবাগানে রামকৃষ্ণ মিশনে যাবো একবার। ওখানে সন্ধেবেলা বেদপাঠ হয়, আমি শুনতে যাই মাঝে মাঝে।

তা বেশ বেশ। হে-হে, এই বয়সে তোমার মতন এমন ধর্মে মতি আজকাল আর···বিয়ে-থা করলেই না···

—আপনি কোথায় চললেন?

—আর বলো কেন? আমরা সংসারের ঘানিতে বাঁধা। কর্তব্য করে যাচ্ছি। যাচ্ছি খুচরো পয়সা যোগাড় করতে।

—খুচরো পয়সা?

—হ্যাঁ, খুচরো পয়সা। আজ আমার ছ'খানা লরি ছাড়বে, তার জন্য দেড়শো দুশো টাকার খুচরো ভাঙানি দরকার। সিকি-আধুলি।

—লরির জন্য এত সিকি আধুলি!

—তুমি ছেলেমানুষ, কিছুই জানো না দেখছি। অন্তত তিরিশ-চল্লিশ টাকার খুচরো সঙ্গে না দিলে লরিওলারা গাড়ি ছাড়তেই চায় না। মাঝে মাঝে রাস্তার মোড়ে পুলিশকে পয়সা দিতে হবে না?

—লরিওলারা পুলিশকে টাকা পয়সা ছুঁড়ে দেয় বটে দেখছি, কিন্তু কেন দেয় বলুন তো? বুঝতে পারি না!

—আগেকার দিনে বিধবাদের দেখেছো? যখন গঙ্গার স্নান করতে যেতেন, রাস্তার দু' পাশে ঠাকুর দেবতাব মন্দির দেখলেই একটা করে পয়সা ছুঁড়ে দিতেন। এখন আমাদেব সেই অবস্থা। রাস্তাব মোড়ে মোড়ে পুলিশ দেখলেই পয়সা ছুঁড়ে দেয় এরা।

—কেন? শুধুই ভক্তির জন্য?

—হে-হে। বলছো ভালো! প্রত্যেক ট্রাকেব পাবমিট হচ্ছে ছ টন মাল নেওয়া। আমাদের আট টন না নিলে গাড়ি ভর্তি হয় না, খবচ পোষায় না। ফলে সবাই আট টন করে নেয়। কিন্তু বেশী মাল নেবার জন্য কোনো ট্রাকেব বিরুদ্ধে মামলার কথা কখনো শুনেছো? শোনো নি তো! তাব কাবণ, বন্দোবস্ত আছে, ট্রাফিক কনস্টেবল দেখলে চার আনা, মোটর বাইকে চড়া সার্জন এসে ধরলে আট আনা, আব পুলিশেব গাড়ি হলে পাঁচ টাকা। এই বাঁধা বেট। এখন এক একটা গাড়ি যাবে কানপুব, আমেদাবাদ পর্যন্ত। কত পয়সা ফালতু যায় বলো তো? মা ষষ্ঠীর কৃপায়, আমাদের দেশেব আর যা কিছুরই অভাব থাক, পুলিশের তো অভাব নেই! হে-হে-হে—

মা ষষ্ঠীর কৃপা শুনে আমিও না হেসে পারলুম না। হবিজীবনবাবু রুমালে মুখ মুছে আবার বললেন, আট টন মাল নিলে ট্রাকের কোনই ক্ষতি হবে না, এ জন্য কোনোদিনও অ্যাকসিডেণ্ট হয় নি, তবু এই ভ্যানতাড়া আইন করে রেখেছে। আবে বাপু, তোদের স্টেট বাসে যে কুমড়ো গাদা করে এত লোক তুলছিস, এত লোড তোলার কোনো নিয়ম আছে? তার বেলা কিছু না। ট্রাফিক পুলিশের পাশ দিয়ে বাস ঠিক চলে গেল, কিন্তু লরি এলেই চার আনা। আর এই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আমার বাড়তি খরচা হচ্ছে, এর আমি কোনো হিসাব দেখাতে পারবো? ইনকামট্যাক্সওলাদের আমি বোঝাতে পারবো যে মশাই, ঘুষ দিতে আমার এত টাকা খরচ হয়েছে? তখন সেখানেও—

আমি, চেঁচিয়ে বললুম, থামান্, থামান্, আমি এসে গেছি। গাড়ি থেকে নেমে পড়লুম, এত সব অকাট্য যুক্তি দেখে আমার মাথা ঘুরছিল।

মাঝে মাঝে পরপর কয়েকটা এমন ঘটনা আসে চোখের সামনে যে, মনে হয়

তারা যুক্তি করে এসেছে, এসে হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে নাচতে আরম্ভ করে।

এর তিন চারদিন পর, একদিন নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছি রাত বারোটা আন্দাজ। বিয়ের তারিখ, সুতরাং রিকশা পাবার আশা খুব কম। চোখের সামনে ঝলমলে পোষাকপরা যাত্রী-যাত্রিনীদের নিয়ে সটসট্ করে রিকশা চলে যাচ্ছে। আরও দু'তিনজন লোক রিকশার জন্য দাঁড়িয়ে। বহুদিন পর অনেক সুখাদ্য খেয়েছি—সুতরাং খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করাই স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গল—মনকে এই সব যুক্তি বোঝাচ্ছি, হঠাৎ আমার কাছেই এসে একটা রিকশা খালি হলো। দেখি সেই বলাইয়ের রিকশা। সেদিন ওর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়েছিলুম, সুতরাং ওর রিকশায় আমার উঠতে ইচ্ছে হলো না। তখন পাশ থেকে আর একজন লোক এসে বললো, চলো, ভাড়া যাবে?

বলাই গম্ভীর মুখে বললো, এক টাকা ভাড়া লাগবে!

—এক টাকা? তিরিশের জায়গায় ষাট নাও, তা বলে এক টাকা?

—ওর কম হবে না!

—চালাকি পেয়েছো?

—যেতে হয় চলুন, নইলে দূরে আমার অন্য সওয়ারি দাঁড়িয়ে আছে। তারা এক টাকা দেবে।

বলাই বেশ স্পর্ধার সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। যে ভদ্রলোক দর করছিলেন তাঁকে আমি চিনতে পারলুম। আমারই প্রতিবেশী, অত্যন্ত সজ্জন, পুলিশে চাকরি করেন। সম্প্রতি একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করে এ পাড়ায় এসেছেন। ভদ্রলোক এখন অবশ্য সাধারণ পোশাকপরা। লোকটি বেশ সদালাপী ও ভদ্র। ওঁর অন্য নানাদিকে উৎসাহ আছে। পাড়ার ক্লাবের সাহিত্য-বাসরেও উনি মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকেন শুনেছি। আমাকে বললেন, দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে! চলুন, একসঙ্গে হেঁটেই যাওয়া যাক্ তা হলে। আমি বললুম, চলুন।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ভদ্রলোকটি এক সময় বললেন, রিকশাওলার কাণ্ডটা দেখলেন? তিরিশ নয়া'র জায়গায় একটাকা ভাড়া? এত রাত্রে রিকশা বেশী নেই, আর অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে, সেই মওকা বুঝে যা-তা দাম হাঁকছে! একটু সুযোগ পেলেই সবাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে। দেশের সব রকমের মানুষের মধ্যে যদি এরকম নীতির অভাব দেখা যায় তাহলে দেশের উন্নতি হবে কি করে?

আমি বললুম, যা বলেছেন স্যার। দেশের উন্নতির কথা ভাবতে গেলে রাত্তিরে আর ঘুমই আসে না। এই জন্য আজকাল ঘুমের বড়ি খাওয়া শুরু করেছি।

৩১

*****

ডালটনগঞ্জ থেকে মাইল পনেরো দূরে বেথলা, তারপর থেকে সংরক্ষিত বনভূমি। এখানে হরিণ আর বুনো মোষ চরে বেড়ায়, মাঝে মাঝে দু-একটা চিতার ডাক শোনা যায়, আর কখনো কখনো ছিটকে আসে হাতির পাল। মিশিরজি একটা আগুন জ্বালানো বাখারি তুলে বললো, ঐ দেখুন না হাতির পায়ের ছাপ, টাটকা, কাল রাত্তিরেই এসেছিল, ঐ দেখুন নাদি পড়ে আছে!

আমার সঙ্গে এক বন্ধু ও তার স্ত্রী ও চার বছরের কন্যা। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয় এবং গাড়ি খারাপ হয়। সন্ধে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নেমেছে ঝুপঝুপ করে অন্ধকার, সমস্ত অরণ্যদেশ রহস্যময় হয়ে এসেছে, দূরের যে-কোনো আওয়াজকেই আমরা বাঘের ডাক বলে মনে করছি।

গাড়িটা ঠেলে ঠেলে আমরা নিয়ে এলাম চেক পোস্ট পর্যন্ত, এখানকার চৌকিদার মিশিরজি, তার কাজ গাড়ি এবং ট্রাকগুলো পরীক্ষা করে দেখা—কেউ হরিণ মেরে নিয়ে যাচ্ছে কিনা অথবা চোরাই কাঠ। লণ্ঠন উঁচিয়ে মিশিরজি আমাদের দেখে বললো, ক্যা, পেট্রোল খতম? জেনানা আউর লেড়কি হায় সাথ মে—আপলোগ্‌কো তো বোহুৎ মুশকিল হো জায়গা! তারপর মিশিরজি গলায় উদাত্ত আশ্বাস এনে বললো যে, যাক ঠিক আছে—অন্য ট্রাক এলে সে আমাদের জন্যে পেট্রোল চেয়ে দেবে, সে গরমিণ্টের পেয়ারের লোক, তার কথা অমান্য করবে—এমন ট্রাকওলা এ-তল্লাটে নেই!

আমরা জানালুম যে, আমাদের গাড়ির মেশিনে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে, সারা সন্ধে আমরা দুজনে ঠোকাঠুকি করেও কিছুই করতে পারিনি। আজ রাতে আর এ-গাড়ি চালাবার উপায় নেই। পেট্রোল আমাদের গাড়ি ভর্তি গবগব করছে—ইচ্ছে করছে পেট্রোল ঢেলে গাড়িটায় আগুন লাগিয়ে দিই!

মিশিরজির ছোট্ট ঘরটার সামনে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে একটা বিশাল

গুঁড়িতে, কয়েকজন লোক সেই আগুন ঘিরে বসে হাত সেঁকছে। আশেপাশের গাঁও থেকে জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছিল ওরা। একটু শরীরটা গরম করে ফিরে যাবে, ছোট কলকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বেদম গাঁজা টেনে সবার চোখ লাল। তার দুদিন আগে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, অর্থাৎ প্রবল শীতের সময়।

আমরা রিজার্ভড ফরেস্টে পিকনিকে এসেছিলুম গাড়ি ভর্তি খাবার ও তেল নিয়ে, সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই। আগুন ঘিরে বসে থাকা লোকগুলি যদি দুর্বৃত্ত প্রকৃতির হয়, রূপসী বন্ধুপত্নীর শরীরভরা গয়নার লোভে যদি এই নিঝুম রাত্রিতে আমাদের আক্রমণ করে, তবে আত্মরক্ষার জন্য মুখ ছাড়া আর তো কিছু সম্বল নেই। অন্ধকার নির্জনতায় আগুনের চারপাশে বসে থাকা অপরিচিত লোক দেখলেই ডাকাত মনে হয়, সাধারণ মুখও মনে হয় ভয়ংকর। কিন্তু মিশিরজির গলার আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় লোকটা খাঁটি। জোয়ান শক্ত চেহারা, মাথায় ফেটি বাঁধা, গায় খাঁকি রঙের কোট, হাতে একটা মশালের মতো জলন্ত কাঠ—অথচ লোকটার গলার আওয়াজ শিশুর মতো কচি, কিছুটা অহংকারী, কিন্তু শিশুর অহংকার। মিশিরজি হুংকার দিয়ে উঠলো, এই ছোঁদিয়া, সাহেব-লোক আউর মাতাজিকে লিয়ে কুর্সি লাগাও।

একটা খাটিয়া আর দুখানা চেয়ার বেরুলো। বন্ধুটি ভালো হিন্দী জানেন, তিনি লোকগুলির সঙ্গে আমাদের সম্ভাব্য নিষ্ক্রমণের বিষয়ে আলোচনা করতে লাগলেন, তার গলা ঈষৎ ছমছমে। আমি লোকগুলির দিকে চুপ করে তাকিয়ে থেকে সিগারেট ধরালুম। একমাত্র মেয়েরাই বিপদের একেবারে মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত অকুতোভয় থাকে। বন্ধুপত্নী অম্লানবদনে হুকুম করলেন, থোড়া পানি দিজিয়ে তো, পিনে কা পানি! আগুন পোহানো একটা লোক ঘর থেকে শশব্যস্ত হয়ে জলের কুঁজোটা এনে দিতে যেতেই মিশিরজি হা-হা করে উঠলো। তার হাত থেকে কুঁজো কেড়ে নিয়ে ধমকে ঠেট হিন্দীতে যা বললো, তার অর্থ এই যে, সে একটা অচ্ছুৎ ভুঁইহার, সে জল ছুঁয়ে দিল কোন্ সাহসে? তার হাতের ছোঁয়া জল কি এই ব্রাহ্মণরা খেতে পারে? মিশিরজিও ব্রাহ্মণ—সেই শুধু বাবু-দের জল দিতে পারে।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি জানলে কী · রে যে আমরা ব্রাহ্মণ?

কথা না বলে বড় বড় চোখ মেলে এমন স্তম্ভিতভাবে মিশিরজি দাঁড়িয়ে রইলো যে, তার অর্থ আমার কী মাথা খারাপ? এই রকম ভদ্দরলোকের মতো চেহারা, সাহেবি পোশাকপরা লোকরা কখনো ব্রাহ্মণ না হয়ে পারে? এটুকু

বোঝার বুদ্ধিও কি তার নেই ; তারপর কলসীর সবটা জল ফেলে দিয়ে আবার কুয়ো থেকে জল আনতে গেল সেই শীতের মধ্যে।

কাঠ চেরার মতো একটা জোরালো আওয়াজে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে বসতেই ওরা একজন হেসে বললো, উয়োতো ভৈঁইষছে, বাবু!—আমি অবশ্য বুনো মোষকেও খুব একটা বন্ধু স্থানীয় মনে করি না। তাছাড়া যে-হাতির পাল কাল এসেছিল, তারা আজও একবার বেড়াতে আসবে কিনা কে জানে! মনকে অবশ্য বোঝাচ্ছি যে আমাদের জন্য তো আর ভয় কিছু না, ভয় শুধু সঙ্গের মহিলা ও শিশুর জন্য। আগুন পোহানো লোকগুলির চোখে আমাদের ছোট্ট দলটি বেশ একটা কৌতূহলের সামগ্রী হয়েছে, ওরা বাড়ি যাবার জন্য উঠি উঠি করেও যেতে পারছিল না। আমাদের কিছু একটা ব্যবস্থা ওরা দেখে যেতে চায়। আমাদের অবশ্য কোনোই ব্যবস্থা হবার সম্ভাবনা নেই। সন্ধে পর্যন্ত এখান দিয়ে বাস যায়, শেষ বাসও চলে গেছে, কোনো ট্রাক থামিয়ে ওঠা যেতে পারে—কিন্তু মেয়েদের নিয়ে ট্রাকে ওঠা নিরাপদ নয়—ট্রাক ড্রাইভারগুলো নাকি অধিকাংশই 'শ্বশুরাকা বেটা'। মিশিরজির ঘরে অবশ্য আমরা থেকে যেতে পারি—তাতে সে ধন্য হবে। কিন্তু আমরা ঠিক করলুম, সারারাত ঐ আগুনের পাশেই বসে জেগে কাটিয়ে দেবো, সঙ্গে খাবার দাবার তখনও আছে, এছাড়া শীত নিবারণের জন্য ব্র্যাণ্ডি।

মিশিরজিকে দেখলাম সবাই খুব খাতির করে। তার কারণ শুধু যে সে ব্রাহ্মণ তাই নয়, সে গভর্নমেণ্টের লোক। এ তল্লাটে বন জঙ্গলের মধ্যে সেই একমাত্র গভর্নমেণ্টের লোক, সে রিপোর্ট করলে যে-কোনো লোককে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। এ কারণে মিশিরজিরও অহঙ্কারে যেন মাটিতে পা পড়ে না। মাঝে মাঝে চেক পোস্টের ওদিকে গাড়ি থেমে হর্ন দিচ্ছে, মিশিরজি চাবি দিয়ে গেট না খুলে দিলে যেতে পারবে না। হর্ন শুনে মিশিরজি মশালটা তুলে দেখে নিচ্ছে—ট্রাক না জিপ না মোটরগাড়ি। ট্রাক হলে তার আর নড়বার নামটি নেই। ওখানেই বসে থাকে। বন্ধ গেটের ওপাশে বারে বারে হর্ন দেয়। মিশির তবু চুপ করে বসে থেকে মিটিমিটি হাসে। আর বিড়বিড় করে, ইঃ! অত ফটফটিয়া কিসের? হতো গরমিণ্টের গাড়ি, ছুটে গিয়ে খুলে দিতুম। প্রাইভিট হয়েছিস, এখন ঠার যা। অগত্যা ট্রাকের ড্রাইভার নেমে গেট টপকে এদিকে আসে, মিশিরজির সামনে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে অনুনয় করে। সে তখন চাবির থোকা হাতে নিয়ে হেলতে দুলতে যায়। মশাল উঁচিয়ে সারা গাড়ি তন্নতন্ন করে দেখে, মাডগার্ডে একটা চাঁটি লাগিয়ে বলে, যাও, পাস্।

আমি মিশিরজিকে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি এই জঙ্গলে একা একা থাকো,

তোমার ভয় করে না? সে আত্মপ্রসাদের স্বরে বললো, ডর লাগলে কি হবে, গরমিণ্টের কাজ, করতেই তো হবে। আগে যে-লোকটা ছিল, একদিন রাত্রে হাতি এসে তার ঘরটা ভেঙে দিল, সে লোকটাও মরে গেল। সে লোকটা যে রাত্রে ঘুমোতো। মিশির কখনো রাত্রে ঘুমোয় না, আগুন জ্বেলে বসে থাকে।

আমি বললুম, মিশির, রাত্রে তোমার একা একা লাগে না?

—তা তো লাগেই। এ-শালা গাছপালা আর জন্তু-জানবর, এ কি মানুষের বন্ধু হতে পারে? মানুষ মানুষকে চায়। কিন্তু কী করবো, গরমিণ্ট যে তাকে এখানেই থাকতে বলেছে। সে গরমিণ্টের জন্য এত করে—অথচ গরমিণ্ট তার কথা মাঝে মাঝে ভুলে যায়। এই দেখুন না, একটা টর্চ কবে থেকে স্যাংকসেন হয়ে গেছে, অথচ এখনও টর্চ এলো না। লণ্ঠনের ক্রাচিন নেই আজ দু হপ্তা, তবু গরমিণ্টের হোঁস নেই।—তারপর হেসে সোহাগের স্বরে মিশির আবার বললো, আহা সে বেচারা গরমিণ্টই বা কি করবে। তাকে তো কত দেখতে হয়। আমার মতো চৌকিদার আরও কত আছে জেলা ভরে, পালামৌর জঙ্গল ভরা চৌকিদার, সবার জন্যে ভাবতে ভাবতে গরমিণ্ট বেচারা থকে যায় মাঝে মাঝে।

বন্ধু বললেন, মিশিরজি, তুমি বিয়ে করো নি কেন?

মিশির দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, এ জঙ্গলে কে থাকবে আমার কাছে? পাহাড়িয়া মুণ্ডা কিংবা ওরাওঁ—এ-সব ছোট জাতের মেয়েরা জঙ্গলে থাকতে পারে, কিন্তু ব্রাম্‌ভনের মেয়ে কী করে থাকবে? তারপর মিশির হা-হা করে হেসে উঠে বললো, একটা সাচ্ বাত আপনাদের বলি, বাবু। গরমিণ্ট এমন অভিমানী কিছুতে সতীন সহ্য করে না। একবার গরমিণ্টের কাছ থেকে ডেফো (ডি এফ ও) সাহেব এলেন, আমি তাঁকে বললুম, হুজুর, আমার একঠো বাত আছে। সাহেব বললেন, বল্ ঝট্‌পট্। আমি বললুম, হুজুর, সরম লাগছে। সাহেব বললেন, তবে বলতে হবে না। আমি তখন বললুম, হুজুর, আমি একটা সাদি করতে চাই। সাহেব বললেন, কর না। আমি বললুম, হুজুর, আপনি ব্রাম্‌ভন, আপনি তো জানেন, কোনো ব্রাম্‌ভনের লেড়কি এখানে থাকতে চাইবে না। তা হলে আমি কি করে সাদি করবো? সাহেব হাসতে হাসতে বললো কী জানেন, তবে হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাদি কর, নয় সাদি করিস্ না। বুঝুন কী কথার কী উত্তর!

বন্ধুপত্নী এমন খিলখিল করে হেসে উঠলেন যে, বাচ্চার ঘুম ভেঙে যায় আর কি। আমরাও মুখ ফিরিয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে লাগলুম। মিশিরজী আহত

মুখে বললো, আসল ব্যাপারটা বুঝলেন তো ? গবমিণ্ট ডেকোব কাছে আগেই বলে দিয়েছে, মিশিরের বিয়ে করা চলবে না। আমাকে এই আধিয়ার জঙ্গলে বাঘ আর হাঁথির মধ্যে রেখে গরমিণ্ট দূর থেকে মজা দেখছে। দেখুক ! আমিও পিছ পা নই। হুঁশিযার থেকে পাহারা দিচ্ছি, এক বাত্তিরও ঘুমোইনি। দেখি, আমার ওপর গবমিণ্টের মায়া হয় কিনা। হেঃ। আমিও ব্রাম্‌ভন্‌ গরমিণ্টও ব্রাম্‌ভন্‌। কেউ কারুর থেকে কমতি নেই।

আমি বললুম, মিশির গবমিণ্ট যে তোমাকে মাঝে মাঝে ভুলে যায়, তাতে তোমার রাগ হয় না ?

মিশির একটা উদাসীন ভঙ্গী করে বললো, ভুলে তো যাবেই। আমার মতন শ-ও শ-ও হাজার হাজার চৌকিদাব নিয়ে গবমিণ্টের কাববার। তবু দেখুন বাবু সাহেব, ভুলে ভি যাবে, লিকিন তাও এত হিংস্নুট ক আমায় সাদি কিছুতেই করতে দেবে না। আমায় এখানে একা রাখবে।

কথা বলতে বলতে মিশিব অন্ধকার জঙ্গলেব দিকে তাকিযে বইলো। ঈশ্বরেরই মতন গভর্নমেণ্ট তাব কাছে এক দুর্বোধ্য, জীবন্ত অস্তিত্ব। মিশিরেব মুখ দেখলেই বোঝা যায় সে এক দিন না একদিন গভর্নমেণ্টকে স্বচক্ষে দেখাব প্রত্যাশায় আছে।

আমরা দুই বন্ধু পরস্পব ইংরেজিতে বললুম, মিশিব হচ্ছে গভর্নমেণ্টেব প্রণয়ী। দয়িতাকে পাবাব জন্য ভালোবাসাব জোবে ও এই বিপদসঙ্কুল জঙ্গলেব মধ্যে পড়ে আছে। সামান্য কোনো নারীকে বিবাহ বন্ধনে বাঁধাব ওব আব দবকাবটাই বা কি ?

৩২

*****

বি এন জি এস কথাটা তো সবাই জানেন, অর্থাৎ বিলেত না-গিয়ে সাহেব। আজকাল ঐ রকম বিলেত না-যাওয়া সাহেবদের উপদ্রব বড বেড়েছে। মাঝে মাঝে তারা বড়ই বিরক্ত করে।

আমরা কোনো বিলেতফিলেত যাইনি এবং কস্মিনকালে যাবার আশাও নেই বলে, কোনো লোভও নেই। কোথাও ও প্রসঙ্গ উঠলে আমরা বলি, দূর দূর, আজকাল বিলেত ফিলেত যাবার মধ্যে কোনো মজা নেই, যদি কোথাও কখনো যেতেই হয়, একেবারে চাদে বেড়িয়ে আসবো।

কিন্তু আপাতত যখন চাঁদে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং বিলেত যাবারও উপায় নেই, তখন মাঝে মাঝে শখ হয়, কোচবিহার কিংবা আলিপুরদুয়ার কিংবা পুরুলিয়া থেকে মাঝে মাঝে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? কাশী কিংবা কাশ্মীর, ঔরঙ্গাবাদ কিংবা উটকামণ্ড যাবার সামর্থ্য আমার নেই! তাই কখনো কখনো ইচ্ছে হয় বাংলা দেশেই কোথাও বেড়িয়ে আসি। আমরা বাঙালীরা কজনই বা গোটা বাংলা দেশ দেখেছি!

কুচবিহারের কথাই ধরা যাক, বাংলা দেশেরই একটা শহর তো, কিন্তু কলকাতা শহরে খুব কম লোকই দেখি যাঁরা কখনো কুচবিহারে গেছেন বা কুচবিহার সম্পর্কে কিছু জানেন। শোনা যায় শহরটা দেখতে সুন্দর, রাজার বাড়ী আছে। শুধু এইটুকুই ঐ শহর সম্পর্কে জ্ঞান, অথচ বাংলা দেশেরই শহর তো। এই মুহূর্তে কোনো বিখ্যাত বাংলা গল্প উপন্যাসের নাম মনে পড়ছে না, যা কুচবিহারের পরিবেশ নিয়ে লেখা। কোনো কারণ নেই, ক' দিন ধরে কুচবিহার নামটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো, এক একবার খুব শখ হতে লাগলো চট্ করে কুচবিহার ঘুরে আসি। বাংলা দেশকে সম্পূর্ণ জানবার একটা ছেলেমানুষী ইচ্ছে আমায় পেয়ে বসে।

হঠাৎ ট্রেনে চেপে বসলে কোনো অসুবিধে ছিল না। আমাদের ভ্রমণ তো এই রকম, হঠাৎ খেয়াল হলো, অবিলম্বে ট্রেনে চেপে বসা। পৌঁছে-থাকা খাওয়ার চিন্তা করতে হয় না. কিছু না হোক, হট্টমন্দির কিংবা রেলস্টেশনে তো শোবার যায়গা পাওয়া যাবেই, আর ভোজনং যত্রতত্র।

কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে একটু শৌখিনতা করতে ইচ্ছে হয়, ইচ্ছে হয়, বেড়াতে গিয়ে দাড়ি কামাবার জন্য গরম জল চাই, ঘরে বসেই চা খেতে চাই, রাত্রে ঘুমোবার আগে, ইলেকট্রিক আলোর সুযোগ চাই। সুতরাং ভাবলুম, এ বছরটা তো আন্তর্জাতিক পর্যটন বৎসর—সুতরাং কোনো একটি পর্যটন সংস্থায় গিয়ে কুচবিহার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া যাক।

গেলুম একটা পর্যটন সংস্থায়। উঃ কি বি এন এস-দের জি দৌরাত্ম্য সেখানে! সুন্দর ফুটফুটে চেহারার ছেলে মেয়েরা সেখানে কাজ করে। চমৎকার সাজ-পোশাক, বসে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প-খুনসুটি করছে, কোনো সাহেব-মেম এলেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠছে তারা, সাহায্য করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠছে, ইংরেজির স্রোত বইয়ে দিয়ে সাহেব মেমদেরও ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিচ্ছে। পাঁচ মিনিটে সব কিছু বুঝিয়ে ফেলছে।

আমি নেটিব তো সেই জন্য আমাকে কারুর গ্রাহ্য নেই। মেয়েদের চোখে চোখে চোখ ফেললে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে, ছেলেরা তো তাকাচ্ছেই না। সঙ্গে এক বন্ধু ছিল, সে বললো, চল্ ওরা পাত্তা দিচ্ছে না, সরে পড়ি। কিন্তু আমার সরে পড়ার ইচ্ছে নেই, কেননা, আমার ধারণা, পর্যটক যে শুধু সাহেবরাই তার কোনো মানে নেই। বাঙালীরাও ভ্রমণে বেরুতে পারে। অন্তত কুচবিহার যাবার কোনোই বাধা নেই। তাছাড়া, ওরা বোধ হয় আশা করে, আমরাই আগে কথা বলবো।

যাই হোক, একজন যুবককে পাকড়াও করে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চোখে চোখ ফেলে বললুম, আমি একটু কুচবিহারে যাবো, আপনারা যদি—।

যুবকটি মাঝ পথেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, কুচবিহার? ওখানে আমাদের কোনো টুরিস্ট লজ নেই!

—তা না থাক। তবু ওখানকার সম্পর্কে কিছুটা খোঁজ খবর—

—হোয়াই পারটিকুলারলি কুচবিহার? কুচবিহার যাবেন কেন?

—এমনিই! কেন ওখানে যাবার কোনো নিষেধ আছে?

—না। তবে ওখানে যাওয়া খুব ডিফিকাল্ট। বেড়াতে যাবেন তো অন্য কোথাও যান না, শান্তিনিকেতন বা দীঘা—

—শান্তিনিকেতন বা দীঘায় গেলে শান্তিনিকেতন বা দীঘাতেই যাওয়া হবে, কুচবিহার যাওয়া হবে না। কেউ যদি শখ করে কুচবিহারেই যেতে চায়—

—তাহলে চলে যান—

—কি করে ?

—প্লেনে চেপে, কিংবা ট্রেনে ?

—না, মানে আমি জানতে চাইছিলুম ?

—স্যরি, উই ক্যাণ্ট অকার য়ু মাচ হেলপ !

যুবকটি কাঁধ ঝাঁকালেন—শীতকালে হঠাৎ শরীরে জল পড়লে যেমন কেঁপে ওঠে লোক—কিন্তু যুবকটি নিশ্চয়ই ভাবলেন, ঐভাবে তিনি কাঁধ বাঁকিয়ে ফরাসী কায়দায় শ্রাগ করেছেন। তা ভাবুন বা করুন, তাতে তো আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু কুচবিহার শহরে কি ওঁর কোনো ঘোরতর শত্রু থাকে, যার জন্য উনি কুচবিহার সম্পর্কে অমন বীতরাগ ? মনে হয়, কুচবিহারে কেউ যান, এটা ওর একেবারে মনঃপূত নয়। আমাকে প্রতিহত করে উনি তখন উদাসীন মুখে টাইয়ের গিঁট ঠিক করছেন।

আমি তবু বিনীতভাবে বললুম, দেখুন, আমার একটু কুচবিহারে বেড়াতে যাবার ইচ্ছে ছিল ! ওখানে হোটেল-কোটেল কি রকম আছে—সরকারের কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা সেই সব জানার জন্যই আপনাদের কাছে এসেছিলুম। আমি তো শুনেছি এইসব কথা জানাবার জন্যই আপনাদের অফিস খোলা হয়েছে !

যুবকটি পুনরায় রূঢ় ভাবে বললেন, বললুম তো, ও সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। গো টু দীঘা অর্ শান্টিনিকেটন।

এলাম আর একটি পর্যটন সংস্থায়। এবারে, একটি মহিলাকে গিয়ে বললাম, শুনুন, আমি একটু—

মহিলাটি হাতে পেন্সিল এবং পেন্সিলের মতন পাঁচটি আঙুল তুলে বললেন, গোটুদা জেণ্টলম্যান ওভারদেয়ার, প্লীজ।

মুখের বাক্যটি পুরো শেষ করতে না দিলে আমি ভয়ানক চটে যাই তা ছাড়া, মহিলাটি যখন কাউণ্টারেই দাঁড়িয়ে আছেন—তখন আমার সঙ্গে কথা বলবেন না কেন—তারও তো কোনো যুক্তি নেই ! মেয়েরা শুধু মেয়েদের সঙ্গে কথা বলবে, আর ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে—সরকারী অফিসে এরকম কোনো নিয়ম আছে নাকি ? আমার বাংলা কথা শুনেও উনি কেন ইংরেজিতে কথা বলবেন ?

কিন্তু মহিলাদের ওপর চটে যাওয়া আমার ধাতে নেই বলে, মুখে তবু হাসি এঁকে রেখে কাউণ্টারের অন্য ধারের যুবকটির দিকে গেলুম।

এখানেও যথারীতি সুদর্শন যুবা, পরিপাটি চুল আঁচড়ানো, টাই-এ নিখুঁত গিঁট এবং ভাবলেশহীন মুখ। সিনেমার অভিনেতার মতন চোখ তুলে তিনি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। আমি আমার সম্পূর্ণ মনের ভাব তাঁর কাছে প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, খোচ্ বাহার ? ওয়ান মোমেণ্ট। আমি দেখে দিচ্ছি—

আমি বিনীত ভাবে জানালুম, খোচ-বাহার নামে কোনো জায়গায় আমার যাবার ইচ্ছে নেই। 'আপাতত, আমি কুচবিহারে যেতে চাই।

—হ্যাটস রাইট, খোচ বাহার, আমি দেখে বলে দিচ্ছি। তিনি কী একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। দেখা গেল, আমার কুচবিহার যাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কোনো উৎসাহ নেই তেমন, গেলেও হয় না গেলেও ক্ষতি নেই—এই রকম ভাব। বইটি খুলে তাঁর নিজস্ব ভাষায় আমাকে নানান তথ্য পরিবেশন করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে টেলিফোন আসছে—তিনি টেলিফোন ধরেছেন পল নিউম্যান এর কায়দায়, কথা বলছেন পুলিশ কমিশনারএর মতন।

ততক্ষণে কুচবিহারে যাবার ইচ্ছে আমার উপে গেছে, আমার মাথা ধরেছে, এবং কান কটকট করছে, চোখ জ্বালা করা শুরু হয়েছে। মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছি, যদি কখনো কুচবিহার যাই তবে নিরুদ্দেশ যাত্রার ভঙ্গিতে বেরিয়ে পড়বো। কেননা, কারুর কথার মধ্যে ভাঙা ইংরেজি শুনলে আমার মাথা ধরে, ইয়ার্কি ছাড়া অন্যভাবে কেউ এক্সকিউজ মী বললে আমার কান চুলকায়। একবার ইচ্ছে হলো, আচমকা ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে দেখবো, 'ষড়া অন্ধা' বেরিয়ে আসে কিনা ?

তথ্য পরিবেশনে শেষ করে যুবকটি সেই নিস্পৃহ, ভাবলেশহীন কঠিন মুখে আমার দিকে ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকালেন। হঠাৎ আমার মায়া হলো খুব। আহা, এত শখ এদের সাহেব সাজার, এই সব বি এন জি এস দের সবাইকে একবার অন্তত বিলেত ঘুরিয়ে আনাই উচিত। এখনই যা মুখচোখের চেহারা, বিলেত না গেলে তো মুখের চেহারা দিন দিন আরও আঁট হয়ে আসবে। তখন কি আর তাকানো যাবে মুখের দিকে! বরং সাহেবদের দেশ ঘুরে এলে যদি সাহেব হবার নেশা কাটে!

হঠাৎ একটু পরোপকার করার ইচ্ছে হয় আমার। আমি আচমকা জিভ বার করে একটা ভেংচি কাটলুম যুবকটির দিকে। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে সরে গিয়ে বললেন, ওকি! ওকি!

আমি আবার জিভ বার করে, চোখ উলটে, নাক বেঁকিয়ে আরেকখানা বিরাট ভেংচি কাটলুম।

যুবকটি আঁতকে উঠে চিৎকার করলেন, হোয়াটস গ্ভাট! হঠাৎ আপনার কি হোলো?

আমি বললুম, তবু আপনার হাসি পাচ্ছে না? আমি এখানে ডিগবাজি খাবো? কিংবা টেবিলে উঠে শীর্ষাসন করলে আপনার হাসি পাবে?

—আমাকে হাসাবার জন্য আপনার ব্যস্ত হবার কারণ কি? হঠাৎ হাসতেই বা যাবো কেন আমি?

—এমনিই। লোকের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু হাসি মুখ করে রাখলে ক্ষতি কি?

—অকারণে বোকার মত হাসবোই বা কেন?

—বোকার মতন? না হাসলেই মানুষদের মুখ বোকার মতন দেখায়। কেন, সাহেবরা বুঝি হাসে না কখনো?

—সাট্ আপ! আজেবাজে কথা বলবেন না বলছি!

—ঠিক আছে তা হলে, হাসবেন না। আরও গম্ভীর হয়ে থাকুন। আমিই না হয় একটু হাসি। বেশ জোরে জোরে খানিকটা হাসি, কি বলুন?

৩৩



অনাদিবাবুকে দেখতুম, ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে বাগানে যেতেন। দেখতাম অথবা শুনতামও বলা যায়।

আমি তো জীবনে সূর্যোদয় দেখেছি কয়েকবার মাত্র। বস্তুত চড়া লাল রং আমার সহ্য হয় না বলেই ভোরের সূর্য আমি পছন্দ করি না। ঘুম ভেঙে চোখ খুলে তাকাই সেই তখন, যখন ভোরের লাল সূর্য বেশ হলদেটে হয়ে এসেছে। এবং শেষ বিকেলেও আমি সাধারণত অফিসে বা চায়ের দোকানে বন্দী থাকি বলে —গাঢ় সূর্যাস্তও আমার জীবনে খুব বেশী দেখা হয়ে ওঠে নি। আমার দিন কাটে ফ্যাকাসে—ঝাপসা রঙের মধ্যে। কিন্তু রিটায়ার্ড উকিল অনাদি সেনগুপ্ত গত পঞ্চাশ বছর ধরে নাকি ভোর সাড়ে চারটের সময় ঘুম ভেঙে বাইরে আসেন।

বছর দুয়েক আগে আমি কিছুদিন বর্ধমানে ছিলাম। আমাদের বাড়ির পাশেই অনাদিবাবুর বাড়ি, আমার শোবার ঘরের পিছনেই তাঁর বাগান। প্রত্যেক দিন ব্রহ্ম মুহূর্তের আগে বাগানে অনাদিবাবুর গান ও নাচে আমার ঘুম ভাঙে। অনাদিবাবু যখন বাগানে আসেন, তখন তাঁর হাতে জলের ঝরি ও খুরপি, পরনে হাফ প্যান্ট ও পায়ে ঘুঙুর। গলায় রামপ্রসাদী গান। গানের সঙ্গে তাল ঠোকেন ঘুঙুর বাজিয়ে।

এক একদিন ঘুম ভাঙে, তখনও সূর্য ওঠে নি, শিয়রের জানলা দিয়ে আমি তাকিয়ে দেখছি, বাগানের প্রত্যেকটি গাছের পাশে ঘুরে ঘুরে অনাদিবাবু নেচে গান করছেন, আমায় দে মা পাগল করে, ব্রহ্মময়ী—। তখন হয়তো কোনো স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমার ঘুম ভেঙেছে, সেই অপ্রাকৃত আলোয় অনাদিবাবুর অস্তিত্বও আমার কাছে অপ্রাকৃত মনে হয়। কিছুক্ষণ দুর্বোধ্যতায় বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আবার আমি বিছানায় পাশ ফিরে ভাঙা ঘুম মেরামত করার চেষ্টা করেছি।

অনাদিবাবু কিন্তু পাগল বা ব্যতিকগ্রস্ত নন। গান বা নাচের সঙ্গে গাছপালার ফলন-বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক আছে—এরকম বিশ্বাসও তাঁর নেই। আসলে তাঁর খুব সাপের ভয়, বাগানে যদি সাপ থাকে এই আশঙ্কায় তাঁর গান ও নাচ—শব্দ পেলেই নাকি সাপ দূরে চলে যায়। এবং ওঁর ঘুঙুর পরার খবর ওঁর বাড়ির বাইরে আমি ছাড়া আর তো কেউ জানে না।

বাগানের সম্পূর্ণ পরিচর্যা সেরে সাতটা আন্দাজ তিনি আমার জানালার পাশে এসে গলা খাকারি দিয়ে ডাকতেন, কী, ঘুম ভাঙলো? ইয়ং ম্যানের পক্ষে এত ঘুম—আর্লি টু বেড এ্যাণ্ড আর্লি টু রাইজ—এই হচ্ছে গিয়ে…তখন আমি গভীর ঘুমে মগ্ন এবং সকালের ঘুম এক ডাকে ভাঙে না।

অনাদিবাবুকে আমার গোড়ার দিকে বেশ ভালোই লাগতো। রিটায়ার্ড লোকেরা সাধারণত একটু বেশী কথা বলেন এবং উনিও সুযোগ পেলেই আমাকে ধরে বাগানের কথা শোনাতেন। কিন্তু ওঁর কথা শুনতে প্রথম প্রথম খারাপ লাগতো না। লোকটির পুষ্পপ্রীতি ছিল অসাধারণ। স্বাস্থ্যবাতিক কিংবা অন্য কিছুর জন্যই ভোরে ওঠা নয়, শুধুই বাগানের জন্য। সকাল নয়, সারাদিনই প্রায় বাগানে কাটে তাঁর। এবং রিটায়ার করার বহু আগে থেকেই এই শখ।

বেশ বড় বাগান, অনেক ফুল ফোটে—যদিও অনাদিবাবু ফুল বিক্রি টিক্রি করার কথা ভাবেন না, ফুলের আর কোনোই প্রয়োজন নেই। তিনি ফুলগুলোকে নিষ্কামভাবে ভালোবাসেন। নতুন গোলাপের চারা লাগাবার পর ওঁর ধৈর্য ডারুইনকে হার মানায়। যতক্ষণ না সেই গাছে ফুল ফুটেছে—তিনি একাগ্রভাবে সেদিকে চেয়ে থাকেন।

সকালবেলা যেদিন এসে বলেন, জানেন এত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলুম না —তখন ওঁর দীর্ঘশ্বাস ও করুণ মুখচোখে ফুটে ওঠে পুত্রশোক, কিন্তু আসলে মারা গেছে একটা চন্দ্রমল্লিকার চারা। মফঃস্বল আদালতের উকিল ছিলেন, জীবন কেটেছে নোংরা আদালত ঘরে চোর জোচ্চোর আর বদমাসের সঙ্গে, তবু কি করে ওঁর এমন সৌন্দর্যবোধ রয়ে গেছে ভেবে আমি আশ্চর্য হতুম। উনি আমাকে বিভোর হয়ে বলতেন, ক্যালিফোর্নিয়া পপি যখন প্রথম ফোটে—ফুলের ভেতরটা তাকিয়ে দেখবেন, কী নরম রঙ, ওরকম রং আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখবেন না!… ওটা কি ফুল বলুন তো? চিনতে পারলেন না? কাঞ্চন!…ওকি আপনি অতসীও চেনেন না। অবশ্য এরকম ডবল-অতসী আমিও আগে দেখিনি! ওটা? ওটা বিদেশী ফুল—ওর নাম নাসটেসীয়ান। আহা, ওই বেলফুলগুলো দেখুন, বড় অভিমানী ওরা, একটু যত্নের ত্রুটি হলেই কী রূপ, আহা চক্ষু সার্থক!

ফুল সম্পর্কে আমার অবশ্য তেমন কোনো ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু ফুল সম্পর্কে অনাদিবাবুর ওরকম আন্তরিক ভালোবাসা দেখতে আমার ভালোই লাগতো। তা ছাড়া, আমার শিয়রের জানলা দিয়ে যখন তাঁর বাগানের নানান ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধ ভেসে আসতো—তখন আমি বিনা পয়সায় আনন্দ উপভোগের স্বাদ পেতুম!

অনাদিবাবুর তেমন কিছু শিক্ষাদীক্ষা ছিল না, কথা বলে দেখেছি, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ওঁর কোনো জ্ঞানই নেই। বেশীর ভাগ লোকই যে-রকম হয়, ইস্কুল কলেজে পড়েছেন ডিগ্রী নেবার জন্য, বাকি জীবনটা খরচ করেছেন জীবিকার জন্য, এর বাইরে আর কিছু নেই। তবু এই অপ্রয়োজনীয় পুষ্পপ্রীতি ওঁর মধ্যে এলো কি করে? তবে কি ওঁর ভিতরে কোনো আলাদা সৌন্দর্যবোধ আছে—যা শিক্ষা কিংবা প্রেরণার অপেক্ষা রাখে না? কিন্তু এই সৌন্দর্যবোধটাই বা কি করে একতরফা হয়? অনাদিবাবুর বাড়িতে গিয়ে কিন্তু আমি খুবই দমে গেছি।

অনাদিবাবুর বাগান ঝকঝকে তকতকে সাজানো, কোথাও একটু অনাবশ্যক আগাছা বা ময়লা নেই, ছবির মতন। কিন্তু ওঁর বাড়িটা যাচ্ছেতাই। অনাদি-বাবুর তিন ছেলে—দুই মেয়ে। বড় ছেলে অসবর্ণ বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। খুব অভাবের সংসার নয়, কিন্তু বাকি ছেলেমেয়েগুলোর বিশ্রী জামা-কাপড়, সারা বাড়িটা অগোছালো ছন্নছাড়া। বারান্দায় বসার জায়গা, কয়েকখানা বাজে ক্যালেণ্ডার ঝুলছে, কাপড়ের ওপর সূঁচের সেলাই করা পুকুর পাড়ে তাল গাছের একটা বিকট ছবি বাঁধানো। অনাদিবাবু স্ত্রীকে ডাকলেন গোবিন্দের মা বলে, বললেন, আমাদের ইয়েকে চা দাও এক কাপ—আবার চোদ্দ ঘণ্টা লাগিও না যেন!

—চা নিয়ে এলো একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, যথারীতি কাপের কানাগুলো ভাঙা। মেয়েটি বললো, বাবা তোমাকেও চা দেবো? অনাদিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, দিবি না তো কি? আবার জিজ্ঞেস করার কি আছে! মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, অনাদিবাবু আবার ডেকে বললেন, এই ভুণ্টি (বেশ দেখতে মেয়েটিকে, কিন্তু তার নাম ভুণ্টি) তুই আবার বাঁকা সিঁথি কেটেছিস্? ইস্কুলে গিয়ে এইসব বিবিয়ানা শিখছিস—ছাড়িয়ে দেবো—।

মেয়েটি থতমত খেয়ে বললো, কই না তো! দিদি তো চুল বেঁধে দিয়েছে!

আমি তাকিয়ে মেয়েটির চেহারায় কোনো বিবিয়ানার চিহ্ন দেখতে পেলুম না। ঐটুকু মেয়ের রঙীন ফ্রক পরাই উচিত ছিল, বেণী দুলিয়ে ছোটাছুটি করলেই

ওকে মানাতো বেশী, কিন্তু সে-সব বোধ হয় ওর বাবার পছন্দ নয়, মেয়েটি একটা সাদা রঙের (সুতরাং আধময়লা) শাড়ি পরা, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, আজকালকার মেয়েদের ধরনে সিঁথিটা বুঝি একটু বাঁ পাশে। বাবার সামনে ভয়ে মেয়েটির মুখ আড়ষ্ট।

অনাদিবাবু ফের বললেন, দিদি? দিদি তো সিনেমা দেখে ওসব শিখছে! দাঁড়া, আজ আসুক হারামজাদী! বলেই অনাদিবাবু ফড়াৎ করে সিকনি ঝেড়ে চেয়ারের গায়েই হাত মুছলেন। ঘেন্নায় আমার গা বমি বমি করছিল, কোনো-ক্রমে বিদায় নিয়ে ওঁর ফুল বাগানের মধ্য দিয়ে আমি ফিরে এলাম।

এ কী ধরনের সৌন্দর্যবোধ? ভাষায় রুচিজ্ঞান নেই, আচার ব্যবহার অসুন্দর অথচ ফুলের সৌন্দর্যকে ভালোবাসার কি যুক্তি? এখনো কানে ভাসে অনাদিবাবুর কথা, সব সাদা ফুলই কিন্তু একরকম সাদা নয়, বুঝলেন? রজনীগন্ধা আর গন্ধ-রাজ—এ দুটো হাতে নিয়ে দেখুন, দুটো দু রকম সাদা। পপি ফুলের ভেতরে তাকিয়ে দেখবেন, আহা, কি নরম রং!—এই অনাদিবাবুকেই দূর থেকে চিৎকার করতে শুনেছি, এই লেটো (ছেলের নাম) আবার রেডিও খুলেছিস? দিনরাত খালি গান বাজনা—হারামজাদা ছেলে, জুতিয়ে তোমার—। দুর্বোধ্য মানুষ!

এরকম মানুষ আমি আরও অনেক দেখেছি। সেজো মাসিমাকে দেখেছি, গল্প-উপন্যাস পড়ার দারুণ নেশা। রোজ লাইব্রেরী থেকে বই আনা চাই-ই। শিকার কি অ্যাডভেঞ্চার তাঁর ভালো লাগে না, তাঁর চাই শুধু প্রেমের কাহিনী। এবং সে প্রেমও ব্যর্থ হলে চলবে না। প্রায়ই আমাকে বলতেন, দূর, দূর, এ কি বই এনেছিস? এযে একেবারে বাজে বই। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা-মেয়েটার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল!—সেই সেজো মাসিমাকেই দেখেছি, কোথাও চেনা শুনো কেউ প্রেম করে বিয়ে করলেই তিনি রেগে আগুন হয়ে যেতেন! বলতেন, ছি ছি, বাবা-মার কথা একবার ভাবলো না, ছি ছি—! আমার মামাতো ভাই এম-এ পড়ার সময় ক্লাশের একটি মেয়েকে বিয়ে করলো বলে—মাসিমা সে বিয়েতে নেমন্তন্নই খেতে গেলেন না!

—এরও না হয় মানে বুঝি, কিন্তু শশাঙ্কবাবুর চরিত্রের কি মানে?

শশাঙ্কবাবু একজন প্রৌঢ় শিক্ষক, আমাদের প্রতিবেশী। জোয়ান দশাসই চেহারা, শিক্ষক হবার বদলে মিলিটারি অফিসার হলেই তাঁকে মানাতো। সকালে-দুপুরে মাস্টারী, তারপরও টিউশানি—দিনরাত অর্থোপার্জনের নেশায় কাটছে। কিন্তু ওঁরও আর একটা অদ্ভুত নেশা আছে।

বাড়ি ফেরার পথে তিনি প্রায়ই একটা কুকুর ছানা কিংবা বেড়াল ছানা নিয়ে আসেন। রাস্তার পাশে যদি দেখেন কোনো অসহায় বিড়াল ছানা কিংবা কুকুর ছানা মিউ মিউ বা কেঁউ কেঁউ করছে, তিনি জলকাদা মাখা অবস্থাতেও তাকে বুকে তুলে আনবেন। এই দুর্মূল্যের দিনেও খেয়ে ওঠার পর তিনি আট-দশটা কুকুরকে রুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ান।

অনেকে বাড়ির বেড়াল পার করার জন্য শশাঙ্কবাবুর বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে আসে। শশাঙ্কবাবু দেখতে পেলেই সে বেড়ালছানাকে বাড়িতে ডেকে নেবেন।

ওঁর পাশের বাড়ির ভদ্রলোক সস্তায় পেয়ে চারটি মুরগী কিনেছিলেন একবার, প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে খাবেন—এই মতলবে। তার মধ্যে দুটো মুরগী সকালবেলা শশাঙ্কবাবুর পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। তিনি তখন মুড়ি খাচ্ছিলেন, দুটো মুড়ি ছড়িয়ে দিলেন ওদের জন্য। সেগুলো মুহূর্তে শেষ করে মুরগী দুটো আবার মুখ তুলে চাইলো। শশাঙ্কবাবু হাসতে হাসতে ছেলে-মেয়েদের ডেকে বললেন, ত্মাখ ত্মাখ, মুরগীদুটো আমার কি রকম পোষা হয়ে গেল, হাত থেকে নিয়ে মুড়ি খাচ্ছে!

—তারপরই শশাঙ্কবাবু চলে গেলেন তাঁর প্রতিবেশীর কাছে। ও মুরগীদুটো মারা চলবে না। অনেক ঝুলোঝুলি করে তিনি সে দুটোকে কিনে নিলেন, সে দুটো তাঁর বাড়িতেই থেকে গেল। ছাগলের বাচ্চা কোলে নিয়ে শশাঙ্কবাবুকে ছুটির দিনে মর্নিং ওয়াক করতেও আমি দেখেছি। পিছনে চলেছে কুকুরের পাল।

শশাঙ্কবাবুকে কি দয়ালু লোক বলবো? ইস্কুলে ছাত্ররা ওঁর নাম দিয়েছে যমরাজ। ছেলেরা ওঁকে যমের মতই ভয় করে এবং ওঁর হাতের থাপ্পড় খায় নি—এমন ছেলে একটিও নেই। ঐ বিশাল পুরুষের হাতের থাপ্পড় যে কি ভয়াবহ, তাও অনুমান করা যায়। শুনেছি ঐ ইস্কুলের ভোজপুরী দারোয়ানকে কি যেন কারণে তিনি একবার চড় কষিয়েছিলেন, সে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পরে চাকরি ছেড়ে দেয়।

আমি শশাঙ্কবাবুর ছাত্র ছিলাম না, কিন্তু ওঁর নিষ্ঠুরতার কিছু কিছু কথা জানি। এক রবিবার সকালে আমি কোনো কারণে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথাবার্তা বলছি, এমন সময় একটা বাচ্চা ভিখারী মেয়ে ভিক্ষে চাইতে ওঁর বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। কথা থামিয়ে শশাঙ্কবাবু ক্রুদ্ধ চোখে মেয়েটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, একেবারে বারান্দার ওপর উঠে এসেছে?

অ্যাঁ ? যত রাজ্যের অজাত কুজাত ছোটলোক—একেবারে ঘরের মধ্যে, সাহস বেড়ে গেছে, না ?

বলতে বলতেই উঠে গিয়ে শশাঙ্কবাবু সেই ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মেয়েটির কান ধরে মুচড়ে দিলেন। ঐ বিশাল পুরুষের হাত এবং রোগা-পাতলা মেয়েটির কান—মেয়েটা তীব্রভাবে কেঁদে উঠলো, আর সঙ্গে সঙ্গে তার কানের গোড়া থেকে রক্ত পড়তে লাগলো। শশাঙ্কবাবু বললেন, দূর হ ! শশাঙ্কবাবুর ঘরে বারান্দায় কুকুর-বেড়াল-ছাগল-মুর্গী যথেষ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পাশেই পড়লো মেয়েটির কয়েক ফোঁটা রক্ত। আমি আবার গাঢ় লাল রং দেখতে পারি না—তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলাম, শশাঙ্কবাবুর ছোট ছেলেটিকে হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছেলেটা যখন খেতে বসেছিল, একটা কুকুর বাচ্চা এসে একেবারে ওর ভাতের থালায় মুখ দেয়। রাগের চোটে ছেলেটা, মোটে এগারো বছর বয়েস, গেলাশ ছুঁড়ে মারে কুকুরটার দিকে। কুকুরটার ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে গেছে।

বাড়ি ফিরে সমস্ত পোষা জন্তু জানোয়ারের একবার খবর নেওয়া শশাঙ্কবাবুর অভ্যেস। সেদিন ফিরে ঐ ব্যাপার দেখে তিনি ছেলেকে তুলে প্রবল আছাড় দিয়েছেন। ছেলেটা সেই থেকে রক্ত বমি করছে, বাঁচবে কিনা সন্দেহ। কী বলবো একে ? দয়া ?

৩৪

*****

মেয়েটি বলল, দেখি, আপনার হাত দেখি। হাত দেখে আমি বলে দিচ্ছি আপনি কতদিন বাঁচবেন।

আমি সকৌতুকে বললুম, তুমি হাত দেখতে জানো নাকি!

—হুঁ। খুব ভালো জানি! দেখি, হাতটা দিন, বাঁ হাত।

—কিন্তু এরকম তো কথা নয়। এটা স্বাভাবিক হচ্ছে না।

—কি স্বাভাবিক নয়?

—মেয়েরা কখনো ছেলেদের হাত দেখতে চায় নাকি? ছেলেরা তো প্রথম আলাপের কয়েকদিন পর মেয়েটির হাত দেখতে চাইবে ডান হাতখানা টেনে নিয়ে, বেশ জোরে চেপে ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকবে। বলবে না। তারপর, মেয়েটি বলবে, কই কিছু বলছেন না যে! বলুন!—তখন ছেলেটি সোজা মুখ তুলে একদৃষ্টে মেয়েটির চোখের দিকে তাকাবে এবং আস্তে আস্তে বলবে, আমি হাত দেখে কিছু বলতে জানি না, চোখ দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারি —এই রকম ভাবেই তো প্রেমের সংলাপ শুরু হয়।

মেয়েটি হাসতে হাসতে বললে, বাঃ! ছেলেদের এসব গোপন পদ্ধতি আপনি আগে থেকেই আমাকে বলে দিচ্ছেন কেন?

আমিও হাসতে হাসতে বললুম, আমি কি তোমার প্রেমে পড়তে যাচ্ছি নাকি? প্রেমে-পতনের পরই মূর্ছা। আমি শুধু তোমাকে সাবধান করে দিলুম, কোনো ছেলের মুখে এসব কথা শুনেই মূর্ছা যেও না। এটা হচ্ছে ছেলেদের একটা মুখস্থ করা টেকনিক। এখন তুমি যদি কোনো ছেলের হাত দেখতে চাও, তা হলে হয়তো সে ভাবতে পারে যে, তুমিই তার প্রেমে পড়তে চাইছো।

—আপনার নিশ্চয়ই সে ভয় নেই?

—ভয় কি বলছো, এরকম দুরাশাও নেই একটুও।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে মেয়েটি বলল, প্রেমে পড়ার জন্য ছেলেদের

আর কি কি মুখস্থ করা টেকনিক আছে বলে দিন তো। আগে থেকে সাবধান হয়ে যাবো!

—কেন, এত সাবধান হবার ইচ্ছে কেন? আঘাত পেয়েছো বুঝি?

কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটি বললো, সে কথা আর আপনাকে বলে লাভ কি? আপনার কাছে তো আর সাবধান হবার দরকার নেই! সত্যি বলুন না, আপনি হাত দেখতে জানেন!

—না। তুমিই বরং আমার হাতটা দেখে দাও তা হলে!

—আপনি হাত দেখায় বিশ্বাস করেন?

—না!

—কেন?

—বড্ড মিলে যায় যে। ঐজন্য বিশ্বাস হয় না। এক জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছিলো, আমার কিছু লেখাপড়া হবে না। সত্যিই হয় নি! একজন বলেছিল ১৪ বছর বয়সে আমি হারিয়ে যাবো, সত্যই ১৪ বছর বয়সের পর থেকে এ পর্যন্ত আমি হারিয়ে রয়েছি। বলেছিল, বিদেশে ভ্রমণের রেখা আছে—আমি যেখানে জন্মেছিলুম সে জায়গাটা এখন পাকিস্তানে—সুতরাং বিদেশে ভ্রমণ তো হয়েই গেছে। বলেছিল, হাতে একবারে টাকা পয়সা জমবে না। টাকা পয়সা হাতে আসেই না, সুতরাং জমার কথাও ওঠে না। এতগুলো সব মিলে গেলে ভাল্লাগে না! তাই মনে হয়, হাত দেখা না মাথা আর মুণ্ডু!

—আমার কিন্তু একটাও মেলে নি জানেন! আমার কুষ্ঠীতে আছে আমি ২২ বছর বয়সে বিধবা হবো। তিনজন বাঘা বাঘা জ্যোতিষীও আমার হাত দেখে সেই একই কথা বলছেন, একেবারে স্পষ্ট নাকি লেখা আছে। ঐজন্যে আমি রমেনকে বিয়ে করিনি। আর কারুকে করবোও না। আমার এখন ২৭ বছর বয়েস, তা হলে বলুন, আমার হাতের রেখা কি মিললো? কুমারী আর বিধবা কি এক?

আমি বললুম, এই স্নিগ্ধা, তুমি যে দেখছি হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছো! এতক্ষণ হাসি-ঠাট্টা হচ্ছিল বেশ। কী ব্যাপার? রমেন, কোন্ রমেন?

—ইকনমিকসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল রমেন সান্যাল, আপনার বোনের সঙ্গে এক ইয়ারেই তো পরীক্ষা দিয়েছিল।

—সে ছেলেটা এত বোকা যে এই কথা বিশ্বাস করে বিয়ে করলো না? তোমার মতন এমন একটা চমৎকার মেয়েকে—

—রমেন রাজি ছিল। রমেনের বাড়ির লোক রাজি হয়নি কিছুতেই—

আমার মতন রাক্ষসগণ মেয়েকে কিছুতেই ঘরে নিতো না। তা ছাড়া, আমিও রমেনকে বিয়ে করতে রাজি হইনি।

—কেন? তুমি এসব সিলি জিনিসে বিশ্বাস করো—

—দেখুন, রমেন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল বটে, কিন্তু ও এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে নি, খানিকটা শিভাল্‌রি দেখিয়েই রাজি হয়েছিল। তাতে আমি রাজি হই কি করে? যদি আমি মরে যেতুম, তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু আমার বিধবা হওয়া মানে তো রমেনের মরে যাওয়া, তাতে আমি কখনো রাজি হতে পারি?

—রমেন এখন কোথায়? বাইশ বছর পেরিয়ে গেছে, তার মানে তো ফাঁড়া কেটে গেছে।

—রমেন দিল্লিতে চাকরি পাবার পর ওখানে বিয়ে করেছে। ভালোই করেছে। বছরের হিসেবে ভুল হতে পারে। বাইশ বছরে না হয়ে আমার বত্রিশ বছরেও ফলে যেতে পারতো। আমি সে চান্স নিইনি। কিন্তু, এখন জ্যোতিষীদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, বিধবা আর কুমারী কি এক? আমার হস্তরেখায় বিধবা হবার কথাই আছে, কুমারী থাকার কথা তো নেই?

—তুমি এরকম একটি বোকা মেয়ে তা তো জানতুম না। এতদিন তো বেশ চালাক চতুর হাসিখুশি মেয়ে বলেই জানতুম। এরকম ভূতুড়ে বিশ্বাস নিয়ে জীবনটা নষ্ট করার কোনো মানে হয়?

—আমি যে অন্য সবার মিলে যেতে দেখেছি। রমেনের হাতে ছিল, ওর স্বাস্থ্যবতী, ভাগ্যবতী, লক্ষ্মীশ্রীময়ী বউ হবে। ও বলতো, আমিই নাকি সেই মেয়ে। কিন্তু আমি নই, রমেন অবিকল ঐ রকমই একটি মেয়েকে বিয়ে করে সুখে আছে। আমার দাদার হাত দেখে বলেছিল, বউ-এর ভাগ্যে অনেক টাকা পয়সা হবে। দাদা টি মার্চেন্ট বি চক্রবর্তী এণ্ড কোমপানির এক পার্টনারের একমাত্র মেয়েকে প্রেম করে বিয়ে করে প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছে। আমাদের বাড়ির চাকরটার হাতে ছিল, ওর এক ছেলে সর্পাঘাতে মারা যাবে। সত্যি দেশ থেকে সেই রকম চিঠি এলো।

—আরও কত লোকের মেলে নি, শুনবে? আমার কাকীমার হাতে ছিল—ওঁর তিনটি ছেলেমেয়ে হবে, তার মধ্যে বড় ছেলেটি কুলাঙ্গার হয়ে মাকে খুব কষ্ট দেবে। কাকিমার একটিও সন্তান হয় নি। আর ঐসব ব্যাপারেই হাসপাতালে অপারেশন করাতে গিয়ে তিনি মারা গেছেন। আমাদের অধ্যাপক দীনেশবাবুর হাতে ছিল, উনি ১৪ বছর রাজবন্দী থাকবেন। অথচ পুলিশ ওঁর দিকে একবারও

কৃপাদৃষ্টি দিল না। একবার শিক্ষক আন্দোলনে সত্যাগ্রহ করেছিলেন, সেবার দেড়শো শিক্ষক গ্রেপ্তার হলো, তবু পুলিশ বেছে বেছেই যেন ওঁকেই বাদ দিয়ে গেল। পুণ্যবান দীনেশবাবু গত বছর গঙ্গালাভ করেছেন পুলিশকে সম্পূর্ণ কলা দেখিয়ে। এর উল্টোও আছে, আমার পিসতুতো বোন মমতার সঙ্গে অসীমের বিয়ে হলো কতরকম কুষ্ঠী মিলিয়ে, সব পণ্ডিতেরা বললেন একবারে রাজযোটক! আশী বছরের টানা দাম্পত্যজীবন বাঁধা। দেড বছরের মধ্যে অ্যাকসিডেণ্টে মারা গেল অসীম। আরও শুনবে?

স্নিগ্ধা ম্লানভাবে হেসে বলল, না। কিন্তু আমার মধ্যে যে বদ্ধমূল ভয় ঢুকে গেছে। আমি আর কোনো ছেলের সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারি না। কেউ যদি খানিকটা এ্যাডভান্স করে, আমি নিজেকে গুটিয়ে নিই। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি কি জানেন, আমি সাদা থান পরে কাশীর গঙ্গায় স্নান করছি।

আমি ওর পিঠে একটা কিল মেরে বললুম, দূর ছাই! রমেন গেছে, এবার হেমেনকে ডাকো।

—কে হেমেন?

—হেমেন না হয় বরুণ না হয় শ্যামল, না হয় বিমল। ওদের মধ্যে কেউ যদি তোমার হাত দেখতে চায়, তুমি আগে কিছু বলবে না। সে যদি অনেকক্ষণ তোমার হাত ধরে বসে থাকে এবং কিছু কথা না বলে, এবং খানিকটা বাদে তোমার প্রশ্নের উত্তরে সে যদি বলে, সে হাত দেখতে জানে না, সে চোখ দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারে, তবে তাকে বলো, ভবিষ্যৎ বলতে হবে না। আমার শুকনো চোখের মধ্যে চোখের জল দেখতে পাচ্ছেন?

—যদি দেখতে পায়, তবে কি হবে!

—চোখে চোখে তাকিয়েই সত্যি ভবিষ্যৎ দেখা যায়। যে তোমার চোখের জল দেখতে পাবে, সে তোমার জন্য মরতেও রাজী হবে। প্রেমিকার জন্য প্রাণ দেবার ইচ্ছে না হলে সত্যিকারের ভালোবাসা কখনো জাগে না।

স্নিগ্ধা এতক্ষণ পর আবার হেসে উঠে বলল, ইস, আপনি এমন ভাবে বলছেন, যেন আপনি সব কিছু জেনে বসে আছেন! যান, ওসব বই পড়া বিদ্যে ফলাতে হবে না আমার ওপর।

৩৫

*****

হঠাৎ আমরা দেখলুম, একদল প্রাণী জল থেকে সার বেঁধে পাড়ে উঠে আসছে। দু দশটা নয়, অসংখ্য।

কাকদ্বীপের জেটিতে আমরা চারজন পা ঝুলিয়ে বসে আছি। আমরা চারজন পুরুষ বন্ধু। এখনো পুরো বিকেল হয় নি, অথচ রোদ নেই, একটু আগে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে—এখন মেঘও নেই আর, আকাশ ভরা নরম আলো। আমরা সিগারেট খেতে খেতে চারজনে জেটিতে বসে পা দোলাচ্ছিলাম।

নিচে এমন কুৎসিত কাদা যে তাকালেই গা ঘিনঘিন করে। পা থেকে জুতো হঠাৎ খুলে পড়ে গেলে, সেটাকে আবার ঐ কাদায় নেমে তুলবো কিনা এ নিয়ে গবেষণা করলুম কিছুক্ষণ। আমার পা থেকে চটি জুতো খুলে পড়ে গেলে আমি তুলতে রাজী ছিলুম না, এমনকি চশমা বা পকেট থেকে কলম পড়ে গেলেও না। অবশ্য ক্যামেরা বা ঐ ধরনের দামি জিনিস পড়ে গেলে আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়তে রাজী ছিলুম।

এখানে গঙ্গা ডায়মণ্ড হারবারের মতন সমুদ্র প্রতিম বিস্তৃত নয়। মাঝখানে চর জেগে উঠে নদীকে দুভাগ করে দিয়েছে। সেই নতুন চরে ছোট ছোট চারা গাছ ভরে আছে, আমাদের সকলেরই ইচ্ছে হলো ঐ দ্বীপের একটা কোনো নাম দিয়ে একটা উপনিবেশ পত্তন করি। আমাদের সেই স্বাধীন রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কি রকম হবে, তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

একজন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, দ্যাখ দ্যাখ! কী আশ্চর্য।

প্রথমেই সাপের কথা ভেবে আমরা চমকে উঠেছিলুম। পরে আট চোখে আমরা জলের দিকে তাকালুম। জল পেরিয়ে কাদার ওপরে কি যেন কতগুলো জীব উঠে আসছে। একটা দুটো নয়, অসংখ্য সার বেঁধে। আমরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম, জীবগুলো মাথায় ভর দিয়ে দিয়ে কাদা দিয়ে হেঁটে আসছে। কুমীর

আর কচ্ছপ ছাড়া আর তো কোনো প্রাণীর কথা শুনিনি—যারা জল থেকে উঠে পাড়েও স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারে। খুব যখন মেঘ করলে কই মাছও পাড়ে উঠে আসে জানি। এবং সে সব কই মাছ নাকি গাছেও ওঠে—শুধু গাঁজাখোররাই তাদের দেখতে পায় অবশ্য। কিন্তু এরকম সার বেঁধে শত শত প্রাণীর জল ছেড়ে মাটিতে উঠে আসার দৃশ্য কখনো কল্পনাও করিনি।

প্রাণীগুলিকে বিকট দেখতে, কিন্তু আকারে ছোট বলেই ভয়াবহ নয়। দেড় আঙুল দু' আঙুল লম্বা, ট্যাংরা মাছের মতো আকার, কিন্তু মুখ শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়, অনেকটা ভাল্লুকের মতো—এবং কোনো ল্যাজ নেই। চোখ দুটো একেবারে মাথার ওপরে। আমরা আট চোখে ব্যগ্রভাবে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম। কাদার মধ্যে সেই শত শত জলজ প্রাণী খেলা করছে, হেঁটে হেঁটে ঘুরছে। ওদের হাঁটা খুব মসৃণ নয়, মাঝে মাঝে বোকার মতো পিছলে পড়ে যাচ্ছে। কাদার মধ্যে অবশ্য পা পিছলে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু ওরা তো পা দিয়ে হাঁটছে না, হাঁটছে মাথা দিয়ে—বেশ দ্রুতগতিতে হাঁটতে চায়, অথচ যেন হাঁটা ঠিক অভ্যেস হয় নি এখনো। যেগুলো সদ্য জল থেকে উঠে আসছে সেগুলির গায়ে দেখতে পাচ্ছি শোল মাছের মতো চক্র কাটা। একটু বাদেই কাদায় ওদের চেহারা কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে।

প্রকৃতির মধ্যে কোনোরকম অসামঞ্জস্য আমাদের সহ্য হয় না। জলে পাথর ভাসা যেমন বিরক্তিকর, তেমনি জলের মাছ পাড়ে উঠে হাঁটাহাঁটি করবে, এটাও কম বিরক্তিকর নয়। এগুলো মাছ বা পোকা, তাই বা কে জানে! দেখতে মাছেরই মতো অনেকটা, কিংবা মাছ না হলেও বা কি। চিংড়ি মাছও তো মাছ নয়, পোকা। এ লবস্টার ইজ এ লেডি ফিস্—কিন্তু লবস্টার লেডিও নয়, মাছও নয়। তবু মাছ ছাড়া যার ভাত রোচে না, সেই রকম অনেকেরই সবচেয়ে প্রিয় মাছ হচ্ছে চিংড়ি।

আশপাশে কয়েকজন বেকার চাষা-ভুষো শ্রেণীর লোক ছিল। নদীর পাড়েই দু-তিনটে খড়ের ঘর—বোধ হয় সেখানকার বাসিন্দা। ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, এগুলো কী বলতে পারো?

—সেগুলো তো মাছ! না-খাওয়া মাছ।

—না-খাওয়া মাছ মানে?

—উসব মাছ লোকে খায় না। খায়ও বটে, ছোটজাতে খায়।

—তোমরা কী জাত?

—কৈবর্ত।

—ও, আচ্ছা। তা তোমরা খাও না কেন ? মাছের এমন আকাল, আর এখানে দেখলুম—এরা হাজারে হাজারে উঠে আসছে।

—ওসব নিচু জাতের মাছ ! আমরা ওদের বলি, ডাক। ডাক মাছ। কেউ বলে ডাকু মাছ !

—ডাক মাছ কেন ? ডাক নাম হলো কেন ?

—কি জানি বাবু। আমরা মুখ্যু লোক কি আর ওসব জানি ?

এ মাছের নাম আগে কখনো শুনিনি, কিন্তু 'নিচু জাতের মাছ' কথাটার মধ্যে যেন কিছুটা রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত পেলাম। অর্থাৎ এরা আর পুরোপুরি মাছ নয়, মাছের সমাজে অন্ত্যজ, মাছের বদলে স্থলজ-প্রাণী হবার দিকেই ওদের ঝোঁক। বাদুড় যেমন পাখি নয়, ওরাও তেমনি মাছ নয়।

আমরা চার বন্ধু তখন আর আকাশ দেখছি না, নদী দেখছি না, নবীন দ্বীপ দেখছি না, আমরা শুধু এক মনে কুৎসিত কাদার ওপর সেই বিকট চেহারার মাছগুলোর খেলা দেখতে লাগলুম। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার দিব্যদর্শন হলো। আমার মনে হলো, এরা আসলে টেরাডাকটিল আর ডাইনোসেরসের বংশধর। সেই যেমন একদিন জল ছেড়ে প্রাণীরা উঠে এসেছিল মাটিতে, আমাদের প্রপূর্ব পুরুষেরা, বিশাল বিশাল বৃক্ষের ছায়ায় তারা মাতামাতি করেছিল, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের শব্দ উঠেছিল, এরাও তেমনি জল ছেড়ে উঠে আসতে চাইছে। কয়েক বছর পরেই হয়তো এরা গিরগিটি বা সাপ হয়ে ডাঙায় ঘুরবে।

ডাক মাছগুলো জল থেকে উঠেই কিন্তু আর জলের কাছাকাছি থাকছে না, সরে আসছে, গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কখনো বা পরস্পর মারামারি করছে। সেই মারামারি দেখায় আমরা নতুন মজা পেয়ে গেলুম। যেগুলো খুব বাচ্চা, সেগুলো ঘুরছে নির্ভয়ে, কিন্তু সমান চেহারার দুটো জোয়ান মাছ কাছাকাছি এসেই রুখে দাঁড়াচ্ছে। জল থেকে যখন উঠে আসছে, তখন মারামারি নেই, কিন্তু স্থলের ভিতরে যত আসছে ততই মারামারি বাড়ছে। যেন স্থলভাগের অধিকার নিয়ে লড়াই। পৃথিবীতে এখনও তিন ভাগ জল—জলের অধিকার নিয়ে ঝগড়া হয় না, কিন্তু স্থলের দখল নিয়ে যুদ্ধ চলে অনবরত, এটা ওরা কত তাড়াতাড়ি শিখে যাচ্ছে।

ভারী মজার সেই যুদ্ধের দৃশ্য। দুটো ছাগলের মতো মুখোমুখি গোঁ মেরে দাঁড়িয়ে যায়, ওদের ভাল্লুকের মতো বিকট মুখটা আরও ফুলে ওঠে, বিশাল হাঁ করলে ভিতরে একটা কালো গর্ত দেখা যায়, এক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যপক্ষ বিদ্যুৎগতিতে সরে যায়।

আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম, লাগ্ লাগ্, লেগে যা! নারদ! নারদ! শাবাশ মরদ কা বাচ্চা!

কে হারবে কে জিতবে এই নিয়ে আমরা এক একজন এক একটার পক্ষ নিয়ে বাজী ধরি। কখনো বা চার পাঁচ দিকে চার পাঁচ জোড়া লড়াই করছে, কোনটাকে দেখবো, বুঝতে পারি না। ক্রমশ ওদের মধ্যে একটা তুমুল যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে একটা অন্যটাকে হারিয়ে একেবারে মেরে ফেলেছে। সেই সভ্যতাতে আদিকালে সমস্ত প্রাণীরা যেমন জল থেকে উঠে এসে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ধ্বংস হয়ে গেছে—এখানেও আমরা যেন সেই পুনরাবৃত্তি দেখতে পেলুম। জল থেকে ওরা উঠছে এক সঙ্গেই, ঝাঁক বেঁধে—তখন কোনো ঝগড়া নেই—কিন্তু কি আশ্চর্য যতই ওরা বেশী পাড়ের দিকে আসছে ততই লড়াই লাগছে। তা হলে যুদ্ধ কি এই মাটিরই দোষ?

জোয়ারের জল আস্তে আস্তে বাড়তেই লড়াই ক্রমশ থেমে যায়। হেরে যাওয়া মাছগুলো গর্তে ঢুকে যায়, কয়েকটা গুণ্ডা শ্রেণীর মাছ শুধু টহল দিতে থাকে। আমাদের তখন লড়াই দেখার নেশায় পেয়ে গেছে। আমরা আরও লড়াই বাধাবার জন্য এদের উত্তেজিত করি। হুস্ যা না, ওদিকে যা! ঐ যে ওদিকে! এই পেট-মোটা, ঐ ঘাড়-উঁচুটার কাছে যা না! ছোট ছোট ইঁটের টুকরো এনে আমরা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওদের বিব্রত করার চেষ্টা করি। কিন্তু হঠাৎ মাছগুলো যেন উদাসীন হয়ে যায়। যেমন হঠাৎ লড়াই আরম্ভ হয়েছিল, তেমন হঠাৎই আবার থেমে যায়। যেন বিকেলের এইটুকু সময় ওদের খেলাধুলো বা কুস্তি করার সময়। কিংবা হয়তো ওরা জেনে গেছে, জোয়ারে একটু পরে এই কাদা জমি সবটুকুই ডুবে যাবে, সুতরাং জমির অধিকার নিয়ে আর মারামারি করে লাভ নেই।

কিন্তু মারামারি থেমে যাওয়া আমাদের একটুও পছন্দ হলো না। আমরা চারজন ছুটোছুটি করে বড় বড় ইঁটের টুকরো খুঁজে নিয়ে এসে অজানা আক্রোশে ওদের দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগলুম। ওদের গায়ে সহজে লাগে না, বা নরম কাদায় আছে বলে ইঁট লাগলেও ওদের আঘাত লাগে না। কিন্তু আমরা তখন হিংস্র হয়ে উঠেছি। ইঁট ফুরিয়ে যেতেই রাস্তা থেকেই খোয়া ভেঙে নিয়ে আসতে লাগলুম।

এমন সময় দূরে একটা গণ্ডগোল শোনা যায়। একটু দূরের খড়ের ঘরগুলোর পাশ থেকেই উত্তেজিত চিৎকার আর গালাগালির আওয়াজ। এক বন্ধু খুশিতে উদ্ভাসিত মুখে বললে, ওখানে মারামারি হচ্ছে, চল দেখতে যাই।

হাতের ইঁট ফেলে দিয়ে আমরা সেদিকে ছুটলাম। ওখানে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেছে। দুপক্ষেই দু-তিনটি স্ত্রীলোক আর দু-তিনটে রোগা চেহারার পুরুষ, মুখে অকথ্য গালাগালি আর হাতে বাঁশের কঞ্চি। আন্দাজে বুঝলুম, এ বাড়ির বাচ্চা ছেলেকে ওবাড়ির বাচ্চা ছেলে মেরেছে, এই নিয়ে ঝগড়া শুরু, তারপর পারিবারিক কুৎসায় নেমে এসেছে। দূরে দাঁড়িয়ে আমরা বেশ উপভোগ করতে লাগলুম। একটু পরে যখন সত্যিই হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল, তখন হাসি-মুখে আমরা চার বন্ধু পরস্পর চোখ টিপলুম। অর্থাৎ কোনপক্ষ জিতবে, কোনপক্ষ হারবে, এসো তাই নিয়ে বাজি ধরা যাক!

৩৬

*****

বই কেনার বদলে—আমি নতুন বন্ধুর সংখ্যা বাড়িয়ে চলি অনবরত। ফলাফল একই। নতুন বই কেনার মতন যদি যথেষ্ট অতিরিক্ত টাকা-পয়সা না থাকে, তবে নিত্যনতুন বন্ধুর কাছ থেকে দু'একখানা করে বই হস্তান্তরিত করার সুযোগ পাওয়া যায়ই। অবশ্য, সামান্য ছোট অসুবিধে এতে মাঝে মাঝে হয়, যখন সদ্য নতুন কোনো বন্ধুর কাছ থেকে সবেমাত্র দু-দিনের করারে একটি বই চেয়ে নিয়েছি, তখনই যদি কোনো পুরোনো দাগী বন্ধু এসে হাজির হয়ে বলে, কি রে, আমার অমুক বইটা ফেরত দিলি না? এই নিয়ে তুই আমার একুশখানা বই··· ইত্যাদি। সেই সমস্ত অস্বস্তিকর অবস্থা কাটাবার জন্য একটা কিছু তাৎক্ষণিক উপায় খুঁজে নিতে হয়।

অপরের বই চেয়ে এনে ফেরত না-দেবার ব্যাপারে আমার কোনো গ্লানি নেই। কারণ, এই সার সত্য আমি জেনে ফেলেছি, প্রত্যেক বই-এরই একটা নির্দিষ্ট আয়ু আছে। লক্ষ্মীর মতই, বই জিনিসটাও বেশ চঞ্চল, সে কখনো এক লোকের বাড়িতে বেশীদিন থাকতে চায় না। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা লোকের নাম লেখা বইও আছে আমার বাড়িতে, সেগুলো কি করে যে এলো তা, আমি বিন্দুমাত্র জানি না।

আবার নতুন আলাপ হওয়া কোনো লোকের বাড়িতে প্রথম দিন গিয়েই আমি দেখতে পেয়েছি আমার নাম লেখা বই আলমারিতে বিরাজমান। এই রকমই নিয়ম।

কিন্তু চেয়ে আনা বই সাধারণত একটু পুরোনো হয়। অথচ, নতুন টাটকা বই হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে, গন্ধ শুঁকতে আমার ভালো লাগে। এজন্য বইয়ের দোকানে ঘোরাঘুরি করার স্বভাব হয়ে গেছে আমার। আমার এক বন্ধু স্টলে দাঁড়িয়েই সাপ্তাহিক পত্রিকার ধারাবাহিক উপন্যাসগুলো পড়ে ফেলে

নিয়মিত। আমি কোনো বড় দোকানে ঢুকে দশ-বারখানা নতুন বই নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর একটা দুষ্প্রাপ্য বই চেয়ে বসি। সেটা না পেয়ে, খুবই দুঃখিত হবার ভান করে দোকান ছেড়ে চলে আসি।

বই কেনা না হলেও, বইয়ের দোকানে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন সব টুকরো সংলাপ বা দৃশ্য শুনতে বা দেখতে পাই, তার তুলনা অন্য জায়গায় পাওয়া যায় না।

যেমন, একদিন দেখেছিলাম, একটি তন্বী যুবতীর সঙ্গে একটি ছিপছিপে চেহারার যুবক এলো দোকানে। তন্বীটি কিছুটা চঞ্চলা, তা ছাড়া সিল্কের শাড়ি পরেছে বলে সমস্ত শরীরময় চঞ্চলতা, যুবকটি সে তুলনায় বেশ ধীর। কিছু বই উল্টেপাল্টে দেখার পর, যুবকটি বললো, তোমাকে আজ একটা কবিতার বই কিনে দিই।

—ধুৎ! কবিতা!—এই কথাটা বলে যুবতী এমন একটা বিদ্রূপের ভঙ্গি তুললো ঠোঁটে যে, আড়চোখে সেদিকে তাকিয়ে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

অসীম অবজ্ঞার সঙ্গে ওল্টানো সেই স্ফুরিত অধরে এমন একটা সৌন্দর্য ছিল, যার তুলনায় পৃথিবীর সব কবিতাই তুচ্ছ, (সেই মুহূর্তে)। বস্তুত, কোনো মেয়ের মুখে অমন নিখুঁতভাবে কবিতার সমালোচনা, আমি এর আগে বা পরে আর শুনিনি। দেখিনি বলাই বেশী সঙ্গত।

শেষ পর্যন্ত সেই যুবতীটি কি বই নিলেন—তা অবশ্য বলাই বাহুল্য। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, যদি বুঝতে না পেরেও থাকেন, তবু আমি বলব না।

আর একদিন, একটি যুবতী একা এসেছেন। মাথায় সিঁদুর দেখলেই মনে হয়, নতুন কয়েক মাস মাত্র বিয়ে হয়েছে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিনি বললেন, আচ্ছা, ইয়ে, মানে ইয়ের সেকেণ্ড পার্টটা আছে?

দোকানের একজন কর্মচারী বললেন, কোন্ বইটার সেকেণ্ড পার্ট?

—ইয়ে, মানে ঐ যে সেকেণ্ড পার্ট।

—কোন্ বইয়ের?

যুবতীর মুখ নম্র লজ্জায় ভরে গেল। অপর একজন কর্মচারী বললেন, ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। তিনি ভিতর থেকে একটা বই এনে দেখিয়ে বললেন, এইটা তো?

মেয়েটি সম্মতি জানিয়ে মুখ নিচু করলেন। তারপর নিচু মুখ করেই হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে টাকা বার করতে অনেকটা সময় লাগল। মেয়েটি বই নিয়ে বেরিয়ে যেতেই, একজন কর্মচারী অপরজনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুই কি করে বুঝলি—

এই বইটারই সেকেণ্ড পার্ট চেয়েছিল? অপরজন মুচকি হেসে বললেন, মুখ দেখেই বুঝতে হয়। মাথায় নতুন সিঁদুর, মুখে লজ্জা—সেকেণ্ড পার্টেই তো সন্তান পালন বিষয়—

আর একটি দোকানে—সে দোকানে ইংরিজী-বাংলা সব রকম বই-ই পাওয়া যায়। একজন মধ্যবয়স্ক লোক ঢুকে জিজ্ঞেস করল আপনাদের কাছে পিকুইক পেপার্স আছে? দোকানের কর্মচারী উদাসীন ভঙ্গি করে বললো, আমহার্স্ট স্ট্রীটের কাছে ভোলানাথ কিংবা অন্য কাগজের দোকানগুলোয় খোঁজ করুন। এটা বইয়ের দোকান!

—পূরবী আছে? সেদিন দোকানে অনেক ভিড়, আমিও সেদিন, যা থাকে কপালে আজ একটা কিনেই ফেলবো—এই রকম ঠিক করে ফেলে বহু বই ঘাঁটাঘাঁটি করার সুযোগ নিচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে। দোকানে আমাকে বাদ দিয়েও চার-পাঁচজন, কাউণ্টারের এক কোণে একটি পূর্ণ উদ্ভাসিত যুবতী নানা বই দেখছে খুব মনোযোগ দিয়ে, আমার ডান পাশে একটি যুবক রবীন্দ্রনাথের বই দেখছিলেন। হঠাৎ যুবকটি জিজ্ঞেস করলেন, পূরবী আছে?

দোকানের কর্মচারী একটু ইতস্তত করে বললেন, না, ক্ষণিকা কিংবা পলাতকা আছে, দেবো!

—কেন, পূরবী নেই?

কর্মচারীটি আরও ইতস্তত করে বললেন, না, মানে—

—আমার যে পূরবীই দরকার!

কর্মচারীটির মুখখানা কাতর হয়ে এল। যুবকটি বিরক্তভাবে দোকান ত্যাগ করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি যুবক ঢুকে বললেন, ইস্, পূরবী, তোমাকে অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বড্ড দেরি হয়ে গেল—

কাউণ্টারের কোণে দাঁড়িয়ে রূপসী যুবতীটি এবার মুখ তুলে চাপা কৌতুকে দোকানের কর্মচারীকে বললেন, একেও বলে দিন না, পূরবী নেই। বলে দিন, এখন শুধু ক্ষণিকা কিংবা পলাতকা আছে!

এফ্ স্কট ফিটজেরাল্ডদের সঙ্গেও দেখা হয় কলেজ স্ট্রীট পাড়ায়। একজন বৃদ্ধ লোককে দেখলুম একদিন, এককালে খুব লম্বা ও স্বাস্থ্যবান ছিলেন বলা যায়, এখন কিছুটা ন্যুব্জ ও শীর্ণ চেহারার, মাথার চুল ধপধপে সাদা। চোখে পুরু চশমা। বললেন, অমুক বইটা আছে?

—না, আমাদের কাছে নেই।

—আর পাওয়া যায় না?

—যায়, হয়তো। আমরা রাখি না। কেউ চায় না আজকাল।

—কেউ চায় না, না ?

বৃদ্ধ নিচু গলায় আপন মনেই বললেন, বইটা আমারই লেখা। আজকাল আর কেউ পড়তে চায় না, না ? এক সময় কিন্তু অনেকে চাইতো। 'ভারতবর্ষে' আমার বই বেরিয়েছে ধারাবাহিক, শরৎবাবু প্রশংসা করেছিলেন। এখন কেউ পড়তে চায় না! শরৎবাবুর বই তো এখনো পড়ে!

আমি পরে বইটি খুঁজে নিয়ে পড়ে দেখেছিলাম। সত্যই বইটির এক সময় খুব চাহিদা ছিল, উনিশ শো তিরিশ সালে বইটির চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত বেরিয়েছিল।

এরই বিপরীত ধরনের আর একটি লোককে দেখেছিলাম—কোনদিনও ভুলবো না তাকে। একটি বইয়ের দোকানের এক কোণে একটি মলিন পোশাক-পরা প্রৌঢ় বার বার জিজ্ঞেস করছেন, কী চাই আপনার ? লোকটি হাত তুলে প্রতীক্ষার ভঙ্গিতে বলছিলেন পরে পরে আগে একটু ফাঁকা হোক !

লোকটির পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে কেড্‌স্ জুতো। হাতে একটি মোটা ফাইল। লোকটি নির্বিকার হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বহুক্ষণ প্রায়। একটু ক্রেতার ভিড় হালকা হতে তিনি বললেন, আমি একটা পাণ্ডুলিপি এনেছি। আপনারা যদি প্রকাশ করেন—

দোকানের কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মাপ করবেন, আমরা নতুন লেখকের বই ছাপি না।

লোকটি সামান্য হেসে উত্তর দিলেন, হুঃ আমি তো আর নতুন লেখক নই। এই বয়সে কি আর নতুন করে লেখা শুরু করা যায় ? আমি ইতিপূর্বে সাতখানি গ্রন্থ লিখেছি। ন্যগ্রোধন্যায়ের টীকা, বাসুদেব চরিত, দক্ষযজ্ঞের গূঢ় কথা···

—ছাপা হয়েছে সেসব বই ?

—না, এখনো একটিও ছাপা হয় নি। এবার একটি একটি করে ছাপা শুরু করব। আমার শ্রেষ্ঠ বইটিই এনেছি। আপনাদের জন্য।

—মাপ করবেন, ওসব বই আমরা ছাপি না।

—আহা, কি সব বই বুঝলেন কি করে ? এখনো তো পড়েনইনি! আমার এই গ্রন্থটির নাম 'অন্তরীক্ষ রহস্য'। চোখে দেখা জগতের বাইরে যে বিশাল জগৎ—সে সম্পর্কে আমার দীর্ঘজীবনের যে উপলব্ধি, তাই লিখেছি। ছাপালে প্রায় চার শো কি পাঁচশো পাতা হবে। এই গ্রন্থ পড়ে মানুষ অন্তর্জীবনে শান্তি পাবে।

—ওসব জ্ঞানের কথা আর কে আজকাল পড়তে চায় ? আপনি অন্য জায়গায় দেখুন।

—অন্য কোন্ প্রকাশালয় এই প্রকার গ্রন্থ ছাপান?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চান, তবে বলে দিচ্ছি কেউ ছাপবে না। ওসব পণ্ডিতি বই নিজের খরচেই ছাপান আজকাল সবাই। বছরে দশখানা বিক্রি হয় কি না হয়।

—না, না, এ সেই প্রকার বই নয়! এতে একটিও হাল্কা কথা নেই! প্রমাণ এবং বুৎপত্তি ব্যতীত একটি কথাও লিখিনি। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, আমি এসব বই ছাপার ব্যয় কি করে সঙ্কুলান করবো? আপনারা পড়ে দেখুন!

—পড়ে দেখে আমরা কি করবো? বললুম তো।

—আহা পড়েই দেখুন না, বইতে যদি কোনো ভুল থাকে, তথ্যের কোনো দোষ থাকে, তা হলে আমি ছাপার জন্য মোটেই পীড়াপীড়ি করবো না। পড়ে দেখুন আগে।

—বলছি তো, আমাদের পড়ে কোনো লাভ নেই। এসব বই চলে না, আমরা ছাপতে পারবো না।

—পড়বেনও না?

—না। মাপ করবেন! আচ্ছা নমস্কার।

বৃদ্ধটি রক্তহীন মুখে আবার বললেন, পড়েও দেখবেন না? দীর্ঘ সাত বৎসরের পরিশ্রমে লিখেছি, তা শুধু একবার পড়ে দেখতেও আপত্তি! সাত বছর দিন-রাত্রি খেটে যা লিখেছি—তা সবই ব্যর্থ? আমার মধ্যম কন্যা সম্পূর্ণ বইটা কপি করে দিয়েছে, মুক্তোর মতন তার হস্তাক্ষর, সে লেখা পড়ে দেখতেও আপত্তি! থাক্,···আচ্ছা, এক গ্লাস জল খাওয়াবেন?

দোকান থেকে ওঁকে এক গ্লাস জল দেওয়া হলো। প্রৌঢ়টি লোভীর মতন সমস্ত জল যেন গেলাস শুষে খেয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ফাইলের দড়ি বাঁধতে লাগলেন আবার। বিড়বিড় করে কি যেন বলতে লাগলেন, আর শোনা গেল না। ফাইল বাঁধা হলে সেটা হাতে নিয়ে দোকান ছেড়ে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। হঠাৎ ফাইলটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। শশব্যস্তে ঝুঁকে পড়ে ফাইলটি কুড়িয়ে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে লাগলেন। আদর করার মতো আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে ধুলো ঝাড়ছিলেন তিনি। সেই সময় আমি তাঁর মুখের দিকে আবার তাকালুম।

সে রকম অপমান ও দুঃখে কুঁকড়ে-ওঠা মুখ একবার দেখলে এক-জীবনে আর ভোলা যায় না।

৩৭

✵✵✵✵✵

আমাদের ইস্কুলের থিয়েটারে যে ছেলেটা প্রতাপাদিত্যের পাট করেছিল, তার সঙ্গে এখনো আমার প্রায়ই দেখা হয়।

ক্লাস টেনে উঠে সেবার আমরা এমন থিয়েটার করেছিলাম যে, মাস্টারমশাইরা নাকি তার স্মৃতি এখনো ভোলেন নি। এখনো ক্লাসে পড়াতে পড়াতে তাঁরা বলেন, হ্যা, নাইনটিন ফিফ্‌টির ব্যাচের ছেলেরা ছিল বটে সত্যিকারের, যেমন পড়াশুনায়, তেমন অন্যান্য অ্যাকটিভিটিতে।

শিক্ষামন্ত্রীর ভাই-পো পড়তো আমাদের ক্লাসে, সুতরাং স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী আমাদের থিয়েটারে চিফ গেস্ট হয়েছিলেন, প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় বিশ্বনাথ এমন মার-মার কাট-কাট অভিনয় করেছিল যে, হাততালির পর হাততালি এবং দু'খানা পদক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল ওর নামে।

আমি অবশ্য ভিড়ের দৃশ্যে একবার মাত্র মঞ্চে এসে কোরাসে 'জয় মহারাজের জয়' এইটুকু মাত্র বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু ঐ ভিড়ের দৃশ্যের সামান্য পাট পেয়েই আমি খুশী, কারণ অভিনয়ের শেষে যখন গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিল, তাতে তো আমিও দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম, এবং ঠেলেঠুলে এসে দাঁড়িয়েছিলাম একেবারে শিক্ষামন্ত্রীর পাশেই।

বিশ্বনাথ আমাদের ক্লাসেও হিরো হয়ে রইলো। পড়াশুনোয় তেমন ভালো ছিল না, কিন্তু চেহারাখানা ছিল সুন্দর, ফর্সা রং, কোঁকড়ানো চুল, কথা বলার সময় বেশ গলা কাঁপাতে পারতো। শিক্ষামন্ত্রী ওর কাঁধ চাপড়ে প্রশংসা করেছিলেন বলে মাস্টারমশাইরাও বিশ্বনাথকে বেশ সমীহ করে চলতেন।

ফার্স্টবয় সুপ্রকাশের বাড়িতে আমাদের ক্লাব ছিল, বিকেলে সেখানে আমরা জড়ো হতুম, সুপ্রকাশের বোন শিবানী আমাদের তেমন গ্রাহ্যই করতো না বটে, কিন্তু বিশ্বনাথকে বলতো, বিশুদা। একদিন বিশ্বনাথ একটা নীল কাগজ দেখিয়ে আমাকে বলেছিল, এটা কি জানিস? লাভ লেটার।

আমি বললুম, দেখি, দেখি, কে লিখেছে? বিশ্বনাথ ছোঁ মেরে কাগজটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পকেটে ভরলো।

আমি বললুম, কে লিখেছে বল্ না। বিশ্বনাথ এমনভাবে চোখ টিপলো, যার মানে হয়, শিবানী। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলাম।

পুজোর ছুটির পরও আর একটা থিয়েটার করার জন্য বিশ্বনাথের খুব উৎসাহ ছিল। কিন্তু তখন সামনেই টেস্ট পরীক্ষা বলে মাস্টারমশাইরা রাজী হলেন না।

টেস্টে কোনোরকমে অ্যালাওড হলেও ফাইন্যালে বিশ্বনাথ পাস করলো না।

তারপর আমরা আলাদা আলাদা কলেজে ছিটকে গেলুম। ইস্কুলের বন্ধুদের অনেকের সঙ্গেই আর যোগাযোগ রইলো না। প্রথম কয়েক বছর ইস্কুলের কোনো বন্ধুর সঙ্গে পথে ঘাটে দেখা হলে বিষম আনন্দ হতো, পুরোনো গল্প, ক্লাসে কে কবে কি ইয়ার্কি করেছিল সেইসব।—তারপর যথা নিয়মে, কারুর সঙ্গে দেখা হলে, কী খবর, ভালো তো, আচ্ছা চলি।

আমি আর সুপ্রকাশ এক কলেজে পড়তুম, আমাদের বন্ধুত্ব টিকে গেল, শিবানীও আমাকে ওর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নীলুদা বলেই ডাকতো এবং লাভ লেটার না লিখলেও একদিন আমার সঙ্গে একা সিনেমায় গিয়েছিল। বিশ্বনাথ দ্বিতীয়বার ম্যাট্রিক ফেল করে পড়া ছেড়ে দেয়।

একদিন সুপ্রকাশ আর আমি আসছি, পথে বিশ্বনাথের সঙ্গে দেখা। সুপ্রকাশ বললো, এই যে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, কেমন আছেন?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কি রে বিশে, কেমন আছিস্?

বিশ্বনাথ একটু লাজুকভাবে হাসলো। কি রকম একটা তফাত তৈরি হয়ে গেছে। স্কুলে পড়ার সময় বেশ একটা আত্মবিশ্বাস এবং অহংকার ছিল ওর, আমাদের সঙ্গে কথা বলতো বেশ একটু উঁচু থেকে। এখন ও ম্যাট্রিকে ফেল করেছে এবং আমরা থার্ড ইয়ারে পড়ি—শুধু এইজন্যই ওর মুখে একটা হীনমন্য লজ্জা ফুটে উঠেছে। তবু খানিকটা জোর করে হেসে বললো, আর ভাই আমার লেখাপড়া ধৈর্যে কুলোলো না। চাকরিতে ঢুকে গেলুম।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কী চাকরি করছিস্ রে? খাওয়া আমাদের—

—বাবার বন্ধুর এক চায়ের কোম্পানি আছে। সেখানে বসছি। কি খাবি চল না।

বছরখানেক পর বিশ্বনাথের সঙ্গে আবার দেখা। পোশাক ও মুখ খানিকটা মলিন। হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ। বেশ শৌখিন ছেলে ছিল বিশ্বনাথ,

ইস্কুলে পড়ার সময়ে ওর পকেটে চিরুনী থাকতো, রুমালে সেণ্টের গন্ধ পেতুম। জিজ্ঞেস করলুম, কি রে বিশে? কি খবর?

ও বললো, আর ভাই বলিস্ না। ভাগ্যটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বাবা মারা গেলেন, সেই চায়ের কোম্পানিটাও উঠে গেল। পরীক্ষায় গাড্ডু মারলুম, এখন আবার গাড্ডায় পড়েছি।

—কী করছিস্ এখন?

—তুই একটা লাইফ ইন্‌সিওর করবি? আমি ইনসিওরেন্সের এজেন্সি নিয়েছি।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, আমার আবার লাইফের দাম কিরে যে তার আবার ইন্‌সিওর করাবো? তা তুই সিনেমা কিংবা থিয়েটারে ঢুকলি না কেন?

দূর, দূর. ধরাধরি ছাড়া ওসব লাইনে ঢোকা যায় না। ঘোরাঘুরি করেছিলুম কিছুদিন। আমি নাকি বেঁটে, তাই ওদের পছন্দ হয় না। পাড়ার ক্লাবে অবশ্য এখনও থিয়েটার করছি!

তাকিয়ে দেখলুম, সত্যিই, স্কুলে পড়ার সময় বেশ সুদর্শন ছিল বিশ্বনাথ. কিন্তু তারপর আর লম্বা হয় নি। কি রকম যেন চ্যাপ্টা ধরনের চেহারা হয়ে গেছে। আমি বললুম, জানিস্, গত মাসে শিবানীর বিয়ে হয়ে গেল—আমাদেরই কলেজের এক প্রফেসারের সঙ্গে—

চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিশ্বনাথ বললো, তাই নাকি? ভালোই তো—আমিও একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি, শিবানীর চেয়ে ঢের সুন্দরী।

তারপর এই পনেরো-ষোলো বছরে কত কি বদলে গেল। সবচেয়ে বেশী বদলালো বিশ্বনাথ। ওর উপর যেন শনির কু-দৃষ্টি পড়েছিল, ক্রমশ ও নিচে নামতে লাগলো। জরির পোশাক ও পালকের মুকুট পরা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভূমিকায় দেখেছিলাম ওকে, ভিড়ের দৃশ্যের মধ্যে থেকে আমি ওর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিলাম! অথচ, ওর সঙ্গে আমার দেখা হলেই আজকার ওর মুখখানা কাঁচুমাঁচু হয়ে যায়, দু'একটা কথা বলেই সরে পড়ে। আর দেখাও হয়! কলকাতা শহরটাই এমন—যার সঙ্গে দেখা হওয়া খুবই দরকার, তার সঙ্গে পথে-ঘাটে হঠাৎ কিছুতেই দেখা হবে না। আর যার সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনো দরকার নেই, দেখা হলেই বরং অস্বস্তি, সেই পাওনাদার কিংবা ইস্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখা হবেই।

কখনো বিশ্বনাথকে দেখি বইয়ের ক্যানভ্যাসার হয়েছে। ও বললে, ধুৎ, বড় লোকেদের সঙ্গে চেনাশুনো না থাকলে ইনসিওরেন্সের এজেন্সিতে কোনো

লাভ নেই। শুধু শুধু মান নষ্ট! তার চেয়ে এই বইয়ের ব্যবসা ধরেছি, অনেক সম্মানজনক! এর মধ্যে আবার বিয়ে করে মুশকিলে পড়ে গেছি এখন!—কখনো ওকে দেখি বাড়ির দালাল হিসেবে, কখনো কোনো কোম্পানির বিল কালেক্টর।

হাতিবাগান বাজারে পাখির খাঁচা কিনতে গিয়েছিলাম। রবিবারের বাজারে বেশ ভিড়, অনেকক্ষণ ধরে পছন্দটছন্দ করার পর, দোকানদারকে দাম দিতে গিয়ে দেখি, বিশ্বনাথ। আমাকে ও প্রথমে লক্ষ্যই করে নি, আমি বললুম, কি রে বিশে!

আমাকে দেখে ওর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলুম, কবে এই দোকান করলি? ও বললো, দাঁড়া, এই খদ্দেরদের একটু ছেড়ে দিই। তুই এই টুলটায় বোস্ না। চা খাবি?

ময়লা ধুতি ও ফতুয়া পরে আছে। কত বদলে গেছে ওর চেহারা। সবচেয়ে বদলেছে ওর মুখ। জীবিকার যত নিচু স্তরে ও নেমেছে, ততই ওর মুখে একটার পর একটা পর্দা পড়েছে, কি রকম তেল-তেলে, অকিঞ্চিৎকর, যে-কোনো মানুষের মতন মুখ, তাতে খানিকটা দীনতা ও লজ্জা মেশানো। ছেলেবেলার সেই অহংকার একটুও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ও বললো, শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ব্যবসা শুরু করলুম। দেখলুম ওসব উঞ্ছবৃত্তি করে কোনো সুরাহা হয় না। তোরা হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পাবি—

আমি বললুম, পাগলের মতন কথা বলছিস্ কেন? দোকান করেছিস তাতে লজ্জার কি আছে?

নিচু গলায় বিশ্বনাথ বললো, হ্যাঁ রে শিবানীর কোন্ পাড়ায় বিয়ে হয়েছে রে? ও যদি কখনো এখানে আসে, আমার সত্যি লজ্জা করবে।

আমি বললাম, ধ্যাৎ, তোর ওসব ছেলেমানুষী এখনো আছে। জীবন যাকে যেটুকু দিয়েছে—এর মধ্যে লজ্জার কি আছে? বেঁচে থাকাটাই সবচেয়ে বড় কথা। তুই তো কিছু অসম্মানের কাজ করছিস্ না!

বিশ্বনাথ যদি উল্টে আমাকে প্রশ্ন করতো, তুই নিজে যদি এ অবস্থায় পড়তিস, তা হলেও কি এসব বড় বড় কথা বলতে পারতিস? কিন্তু এরকম প্রশ্ন করার সাহসও ওর আর নেই।

বরং ও আমার খাঁচার দাম নিতে চাইলো না—এও আরেক দীনতা, গলার আওয়াজ মিনমিনে করে ও বন্ধুত্ব দেখিয়ে আমার সমান হতে চাইলো। আমি জোর করে ওকে টাকা গুঁজে দিয়ে চলে এলাম।

সরস্বতী পুজোর সময় হাতিবাগান বাজারে ধুমধাম করে উৎসব হয়। দোকান কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে সিরাজদ্দৌলা নাটক হচ্ছে, এত ভিড় যে রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ হবার উপক্রম। কি এক অজানা কৌতূহলে আমি ভিড় ঠেলে একবার নাটক দেখার জন্য উঁকি দিলাম—স্বয়ং সিরাজদ্দৌলার ভূমিকায় অভিনয় করছে বিশ্বনাথ। জরির পোশাক, মাথায় পালকের মুকুট। কি অহংকারী মুখ এখন বিশ্বনাথের, কি তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর, সমস্ত মঞ্চ জুড়ে দর্পিত পদ-ভারে ও ঘুরছে। ঘন ঘন হাততালি। দেখে আমার এমন ভালো লাগলো!

মানুষের কোথাও না কোথাও একটা মহিমার আশ্রয় আছে। এই কয়েক ঘণ্টার জন্য বিশ্বনাথ অপরিমিত সুখী। মুখের পর্দা সরে গেছে, গলার আওয়াজে ফিরে এসেছে আত্মবিশ্বাস। আমি আগেও ভিড়ের দৃশ্যে ছিলুম, এখনো ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম।

৩৮

*****

চৌরাস্তার মোড়ে মেজোমামার সঙ্গে দেখা। চোখাচোখি হতেই উনি নিঃশব্দে দাঁড়ালেন। কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়েই রইলেন। যেন কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি একটু আগে বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিলুম যে-গলায়, এখন সেই কণ্ঠস্বর বদলে কৃতার্থ স্নেহভাজনের মতো নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করলুম, কেমন আছেন মেজোমামা? বাড়ির সবাই ভালো আছেন?

উনি সংক্ষিপ্তভাবে বললেন, হ্যাঁ। যেন কিছু একটার প্রতীক্ষা করছেন। আমি তো জানি কিসের প্রতীক্ষা, কিন্তু না-বোঝার ভান করে দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখা যাক না, কি হয়।

কি রকম বিসদৃশ্য, রাস্তার মাঝখানে দুজনে দাঁড়িয়ে আছি, কোনো কথা নেই। মেজোমামার মুখে প্রতীক্ষা, আমার মুখে কিছুই না। ব্যাপারটা যখন সত্যিই বিসদৃশ হয়ে এলো, তখন মেজোমামা চলার ভঙ্গি করে ঈষৎ অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, এবার বিজয়ার পর বাড়িতে এলি না? নাকি তোরা ও সব প্রণাম-ট্রনামের পাট তুলে দিয়েছিস?

একটু আগেই পুরোনো ইস্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিতমশাইকে দেখে পথের ওপরেই ঢিপ করে প্রণাম করেছি। এখনো মেজোমামার কাছে ও কাজটা চট করে সেরে নিতে পারতুম। কিন্তু আমি খুব বিনীতভাবে বললুম, না, প্রণাম করতে আমার খুবই ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি সবাইকে প্রণাম করি না।

মেজোমামা বোধহয় আমার কথাটা ভালো করে শুনতে পান নি, থেমে গিয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন, বাবাকেও তো প্রণাম করতে যাস নি।

—ঐ যে বললুম, আমি আর আজকাল সবাইকে প্রণাম করি না!

—কি?

মেজোমামা থমকে গিয়ে বিষম অবাক হয়ে তাকালেন। ব্যাপারটা বোধহয়

বিশ্বাসই করতে পারলেন না। কতদিন উনি আমার ঘুড়ি ওড়াবার জন্য পয়সা দিয়েছেন, একবার সঙ্গে করে পুরীতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন আমায়, আমার চাকরির জন্য তিন জায়গায় চেষ্টা করেছেন…সেই কৃপাধন্য আমি হঠাৎ ওঁকে অপমান করার চেষ্টা করবো, উনি যেন বিশ্বাসই করতে পারেন না। অত্যন্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেন আমি প্রণাম করতে পারছি না এই রকম অসহায় আমার মুখের চেহারা। খুবই লাজুকভাবে মাথা নিচু করে হাতের নোখ খুঁটতে খুঁটতে আমি বললুম, আপনারা কেউ আমার ছোটকাকার বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে আসেন-নি তো, সেইজন্য আমি আপনাদের প্রণাম করবো না ঠিক করেছি।

—রমেশের বিয়েতে যাইনি তার সঙ্গে তোর কি সম্পর্ক।

—ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয় নি। আমার ছোটকাকা তাঁর অধ্যাপকের মেয়েকে বিয়ে করেছেন, অন্য জাত, তাই আপনারা আসেন নি!

—তোর পছন্দ-অপছন্দে কি আসে যায়!

—কিছু আসে যায় না! কিন্তু কাকে আমি প্রণাম করবো না করবো তা তো আমিই ঠিক করেছি। যাঁদের ব্যবহার আমার কাছে অশ্রদ্ধেয় মনে হবে, তাঁদের আমি প্রণাম করবো না।

—জাত না মেনে বিয়ে করাটা বুঝি খুব শ্রদ্ধার কাজ?

আমি অবাক হয়ে বললুম, জাত তো আলাদা নয়! সবাই-তো হিন্দু। এক সময় এদের আলাদা আলাদা বর্ণ বলা হতো বটে!

—ও সব তোরা না মানলে কি হয়, সংস্কার ছাড়া এত সহজ নয়। বাবার অমত ছিল বলেই আমরা যাইনি। বাবা বুড়ো মানুষ—

—আপনার বাবা কত বুড়ো? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চেয়েও বয়স বেশী? না, না, আমি এমন অসম্ভব কথা বলছি না যে, বিদ্যাসাগরের আদর্শ সবাই মেনে নেবে—দেশের ব্যবস্থা এমন হয়েছে। কিন্তু আপনার বাবা অর্থাৎ আমার দাদা-মশাই গবেষণা করে তিনটে ইউনিভার্সিটির ডক্টরেট পেয়েছেন। কলম্বোতে বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন একসময়। তিনিও এসব যদি না বোঝেন, তবে সাধারণ লোকে কি করে বুঝবে বলুন? কারুকে না কারুকে তো এ-সব বাজে সংস্কারগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে! দাদামশাই কি জানেন না যে বাংলাদেশের এ-সব জাতফাতের ব্যাপারগুলো একবারে ভুয়ো! এক সময় যে-যা পেরেছে নামের সঙ্গে ইচ্ছে মতন পদবী জুড়ে দিয়েছে।

—বাজে বক্‌বক্‌ করিস না! খুব পণ্ডিত হয়েছিস! জাতের সংস্কার সব দেশেই মানে, ইউরোপ আমেরিকাতেও—

—তা জানি। হিন্দু-মুসলমানের বিয়ে কিংবা ইহুদীর সঙ্গে খৃষ্টানের, এমনকি খৃষ্টানদের মধ্যেও ক্যাথলিক আর প্রটেস্টাণ্টদের মধ্যে বিয়ে এখনও অনেক শিক্ষিত লোকেও মানে না, কিন্তু এ হলো ধর্মবিশ্বাসের কথা। কিন্তু ব্রাহ্মণ আর বৈদ্য, কায়স্থ আর সুবর্ণবণিক—এদের ধর্মবিশ্বাস কি আলাদা? একই আচার, একই তীর্থ, ক্যাথলিক আর প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে ধর্মবিশ্বাসের সেরকম একটুও তফাত আছে? আপনি বলুন?

মেজোমামা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, খুব বড় বড় কথা শিখছিস না? নিজের মামা-কেও জ্ঞান আর উপদেশ দিতে আসিস্! তুই প্রণাম করতে এলেই বা নিচ্ছে কে?

আমি অত্যন্ত আহতভাবে বললুম, মেজোমামা, আপনি রাগ করলেন? আমি কিন্তু মোটেই আপনার মনে আঘাত দিতে চাইনি। আমার আর কি বিদ্যেবুদ্ধি আছে বলুন! নিজস্ব কিছুই নেই! এ যা বললুম সবই তো সাধারণ বই মুখস্থ-করা কথা! যে সব বই ইস্কুলে কলেজে পড়ানো হয়, যে-সব বই আপনিও পড়েছেন আমিও পড়েছি···আপনি যে-সব ভুলে গেছেন ইচ্ছে করে, আমি মনে রেখেছি—এই আমার দোষ!

—যাযাঃ! অসভ্য, অভদ্র, বাউণ্ডুলে বিটনিক—

ঘরে ঢুকে দেখলুম বাবার জ্যাঠতুতো ভাই, অর্থাৎ আমার জ্যাঠতুতো জ্যাঠা-মশাই খাটে পা ঝুলিয়ে বসে টপাটপ নারকেল নাড়ু ঠেসে যাচ্ছেন। ষাটের কাছাকাছি বয়েস, ঈষৎ মেদবৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্য টস্কায়নি। আমাকে দেখেই স্থূল পা দু'খানি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, বসেই প্রণাম কর। কোলাকুলি করতে হবে না, আর উঠতে পারি না। এইখান থেকেই আশীর্বাদ করছি!

আমি মজা করার জন্য হাসতে হাসতে বললুম, কিন্তু আপনাকে তো আমি প্রণাম করবো না!

—কেন রে ব্যাটাচ্ছেলে, প্রণাম করবি না কেন?

—আপনাকে কেন প্রণাম করবো বলুন!

—সে কিরে? সম্পর্ক ভুলে গেলি নাকি? অ বৌমা, এ ছেলেটা কি আত্মীয়স্বজনকে একবারে ভুলে বসে আছে নাকি?

আমি বেশ প্রফুল্লভাবে হাসতে হাসতেই বললুম, না, জ্যাঠামশাই, সম্পর্ক ভুলবো কেন? কিন্তু আপনাকে প্রণাম করি কি করে, আপনি তো ব্রাহ্মণ নন্!

—অ্যাঁ? মাথা খারাপ হয়েছে নাকি তোর? তোর বাপ্ যখন ব্রাহ্মণ ছিল—তখন আমি ব্রাহ্মণ নই?

—উঁহু! আপনি তো আপনার ছেলের সঙ্গে এক শূদ্রের মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। তাহলে আর ব্রাহ্মণ রইলেন কি করে?

আমার জেঠতুতো জেঠা এবার ঘর ফাটিয়ে হাসলেন। তারপর বললেন, স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি! তোরা আজকালকার ছেলে হয়েও এ-সব জাত-ফাত মানিস নাকি? আমরা বুড়ো হয়েও এ-সব ছাড়তে পারলুম—

আমি ঘাড় চুলকে বললুম, একটু মানি এখনো। আপনার কনট্রাক্টারির ব্যবসা—আপনি ব্যবসার সুবিধার জন্যে গভর্নমেণ্টের এক শূদ্র অফিসারের কুৎসিত মেয়ের সঙ্গে জোর করে ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। বলুন এটা কি ব্রাহ্মণের কাজ হলো?

জেঠামশাই এবার হঠাৎ পা গুটিয়ে খাড়া হয়ে বসলেন। তারপর রুক্ষ গলায় বললেন, ব্যবসার সুবিধার জন্য ছেলের বিয়ে দিয়েছি, এ-কথা তোকে কে বলেছে?

—কাগজেই বেরিয়েছে। আপনার টেণ্ডারের রেট বেশী হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে কনট্রাক দিয়েছে—কাগজওয়ালারা এ খবর ফাঁস করে দিয়েছে!

—কাগজওয়ালাদের মুখ ঠিক বন্ধ হয়ে যাবে! আমার টেণ্ডারের রেট বেশী, আমার জিনিসও অন্যদের চেয়ে ভালো।

—না, তাও না। হাসপাতালগুলোতে আপনার সাড়ে নশো সেগুনকাঠের টেবিল সাপ্লাই করার কথা ছিল, কিন্তু দেখা গেল সেগুলো সবই সেগুনকাঠের বদলে প্লাইউডের—

—তোর এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকারটা কি রে? এ-সব ব্যবসার হের-ফের। যারা ব্যবসা করে তারা জানে আজকাল সবাই তো এরকম করছে।

সবাই না, তবে অনেকেই যে এইরকম চুরি-জোচ্চুরি করছে তা তো জানিই। সে সব অসৎদেরও সহ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু তাদের আবার প্রণাম করাটাও একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে না!

—তোদের বাড়িতে আমার আসাই ভুল হয়েছে! পাজী, ছুঁচো, বদমাশ, বেল্লিক, বিটলে—

অন্যবার পুজোর পর প্রণাম করতে করতে কোমর বেঁকে যায়। এবার বেশ সুস্থ আছি। মাত্র দুটি প্রণাম করেছি। মাকে এবং পুরোনো ইস্কুলের সংস্কৃত মাস্টারমশাইকে। খুঁজলে কি ওদেরও কোনো দোষ পাওয়া যাবে না? যাবে হয়তো! কিন্তু জননী এবং শিক্ষকের সব দোষ সহ্য ও ক্ষমা করা যায়।

৩৯

*****

মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর লাগে, আমার চোখে, যখন তারা প্রবল বাতাসের স্রোতের বিপরীত দিকে হাঁটে।

হু-হু করছে হাওয়া, চুল এলোমেলো এবং আঁচলটা পিছনের দিকে ডানার মতন উড়তে থাকে, মেয়েরা তখন বদলে যায়, তাদের চোখ মুখ অচেনা মনে হয়।

সেই রকম হু-হু-করা বাতাসের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এক পলক তাকিয়ে বরুণাকেও আমার হঠাৎ সুন্দরী মনে হলো। অন্য কোনো সময় মনে হয় নি, একটু পুরুষালি ধরনের চেহারা বরুণার, বেশ লম্বা, গায়ের রং ফর্সার কাছাকাছি হলেও রাজপুতানীদের মতন চওড়া হাতের কব্জী এবং নাকটা গুর্জিয়ার মতন ছোট আর বোঁচা। অন্য সময় সুন্দরী মনে হয় না, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে বরুণাকে মনে হলো বত্তিচেল্লির আঁকা 'থ্রি গ্রেসেস'এর অন্যতমা। আমি বরুণার দিকে আড়চোখে আবার তাকালুম। কিছু একটা কথা বলা দরকার, তাই বললাম, দারুণ হাওয়া দিচ্ছে না?

বরুণা যেন অন্য জগৎ থেকে কথা বলছে, সেইভাবে উত্তর দিল, আঃ, আমার ইচ্ছে করে, সমুদ্রের ওপর একটা ছোট্ট ডিঙি নিয়ে একলা এ-রকম হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভেসে যাই।

কথা হচ্ছিল নদীর পাড়ে। পাশেই বিশাল নিস্প্রাণ দামোদর। ইউনেস্কোর উদ্যোগে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল—গ্রামের অশিক্ষিত চাষী-মজুররা কথা বলার সময় কতগুলো শব্দ ব্যবহার করে, সাধু বাংলা তারা কতখানি বোঝে—এই সব তথ্য সংগ্রহ করার। কলেজের কোনো একটা পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমি বাইচান্স সেই চাকরি পেয়ে যাই।

ন'জন ছেলে এবং পাঁচজন মেয়ের একটি দল মিলে আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরতুম, ইস্কুল বাড়িতে ক্যাম্প করা হতো। সেই দলের একটি মেয়ে বরুণা, তখন আমরা বর্ধমানের কলানবগ্রাম, শক্তিগড় অঞ্চলে।

দলের চারটি মেয়ে আর চারশো মেয়েরই মতন, তারা ছেলেদের থেকে একটু দূরে আলাদা দল মিলে থাকে, লাজুক লতার মতন আড়ে আড়ে চায়, হাসির কথায় চুপ করে থাকে, আবার অকারণে হাসে, অকারণে ভয় পায়, পদে পদে "ইস কি বিশ্রী কাদা, উঃ কি বিচ্ছিরি গন্ধ…"। দলের মধ্যে যে-মেয়েটি সবচেয়ে

সুন্দরী ছিল—তাকে আমরা ছেলেরা আড়ালে বলতুম, মিস পুঁটুলি, শাড়ি-ব্লাউজে জড়ানো একটা পুঁটুলির মতনই দেখতে ছিল তাকে। আমাদের বিকাশ মাঝে মাঝে মন্তব্য করতো, ইস্, অতই যখন লজ্জা, তখন চাকরি করতে আসা কেন?

একমাত্র বরুণা ছিল আলাদা। ডাকাবুকো ধরনের, অহেতুক লজ্জার বালাই নেই, ছেলেদের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছে, ছোটখাটো খানাখন্দ দেখলে দিব্যি লাফিয়ে পার হচ্ছে, কখনো বা কাদার মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে সাঁওতালনীর মতন হি-হি করে হাসছে। বরুণা বলতো, আমি চাকরিটা নিয়েছি কেন জানেন? এই যে বাড়ির লোকজন ছাড়াই একা একা বেড়াবার সুযোগ পেলুম! বেড়াতে আমার এত ভালো লাগে!

সেই সময় আমার একটা গুরুতর অসুখ ছিল। ঘন ঘন প্রেমে পড়া। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে কোনো গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, তার জানালায় বসে থাকা কোনো মেয়ের মুখ দেখেও এমন প্রেমে পড়ে যেতুম যে, মনে হতো, একে না পেলে আমি বাঁচবো না! সাতদিন আহারে রুচি থাকতো না।

সুতরাং বরুণার সঙ্গেও যে আমি প্রেম করবার চেষ্টা করবো, তাতে আর আশ্চর্য কি! বাকি ছেলেরা অন্য চারটি মেয়ের পিছনেই ঘুরঘুর করত, তাদের মুখের একটু হাসি, চোখের ঝিলিক দেখবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতো। বরুণাকে ওরা একটু ভয় ভয় করতো, তাছাড়া বরুণা বেশ লম্বা, অন্য ছেলেদের প্রায় সমান সমান—দলের মধ্যে আমিই একটু বেশী লম্বা ছিলুম বলে—আমার পাশেই বরুণাকে একটু একটু মানাতো।

কিন্তু হায় হায়, বরুণার সঙ্গে আমার এক বিন্দুও প্রেম হলো না।

বলাই বাহুল্য, আমাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় দলপতি ছিলেন—আমরা যে কাজের জন্য এসেছি সেটা সার্থক হচ্ছে কিনা দেখার বদলে—ছেলেরা মেয়েরা সব সময় আলাদা থাকছে কিনা, এটা লক্ষ্য রাখাই ছিল যেন তাঁর প্রধান দায়িত্ব। আমরা তাঁকে গ্রাহ্য করতুম না, এবং সব থেকে অগ্রাহ্য করতো বরুণা।

বরুণা অনবরত আমাদের মধ্যে চলে আসতো, খপ করে যখন তখন হাত ধরতো, ইয়াকি করে পিঠে কিল, পুকুর পাড়ে পা ধুতে গেলে গায়ে জল ছিটিয়েছে—এমনকি সন্ধের পরও এসে বলেছে, চলুন না, এ গ্রামের শ্মশানঘাট দেখে আসি। কিন্তু গলার স্বর একটু গাঢ় করে কথা বলতে গেলেই বরুণা চোখ পাকিয়ে বলেছে, এই, ওকি হচ্ছে, ন্যাকামি? ইস্, একেবারে গদ্গদ দেখছি!

—না, ওরকম মেয়ের সঙ্গে প্রেমের কথা বলা যায় না, ওদের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব।

বরুণার বাড়ির কথা একটু একটু শুনেছিলাম। যৌথ পরিবার জ্যাঠামশাই

বিষম আচারনিষ্ঠ, গোঁড়া। বাবা—অধিকাংশ প্রৌঢ় মধ্যবিত্ত যে-রকম হয়, কোনো বিষয়েই কোনো জোরালো মতামত নেই, মা বহুকাল হাঁপানিতে শয্যাশায়ী, দাদা কাঠের ব্যবসা ফেঁদেছে—আরও অনেকগুলো ভাইবোন। অর্থাৎ বরুণাদের বাড়িতে গিয়ে বরুণাকে দেখলে কোনো বৈশিষ্ট্যই দেখতে পেতুম না নিশ্চিত, সব মেয়ের মতনই গুটি গুটি কলেজ যায়—বাড়ি আসে, মাসী-পিসির সঙ্গে নাইট শো-তে সিনেমা যায়, দাদার বন্ধুরা বাড়িতে এলে সে ঘরে ঢোকা-বারণ।

কিন্তু বাড়ির সঙ্গে খুব বোঝাবুঝির পর চাকরি নিয়েছে, আমাদের দলপতি নীতীশ-দা ওর কাকার বন্ধু—তিনি ওর ওপর নজর রাখবেন এই শর্তে। বাড়ি থেকে সেই প্রথম আলাদা বেরিয়েছে বরুণা, তার চরিত্র আমূল বদলে গেছে, পায়ে পায়ে ওর চঞ্চলতা, বরুণার মধ্যে একটা প্রবল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা দেখেছিলুম!

বরুণা বলতো, পৃথিবীতে কত জায়গা আছে, আমার ইচ্ছে করে একা একা ঘুরে বেড়াই! কোনো অচেনা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি, আঃ, ভাবতে যা ভালো লাগে!

আমি বলতুম, ইস্, মেয়ে হয়ে শখ কত!

বরুণার চোখ ঝলসে উঠতো। তীব্র স্বরে বলতো, কেন, মেয়েরা বুঝি পারে না? ছেলেরাই সব পারে? দেখলুম তো কত ছেলে মেয়েরও অধম! দেখবেন, আমি একদিন আফ্রিকা চলে যাবো, একটা নতুন নদী কিংবা জলপ্রপাত আবিষ্কার করবো!

আমি হা-হা করে হাসতুম। বলতুম, দেখা যাবে! বড় জোর স্বামীর সঙ্গে হুড্রু জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া কিংবা বাবা-মার সঙ্গে এলাহাবাদের ত্রিবেণী—এর বেশী না!

বরুণা তখন রাগের চোটে দুম করে আমার পিঠে এক বিরাশী সিক্কা কিল!

আল্পস পাহাড়ের উচ্চতা, মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ্য ওর মুখস্থ ছিল। হিট্টাইট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার ব্যাপারে একজন সুইডিস মহিলার অভিযানের কথা ও আমাকে শুনিয়ে ছিল। বরুণাও ছেলেমানুষের মতন কল্পনা করতো, ও নিজেও একদিন মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা হিমালয়ের জঙ্গলে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলবে।

সেবার আমাদের দলে বরুণা সত্যিই একটা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হয়েছিল। মরা দামোদরের পাড়ে আমরা দুপুরে এসে থেমেছি। বিষম হাওয়া দিচ্ছে, মেঘলা আকাশ। প্রত্যেকের দশজন চাষীকে ইণ্টারভিউ করার কথা, আসবার

পথে একটা বাজার দেখে তা আমরা সেরে ফেলেছি। শেষ শীতের শুকনো দামোদর—বিরাট চওড়া—কিন্তু বেশির ভাগই বালি দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে জল। আমরা ঠিক করলুম, হেঁটে দামোদর পার হবো। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বর্ষার দামোদর সাঁতরে পার হয়েছিলেন, আমরা শীতের দামোদর হেঁটে রেকর্ড করবো। তখন আওয়ারা বইটা সদ্য রিলিজ করেছে, আমি আর বিকাশ রাজকাপুরের ভঙ্গিতে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নিলুম। হঠাৎ বরুণা বললো, আমিও যাবো!

দলপতি নীতীশ-দা আঁতকে উঠে বললেন, না, কক্ষনো না, বরুণা যাবে না।

বরুণা ততক্ষণে আঁচল কোমরে বেঁধেছে, বললো, যাবোই!

নীতীশ-দা বললেন, না বলেছি? অনেক জায়গায় কোমর এমন কি বুক জল।

বরুণা বললো, তা হোক, আমি সাঁতার জানি। ঐ তো চাষীর মেয়েরাও পার হচ্ছে!

নীতীশ-দা বললেন, ওরা ঠিক ঠিক জায়গা চেনে। এক এক জায়গায় দারুণ স্রোত আছে।······বরুণা, যেও না বলছি, তাহলে তোমার বাবাকে আমি নালিশ করতে বাধ্য হবো!

বরুণা এবার ঠোঁট উল্টে বললো, করুন গে যান, আমার বয়ে গেল!—ততক্ষণে সে ঢালু পাড় দিয়ে নামতে শুরু করেছে!

প্রথমে বালি, বালির ওপর দিয়ে আমরা তিনজনে ছুটতে লাগলুম। বরুণার শাড়ি হাওয়ায় উড়ছে ওর মুখখানা উদ্ভাসিত সুশ্রী। আমারও এমন ভালো লাগছিল যে, আমি ল্যাং মেরে বিকাশকে বালির ওপর ফেলে দিয়ে দুজনে গড়াগড়ি করলুম, বরুণা মুঠো মুঠো বালি আমাদের গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলো।

পাড়ে দাঁড়িয়ে বাকি সবাই দেখছে—ওরা ভদ্র, সভ্য—ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দেবার কথা চিন্তাই করতে পারে না। একটু পরেই জলের ধারার কাছে পৌঁছোলুম। ঠাণ্ডা টলটলে জল—অঞ্জলি ভরে মুখে ছিটোলাম তিনজনেই, তারপর নেমে পড়লাম। বরুণা শাড়িটা হাতে ধরে উঁচু করে নিল। ক্রমশ ক্রমশ জল হাঁটু ছাড়ালো—তখন বরুণা শাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বললো, ভিজুক গে।

সেই জল ছাড়িয়ে আবার বালি—ওপর থেকে বোঝা যায় না, কত চওড়া নদীর খাত। আবার বালি ছাড়িয়ে জল। এবার জল উরু ছাড়িয়ে গেল—জল ঠেলার সাঁ সাঁ শব্দ,···বরুণা আনন্দে একেবারে খলখল করছে, একবার

হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরলো। আমি ওর কাঁধ ধরে বললুম, এবার দিই ডুবিয়ে ?

ও বললো, ইস্, আসুন না দেখি, আমার গায়ে কম জোর নেই।

কোমর ছাড়িয়ে প্রায় বুক পর্যন্ত জল। বিকাশ বললো, জল আরো বাড়বে নাকি ? বরুণা সে কথা গ্রাহ্য না করে উত্তর দিল, এত ভালো লাগছে, আমরা যেন ওপারে কি আছে জানি না, যেন একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি!—হাওয়া খুব জোর, জলেও স্রোতের টান লাগলো, আর ব্যালান্স রাখা যাচ্ছে না, বিকাশ ভয়ে ভয়ে বললো, হঠাৎ জোয়ার-টোয়ার এলো নাকি! আমি কিন্তু সাঁতার জানি না! বলতে বলতেই বিকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়লো, আমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলো।

আমি বললুম, আরে, ওকি করছিস, বরুণা বললো, সাঁতার জানেন না তো এলেন কেন! বিকাশ বললো, চলো আমরা ফিরে যাই।

বরুণা বললো, মোটেই না!

আমার দিকে ফিরে বললো, আপনি তো সাঁতার জানেন, আসুন আপনি আমি দুজনে যাই! বিকাশ বললো, নিলু, আমাকে আগে এ পাড়ে পৌঁছে দিয়ে যা। আমি পা রাখতে পারছি না! দুচোখ-ভরা বিদ্রূপ নিয়ে বিকাশের দিকে তাকালো বরুণা। তারপর সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে বরুণা বললো, আমি তাহলে একটু চললুম।

চাকরিটা ছিল মাত্র তিন সপ্তাহের। শেষ হয়ে যেতে তারপর আর কেউ কারুর খোঁজ রাখিনি। শুধু বিকাশের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিছুদিন আগে বিকাশ বলছিল, তোর সেই দেবী চৌধুরাণী মার্কা মেয়েটাকে মনে আছে ? বরুণা ? সেদিন আমাদের এক কলিগের বাড়িতে গিয়ে দেখলুম, তার বউ সেই বরুণা। কি চেহারাই হয়েছে! চেনা যায় না—এর মধ্যেই তিনটি বাচ্চা!

তার কিছুদিন পর আমিও একদিন বরুণাকে দেখেছিলুম দুপুরবেলা চলন্ত ট্যাক্সিতে। টাক মাথায় আলুথালু মার্কা একজন লোক, নিশ্চয়ই বরুণার স্বামী, মুটিয়েছে বলে বরুণার মুখখানাও ভোঁতা ধরনের, সঙ্গে একটা দেড় বছরের ছেলে। খুব সম্ভবত সিনেমার দুর্গম পাহাড় কিংবা নির্জন হ্রদের দৃশ্য দেখতে যাচ্ছে। না চেনার কি আছে এইটাই তো স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা।

বরুণার কথা আজ আবার মনে পড়লো, কেননা, কাগজে দেখেছিলাম আটটি বাঙালী মেয়ে হিমালয়ে উঠে রুন্টি শৃঙ্গ জয় করেছে। ভাবছি এই খবরটা পড়ে বরুণা খুশী হবে, না দুঃখিত হবে ?

৪০

❋❋❋❋❋

বারট্রাণ্ড রাসেল আমাকে বললেন, চলো হে ছোকরা, আগে বড়বাজারটা ঘুরে আসা যাক।

আমি বললুম, স্যার বারট্রাণ্ড, ওখানে যেতে হলে আপনাকে তো চিৎপুরের ট্রামে যেতে হবে, তাতে আপনার কষ্ট হবে যে!

বৃদ্ধ দার্শনিক মৃদু হেসে বললেন, কেন বৎস, চিৎপুরের ট্রামের বিশেষত্ব কি?

আমি বললুম, ট্রাম জিনিসটাই বোধহয় আপনি বহুদিন দেখেন নি। আপনাদের বিলেতে তো এসব পাট উঠে গেছে শুনেছি। এখানে—

—বাজে বোকো না। আমেরিকায় থাকতে শিকাগোতে ট্রাম দেখেছি, সানফ্রান্সিসকোতেও ট্রাম আছে। আর—

—আমেরিকাতেও ট্রাম আছে নাকি? জানতুম না তো?

—তুমি আর কতটুকু জানো? এবারে চিৎপুরের ট্রামের বৃত্তান্ত কি বলো!

—আর্ল রাসেল, ট্রাম সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? বা যে-কোনো গাড়ি সম্পর্কে? গাড়ি হয় সামনে দৌড়োয় অথবা থেমে থাকে। কখনো পিছনেও আসতে পারে, কিংবা চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলে ঝাঁকুনি লাগে। কিন্তু, গাড়ি চলতে চলতে ডাইনে-বাঁয়ে কোমর দোলায় এ-রকম কখনো শুনেছেন? কী এক অলৌকিক কারণে, চিৎপুরের ট্রামে এই রকম হয়। সুতরাং ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টুইস্ট নাচতে আপনার এই বয়সে বোধহয় অসুবিধে হবে! তা আপনাকে বৃদ্ধ দেখে যদি কেউ সম্মান করে সীট ছেড়েও দেয়, তবুও চিৎপুরের ট্রামেই, এখনো সব কাঠের বেঞ্চি। কোনো গদি নেই। আপনার লাগবে—

জ্ঞানবৃদ্ধ মুচকি হেসে বললেন, সে ব্যবস্থা আমার করা আছে। আমার প্যাণ্টের পিছনে গদি সেলাই করা। শান্তি আন্দোলনের সময় লণ্ডনের রাস্তায় যখন 'সীট-ইন' করেছিলাম, তখনি বসার সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থা করেছি।

তা যাক্‌গে, ট্রামে আমাদের যাবার দরকারটাই বা কি বাপু? চিৎপুরের রাস্তায় বাস চলে না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ চলে। খুব ভিড় হয় যদিও, তবু চলুন, বাসেই যাই।

চার নম্বর বাসে বিপুল ভিড। এ রাস্তায় বাসে কম লোক উঠলেও বেশী ভিড় হয়, কারণ অধিকাংশ লোকেরই কোমরের বেড সাধারণ মানুষের তিন গুণ। আমরা পিছনের দরজা দিয়ে উঠে এক কোণে গুটিশুটি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বুড়োমানুষের একটু বেশী কথা বলার স্বভাব থাকে। বারট্রাণ্ড রাসেল আমাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেমন, এ বাসে একটিও মেয়ে দেখছি না কেন হে?

আমি বললুম, এই ৯৪ বছর বয়সেও আপনার মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ আছে দেখছি!

—কার না থাকে? মরার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ মানুষের ঘোচে না।

—হুঁ। মেয়ে ঘটিত ব্যাপারেই আপনাকে আমেরিকা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল না?

—ওসব পুরোনো কথায় তোমার দরকার কি হে ছোকরা? যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দাও!

—আছে, মেয়েরা আছে। বাসের সামনের দিকের কয়েকটা আসন শুধু মেয়েদের জন্য। ভিড়ের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না।

—ঐ জন্যই সামনের দরজায় এত ভিড়! তা তো হবেই। পুরুষেরা মেয়েদের কাছাকাছি দাঁড়াবার চেষ্টা যদি না করে, তবে সেটাই তো অস্বাভাবিক।

—দেখছেন না. বাসের পিছন দিকে সহজে কেউ আসতে চায় না।

—তা তো হবেই। সামনের দিকে ওরাই সুস্থ লোক। তা তোমাদের বাস কোম্পানি মেয়েদের সীট শুধু সামনের দিকে না রেখে সারা বাসে ছড়িয়ে দেয় না কেন? তা হলে ভিড়টাও ছড়িয়ে যায়। আমারও দু'একজনের দেখা পেতুম!

—সারা বাসে ছড়িয়ে দিলে মেয়েদের উঠতে নামতে অসুবিধে হতে পারে।

—কচু হতে পারে! মেয়েদের কিছুতেই কিছু অসুবিধে হয় না। পুরুষদের চেয়ে তারা যে-কোনো অবস্থার সঙ্গে বেশী মানিয়ে নিতে পারে। তুমি আমাকে সামনের দরজায় না তুলে এখানে তুললে কেন?

—আজ্ঞে, ওখানে অত ভিড়! আচ্ছা ফেরার সময় না হয়……

—সামনের দরজার কণ্ডাকটার মাঝে মাঝে তারস্বরে কী বলে চেঁচাচ্ছে?

—ও ভিড়কে উদ্দেশ করে বলছে, লেডিজ সীটের সামনে ভিড় করবেন না, পিছন দিকে এগিয়ে যান !

—বেশ করবে লেডিজ সীটের সামনে ভিড় করবে ! মানুষের ইনস্‌টিংক্টও বদ্‌লাতে চায় ? আর কি বলছে, বললে ?

—পিছন দিকে এগিয়ে যান—

—পেছন দিকে এগিয়ে যান ? ওঃ হো-হো—

দার্শনিক তাঁর বাঁধানো দাঁতে ফটফটে সাদা হাসি হেসে উঠলেন, পিছন দিকে এগিয়ে যান ? হাঃ—হাঃ, ওঃ, এমন মজার কথা বহুদিন শুনিনি !

—আর্ল সাহেব, এতে মজার কি পেলেন ?

—তোমার মাথায় দেখছি পঞ্চগব্যের একটি মাত্র গব্যই ভরা ! মজাটা বুঝতে পারলে না ? পৃথিবীর সব মনীষীরা বলে গেছেন, সামনে চলো ! তোমাদের ভারতীয় ঋষিরাও বলেছেন, চরৈ বেতি। আর এখানে শুনছি, পিছন দিকে এগিয়ে যান্ ! ওঃ—হো—হো। এই বুঝি তোমাদের সাম্প্রতিক নীতি, পিছন দিকে এগোনো ?

আমি ওঁর কাঁধে টোকা দিয়ে বললুম, চুপ চুপ, আস্তে। এসব কথা বলে বিপদে ফেলবেন দেখছি। আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। কলকাতা শহরে আপনার আত্মপরিচয় গোপন রাখাই ভালো। এখানকার লোক আপনার উপর খুব খুশী নয়।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর মুখে সরল চোখে বললেন, কেন আমি কি দোষ করেছি ?

—চীন যখন আমাদের আক্রমণ করেছিল ? আজকাল মাঝে মাঝে বড় বেমক্কা কথা বলেন ! কিউবা নিয়ে যখন হাঙ্গামা হয়, আপনি সেবারও কেনেডিকে দুম্ করে যুদ্ধবাজ বলে বসলেন। আপনার ধারণা ছিল, কেনেডি ছুতো করে কিউবা ধ্বংস করতে চাইছে। পরে দেখলেন তো রাশিয়া সুড়সুড় করে মিজাইল-গুলো নিয়ে গেল তুলে !

—শান্তি ! শান্তি ! ওসব কথা থাক্।

—বার্ধক্য সত্যি দ্বিতীয় শৈশব। আচ্ছা যাক্, আমরা এসে গেছি।

বাস থেকে নেমে আমরা হ্যারিসন রোড ধরে বড়বাজারের দিকে এগিয়ে চললুম। এখন আর বৃদ্ধ দার্শনিকের মুখে কথাটি নেই। আস্তে ঠুকঠুক করে হাঁটছেন এবং অবাক বিস্ময়ে দেখছেন চারদিক। মুখে যুগপৎ প্রজ্ঞার জ্যোতি এবং শিশুর সারল্য। ধপধপে সাদা মাথার চুল, ভুরু দুটিও সাদা—তিনি বড়-

বাজারের নোংরা রাস্তা দিয়ে দিয়ে শ্লথ ভঙ্গিতে ঘুরতে লাগলেন আমার সঙ্গে। আমি ঈষৎ নিচুস্বরে, খানিকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে ওঁকে বললুম, প্রভু, এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী···বড়বাজার! এর নিবিড় সুষমায় যশের সৌরভে ভুবন আমোদিত। এই যানবাহনসঙ্কুল, গলিঘুঁজিময় পল্লী, বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ! এবং যে-হেতু এই সমগ্র পল্লীটিই হৃৎপিণ্ডস্বরূপ, সুতরাং এখানকার অধিবাসীদের প্রত্যেকের আর আলাদা কোনো হৃৎপিণ্ড নেই। এই যে সারি সারি দোকানপাট দৈর্ঘ্যে ছোট প্রস্থে বড একশ্রেণীর মানুষ বসে আছে—এদের প্রত্যেকের বুকের মধ্যে যেখানে হৃদয় থাকার কথা ছিল, সেখানে হৃদয়ের বদলে আছে একটি ক্যাশ বাক্স, প্রতিনিয়ত টাকার ঝন্‌ঝন্‌ শব্দ হয়, সেই শব্দে বাংলাদেশ কাঁপে।

দার্শনিক ধীর স্বরে বললেন, তোমার কথার মধ্যে যেন ঈষৎ বিদ্রূপের সুর আছে। কিন্তু বণিকসমাজকে বিদ্রূপ করো না। বণিকদের তুচ্ছ করার অর্থ ইতিহাসের জ্ঞানের অভাব। গোষ্ঠীবদ্ধ হবার প্রথম স্তরে দলপতি কিংবা রাজা ছিলেন মাননীয়। এখন সভ্যতার দ্বিতীয় স্তরে বণিকই সমাজের প্রাণ। মানুষের জ্ঞান বা কল্পনাকে বিস্তৃত করেছে কে? সাহিত্যিক বা শিল্পী নয়, বণিকরাই। নিজের দেশ বা গণ্ডীর বাইরে যে মানুষ তাকাতে শিখেছে—তাও এই বণিকদেরই জন্য। তারাই পৃথিবীর মানচিত্র নির্দিষ্ট করেছে। আজ মানুষ এক দেশ ছেড়ে অন্য দেশে অনায়াসে বসতি করতে পারে! আজ আর তুমি শুধু নিজের সমস্যায় বিব্রত নও, আলাস্কায় ভূমিকম্প হলে তুমি ব্যথা পাও, ভিয়েৎনামে বোমা পড়লে তোমার ভয় হয়, চন্দ্র অভিমুখে মহাশূন্যযান ছুটে গেলে তুমি উল্লাস বোধ করো—এরও মূলে আছে বণিকরাই।

আমি বললুম, তা মানি। কিন্তু, আমাকে অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। এই যে বণিকদের দেখছেন, আলুপোস্তা, মসলাপটি, কাপড়ের বাজার, বাসনপাড়া—এসব জায়গা ঘুরে আমরা দেখলুম, ছোট ঘর প্রায়ান্ধকার, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দম আটকানো ভিড়—এর মধ্যে যে সমস্ত বণিকরা বসে আছে—তাদের এই দিনরাত পরিশ্রম কিসের জন্য? এদের পোশাক-পরিচ্ছদ বহুমূল্য নয়, এরা অনেকেই নিরামিষাশী—সুতরাং এদের ব্যক্তিগত সুখভোগের জন্য কতই বা অর্থ লাগে? তবু এরা প্রাণপাত করছে কেন? লক্ষ টাকার পর আবার কোটি টাকা অর্জনের জন্য কেন এরা রক্তক্ষয় করছে?

—দেশের ও দশের উপকারের জন্য।

—দেশের উপকার? আপনি বলছেন কী? আপনি জাতে বৃটিশ বলেই কি সব বণিককে সমর্থন করবেন? কথায় কথায় এদের অনেকেই উধাও করছে

বেবি ফুড—তা কি শিশুদের উপকারের জন্য ? চাল-ডাল-তেল নুন—যা যখন পারছে লুকিয়ে ফেলছে চতুর্গুণ দামের লোভে—এর নাম দেশের উপকার ? আপনি কী করে বলছেন, বুঝিয়ে দিন। শুধুমাত্র লাভের নেশায় এরা দিনের বেলায় অন্ধকার নামাচ্ছে—

—সে দোষ ওদের নয়। বণিককে যে দাতা হতে হবে, তার কোনো মানে নেই। শ্রম থেকে উৎপাদন, উৎপাদন থেকে বিনিময়, বিনিময় থেকে বাণিজ্য, বাণিজ্য থেকে সমৃদ্ধি। বণিক সব সময় চেষ্টা করবে—বাণিজ্য থেকে যতদূর সম্ভব বেশী লাভ করা, এবং সেই লাভের অঙ্কে হবে নতুন নতুন বাণিজ্যর প্রসার। রক্ত খাওয়া যেমন বাঘের মজ্জাগত স্বভাব, তেমনি যতদূর সম্ভব লাভ করা বণিকদের স্বভাব। এই স্বভাবকে দমন করা ঠিক নয়—তাতে দেশের সুদূর প্রসারী ক্ষতি। উৎপাদন কম হচ্ছে বলে যদি বণিক লাভের ইচ্ছেটা বদলে ফেলে পরোপকারী সেজে যায়, যদি সে স্থিরমূল্যে বিতরণ কিংবা দান করা শুরু করে, তবে বাণিজ্যের বিস্তার রুদ্ধ হয়ে যাবে, এর কুফল ভোগ করতে হবে আগামী বহু বছর। শ্রমে আলস্য, কিংবা উৎপাদন কমে যাওয়ার জন্য বণিক দায়ী নয়। বাণিজ্যর নীতি স্থির করবে দেশের সরকার। সরকার যদি উদাসীন হয়, কিংবা বণিকের পা-চাটা হয়, তবে সে দোষ তাদের নয়।

—কিন্তু প্রভু, এ দেশের মানুষ যে মরতে বসেছে।

বৃদ্ধ মনীষী আবার খুকখুক করে হাসতে লাগলেন। বললেন, বাসের ঐ কণ্ডাক্টর কী যেন বলছিল ? পিছন দিকে এগিয়ে যান ! পিছন দিকে এগিয়ে যান ! ও—হো—হো—হো। এরকম নতুন হাসির কথা বহুদিন শুনিনি। এই পিছন দিকে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে নতুন দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। তারই প্রতিচ্ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি চতুর্দিকে। চলো, একজন বণিকের সঙ্গে একটু কথা বলি।

রাস্তায় কাদা থিকথিক করছে, রিকশা এবং ঠেলাগাড়ির ভিড় এড়িয়ে, একটা বিশালবপু ষাঁড়কে পাশ কাটিয়ে আমি বারট্রাণ্ড রাসেলকে একটি দোকানের সামনে নিয়ে এলাম। দোকানের মালিকটি প্রৌঢ়, মাথায় সোনালি রঙের পাগড়ি, কপালে এবং নাকে চন্দনের তিলক, হাসলে দুটি সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত দেখা যায়। সেই শ্রেষ্ঠী-নন্দনকে দার্শনিক বললেন, আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন করবো। তুমি একটি মাত্র কথায় তার উত্তর দাও। প্রশ্নটি হচ্ছে তুমি কি চাও ?

বিনা দ্বিধায়, মুহূর্তমাত্র না ভেবে সে বললো যুদ্ধ !

রাসেল আমার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, লোকটা সৎলোক। সত্যিকারের মনের কথাটা বলেছে। এই আলস্য ও জড়তা ভাঙার একমাত্র উপায় যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় উৎপাদন বহুগুণ বাড়তে বাধ্য—তাতে বণিকের সমৃদ্ধি, তাই বণিক চাইবে যুদ্ধ। আর, যুদ্ধে মানুষ ও মনুষ্যত্বের বিনাশ বলে দার্শনিক চাইবে শান্তি। এই বণিক ও দার্শনিকের বিপরীত টানেই সভ্যতা টিকে থাকে। আমি এ কথা ভালোভাবেই জানতুম। কিন্তু, মাঝখান থেকে এই আণবিক অস্ত্রগুলো এসেই যে সব গণ্ডগোল বাধিয়ে দিলে। যুদ্ধ একবার বাধলে আর যে শেষ হবে না!

আমি বললুম, যুদ্ধ যুদ্ধ আপনার একটা বাতিক হয়ে গেছে! এখানে গোপন যুদ্ধ অনবরত চলেছে, তা বুঝি টের পেলেন না? যাকগে, চলুন এবার ফেরার বাসে উঠতে হবে। আবার পেছন দিকে এগিয়ে যাওয়া যাক্!

৪১



ওঃ কতকাল যে মানুষের নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার কথা শুনি নি। অস্পষ্টভাবে যেন মনে পড়ে, ছেলেবেলায় প্রায়ই শুনতুম, পাশের বাড়ি থেকে বা চেনাশুনো আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেউ নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

একটি লাল পাড়ের শাড়িপরা প্রৌঢ়া মহিলা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, কী রকম যেন ঠাণ্ডা তাঁর চেহারা, কখনো তাঁকে চেঁচিয়ে হাসতে শুনিনি।—শুনেছিলাম, তাঁর স্বামী এগারো বছর আগে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন। সন্ন্যাসী হওয়াটা অবশ্য দূর কল্পনা, কারণ তিনি তো আর বাড়ি থেকে গেরুয়া কাপড় পরে বেরোন নি, এমনি একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়েছিলেন, আর ফেরেন নি। হাসপাতালে বা থানায় তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় নি, সুতরাং সকলে ধরে নিয়েছিল—তিনি সাধু হয়ে সংসার ত্যাগ করেছেন। এগারো বছরে আর ফেরেন নি, কেউ জানে না তিনি বেঁচে আছেন কিনা, কিন্তু সেই প্রৌঢ়া মহিলাটি, আমরা যাকে কমলামাসী বলতুম, তিনি লালপাড়ের শাড়ি পরে নিজের বৈধব্য অস্বীকার করতেন।

কখনো হয়তো তীর্থ থেকে ফিরে এসে কেউ খবর দিতেন, কমলার স্বামী যতীনবাবুকে দেখলুম হরিদ্বারে। আমাকে অবশ্য চিনতে পারলো না, কিন্তু অবিকল যতীনের চেহারা। একমুখ দাড়ি, মাথায় জটা—তবু আমার চিনতে ভুল হয় নি।

হয়তো তার পরের মাসেই আবার অন্য কেউ বললেন, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে একজন সাধু দেখলুম, হুবহু যতীন রায়ের মতন, আমাকে দেখেই চট করে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল!

কে জানে সত্যি ওরা যতীন রায়কে দেখেছিল কিনা, কিন্তু জর্দা ছাড়া যিনি পান খেতে পারতেন না, রোজ সকালবেলা পোষা পাখিকে ছোলা খেতে না দিয়ে

যিনি নিজে চা পর্যন্ত মুখে দিতেন না (এসব আমার শোনা কথা, কখনো যতীন রায়কে আমি চোখেই দেখিনি)—সেই সংসারী এবং আসক্ত যতীন রায় একদিন বিকেলবেলা বেড়াতে বেরিয়ে কিসের ডাক শুনতে পেয়ে কোথায় চলে গেলেন কে জানে।

কিন্তু রহস্য-পূজারী শৈশবে আমি মনে মনে যতীন রায়কে খুব শ্রদ্ধা করতুম। কল্পনা করতে ভালো লাগতো, কোথায় কোন্ বিজন বনে কিংবা পাহাড় চূড়ায় উদাসীন মুখে যতীন রায় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওসব জায়গায় আর জর্দা কোথায় পাবেন, তাই এগারো বছর তিনি আর পান খান নি, ঠোঁট দেখলেই বোঝা যায়। আর এই বিশ্ব-সংসারের যাবতীয় মুক্ত পাখিরা নিজেরাই নিজেদের খাদ্য খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে—হয়তো সেই দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতেন।

আজকাল এই রকম সাধু হয়ে যাওয়া বা নিরুদ্দেশের খবর একেবারে কানে আসে না। তাহলে এখন সাধু হয় কারা? সাধুদের সংখ্যা অনেক কমে আসছে নিশ্চিত।

চোখ বুজলেই দেখতে পাই হিমালয়ের বহু গুহা এখন খালি পড়ে থাকছে। শহরে ফ্ল্যাটবাড়ির ভাড়াটে যত বাড়ছে, তত খালি হয়ে আসছে হিমালয়ের গুহা, ওসব জায়গায় হোটেল খোলা হবে হয়তো। রুদ্রাক্ষের মালা পরবার জন্য আর একটিও লোক থাকবে না, রুদ্রাক্ষের মালা তখন শুধু পরবে শৌখিন আমেরিকান মেয়েরা। গেরুয়া কাপড়ের একমাত্র দরকার হবে, যাত্রায় কিংবা ফিল্ম স্টুডিওতে।

নিজের দিকে তাকিয়ে দেখি, অথবা বন্ধুবান্ধবের মুখে, কোথাও সন্ন্যাসী বা বা নিরুদ্দেশে যাবার বিন্দুমাত্র ইশারা নেই। সব জায়গাতেই লেখা, আরও দাও, আরও ভোগ করবো, আমি চাই ব্যক্তিগত মালিকানা। রূপং দেহি, ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, আয়ুং দেহি।

অনেক তদ্বির করে যে বেলগাছিয়ায় ফ্ল্যাট পেয়েছে, সে এখন চায় জমিদারি, যে বড় চাকরি পেয়েছে, সে চায় অন্যের চাকরি হরণ করতে, যে সুখী সংসার পেয়েছে, সে চায় অন্যের সংসার জালিয়ে দিতে। নাঃ চেনা-শুনোদের মধ্যে কারুর তো আর নিরুদ্দেশে যাবার সম্ভাবনা দেখি না—যদি না কারুর নামে পুলিশের হুলিয়া বেরোয়।

আমি নিজেও তো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোনো বৃষ্টিভেজা নির্জন সাদা বাড়ি দেখলে ভাবি, ঐ বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খেতে পারলে আমার জীবন সার্থক হতো। চৌরঙ্গির কোনো দোকানে শো-কেসে ঠাণ্ডা কাচে মুখ লাগিয়ে

ভাবি অনেক সময়, ভিতরের ঐ রকম একটা সুন্দর জামা আমার কতকাল পরার সাধ ছিল! নীল রঙের কোনো মোটরগাড়ি দেখলেই আমার মনে হয়, ঐ রকম কোনো মোটরগাড়ি পেলে আমি একদিন সমুদ্রের পাড়ে যেতাম। আমারও নিরুদ্দেশে যাওয়া হবে না।

'বাবলু ফিরে এসো, মা শয্যাশায়ী কত টাকা লাগবে জানাও—' কাগজের এসব বিজ্ঞাপনও আজকাল অনেক কমে গেছে। আগে যেন মনে হয় প্রত্যেক-দিন চোখে পড়তো। বাবলুরা আর আজকাল রাগ করে নিরুদ্দেশ যায় না, খোকন কিংবা মণ্টুরাও আজকাল পরীক্ষায় ফেল করে নির্লজ্জের মতো বাড়িতে বসে থাকে। মঞ্জুলাদের বিয়ে করতে না পেরে রমেশরা আর এখন সাধু হয়ে যায় না, বরং মঞ্জুলার সঙ্গে রমেশের বিয়ে না হলে কোথা থেকে এক সাধু এসে মঞ্জুলাকে বিয়ে করে ফেলে সংসারী হয়ে যায়।

সেই সব নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন পড়ে মনটা বড় উদাস হয়ে যেতো। এক সময় মনে হতো, যারা ঐ নিরুদ্দেশে চলে গেল তারা আর ফিরবে না কোনোদিন, ঐ সব বাবলু-মণ্টু-তপনরা অভিমানী মুখ নিয়ে চিরকাল পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াবে।

আমি যখনই কোনো অপরিচিত জায়গায় কোনো অভিমানী বিষণ্ণ মুখ দেখেছি তখনই মনে হয়েছে—এও বোধ হয় সেই নিরুদ্দিষ্ট দলবলের একজন, যে তার বাবাকে শয্যাশায়ী করে, মাকে কাঁদিয়ে অন্ধ করে, দাদাকে টাকা পাঠাবার জন্য ব্যাকুল অবস্থায় রেখে একদিন বাড়ি ছেড়েছিল, তারপর আর চক্ষুলজ্জায় কিংবা এক জীবনের অভিমানে ফিরতে পারে নি।

আমার ছেলে বাবলু অমুক তারিখে নিরুদ্দেশ হয়েছিল, তারপর সে এত তারিখে আবার সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছে—এবং আমি শয্যাত্যাগ করেছি—এ-রকম কোনো বিজ্ঞাপন কখনো কাগজে বেরোয় না। আমরা শুধু নিরুদ্দেশেরই খবর জানি। ফিরে আসার খবর জানি না।

কিন্তু একজন ফিরে আসা মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তিনি একজন বিল্ডিং কনট্রাক্টর, অর্থাৎ অন্য লোকের বাড়ি তৈরি করে দেন। মধ্যবয়সী, মাথাজোড়া বিপুল টাক, কোনো হাসির কথা শোনার পর তিন মিনিট ধরে হাসেন। এক বন্ধুর বিয়েতে বহরমপুর গিয়েছিলুম, ঐ ভদ্রলোকটিই সেই বাড়ির বড় জামাই, তাঁরই হাতে আমাদের আপ্যায়নের ভার।

বাইরের ঘরে বসে জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে, তিনি অর্থাৎ পরিতোষবাবু ক্ষণে ক্ষণে আমাদের চা-খাবার, অফুরন্ত সিগারেট দিয়ে মুখ-বন্ধ করে রাখছিলেন। হুড়মুড় করে বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণের গল্প শুরু হলো।

এক বন্ধু আমেরিকার গল্প শুরু করে দিল, সুযোগ পেলেই সে বিলেত-আমেরিকার গল্প ফেঁদে বসে, আমরা তাকে জোর করে চাপা দিয়ে কেদার-বদরী ভ্রমণের কথা শুরু করলুম। গত মার্চ মাসে আমরা তিনজনে সেখানে গিয়েছিলাম, সুতরাং বারোয়ারি উপন্যাসের মতন যখন আমরা তিনজন রোমহর্ষকভাবে এক একটা অধ্যায় বর্ণনা করছি, তখন পরিতোষবাবু হঠাৎ বললেন, কালি-কমলী ধর্মশালার কথা আপনাদের মনে আছে? সেই যে কালো কম্বল গায়ে এক সাধু যে সব ধর্মশালা—

আমরা তিনকণ্ঠে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ···আপনি গিয়েছিলেন নাকি?

পরিতোষবাবু লাজুকভাবে হেসে বললেন, সেই ছেলেবেলায় আঠারো উনিশ বছর বয়েসে—যখন বাড়ি থেকে পালিয়েছিলুম, তখন আমি ওখানেই ছিলুম।

—ওখানে ছিলেন? কতদিন?

—টানা তিন বছর! শীতের সময় হরিদ্বারে নেমে আসতুম, বসন্তে আর গ্রীষ্মে উঠে যেতুম পাহাড়ে। আহা ভালোই ছিলাম!

আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে ছিলেন?—আমাদের প্রশ্নের মধ্যে অভদ্র রকমের অবিশ্বাস। এই রকম একটা গোলগাল হাসিখুশী লোক বাড়ি থেকে পালাতে যাবে কি দুঃখে।

পরিতোষবাবু লাজুক হেসে বললেন, সত্যিই বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম একসময়। তখন আমি ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ি—ফার্স্ট ইয়ার—হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা—

পরিতোষবাবুর গল্পের মধ্যে খুব একটা বিশেষত্ব নেই। ধনী পরিবারের ছেলে, পড়াশুনোয় ভালো, তখনো ব্যর্থ হবার মতো কোনো প্রেমে পড়েন নি, কিন্তু বাড়িতে সৎ মা ছিল—কোনো বিশেষ অসুবিধে ছিল না যদিও, তবুও এক সন্ধেবেলা মন খারাপ করে উনি বাড়ি থেকে চলে যান।

তারপর যথারীতি 'খোকা ফিরে এসো' বিজ্ঞাপন বেরোয়, কিছু পুরস্কারের ঘোষণা হয়েছিল, পরিতোষবাবু নিজে হরিদ্বারে বসে সে কাগজ দেখেছেন, তবু ফিরতে ইচ্ছে হয় নি, 'বাড়ি নয়— ওতো ইটের পাঁজা'—এই ধরনের এক মনোভাব নিয়ে তিনি জীবনে আর কখনো বাড়ি ফিরবেন না বা সংসার করবেন না—ঠিক করে পাহাড়ে উঠে গিয়েছিলেন। তারপর, মাথা মুড়িয়ে, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে পুরো সাধু।

কিন্তু পরিতোষবাবু তাঁর ফিরে আসার কারণটা পুরো ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। শুধু বললেন, ধর্মে কিংবা ভগবানে তো খুব একটা বিশ্বাস ছিল না।

নেহাত বাড়ি বা সংসার সম্পর্কে বীতস্পৃহা নিয়ে বেশিদিন পাহাড়ে থাকা যায় না, বুঝলেন! একটা বাঙালী তীর্থযাত্রী পরিবারের সঙ্গে আলাপ হলো, কথায় কথায় ওরা আমার পরিচয় জানতে পারলেন, তারপর ওদের অনুরোধেই ফিরে এলাম।

একজন স্থানীয় যুবক সেখানে বসেছিল। সে সকৌতুকে বললো, আপনারা আপাতত সেই বাঙালী পরিবারেরই অতিথি। পরিতোষদা সেই পরিবারেরই বড় মেয়েকে বিয়ে করেছেন। লীলাদির সঙ্গে তো আপনার হিমালয়েই আলাপ, না, পরিতোষদা?

নেমন্তন্ন খেতে বসে একজন স্থূলাঙ্গী ভদ্রমহিলাকে দেখলুম, তিনিই পরিতোষবাবুর স্ত্রী। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না পরিতোষবাবুর এবং প্রেমে না পড়েই তিনি গৃহত্যাগী হয়েছিলেন—প্রেমে পড়ার পর সংসারী হয়েছেন—এ পর্যন্ত বেশ স্বাভাবিক। কিন্তু বাড়ি সম্বন্ধে বীতস্পৃহা নিয়ে যিনি সংসার ছেড়েছিলেন, ফিরে এসে তিনি বিল্ডিং কনট্রাকটর হয়ে বহু লোকের বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছেন এখন—এই ব্যাপারটিতে কেমন যেন দমে গেলুম, কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে লাগলো, পরিতোষবাবুর সঙ্গে আর তেমন হেসে কথা বলতে ইচ্ছে হলো না। মানুষ এরকম বিচ্ছিরি ভাবেও বদলায়?

৪২

*****

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্ডেনস-এর মধ্যে আমি বিকেলবেলা একটা সাপ দেখতে পেলাম। সত্যি ঘটনা। তখন পড়ন্ত বিকেল, আবছা লাল রঙের ছায়া পড়েছে বাগান জুড়ে, সূর্য ডুবে গেলেও আকাশে লাল মেঘ, হয়তো ঝড় উঠবে। এই সময় প্রচুর নবীন নারী-পুরুষ বেড়াতে আসে এখানে, জলের পাশে বসে যুবক-যুবতীরা নিজেদের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে।

শুনেছি, প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে সন্ধেবেলা এই স্মৃতি-উদ্যান বেশ উপযুক্ত, কারণ এখানে চোঙা প্যান্ট পরা, সিটি-মারা, অনার্যভাষী ছোকরার দল ঘোরাফেরা করলেও তেমন উৎপাত করতে সাহস পায় না। ফলে, ফুলবাগানের পাশে প্রচুর তরুণ-তরুণী।

অবশ্য, ঐ বাগানে আমার নিজের যাবার কোনো কারণই নেই। আমি সৌভাগ্যহীন, একলা, আমার উপস্থিতি সেখানে অবাঞ্ছিত ও আকস্মিক।

আসলে ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে আমি একা হেঁটে ফিরছিলুম ধর্মতলায়, পথ সংক্ষেপ করার জন্য রেস কোর্সের পাশ দিয়ে বেঁকে ভিক্টোরিয়া গার্ডেনসের মধ্য দিয়ে সটকাটের চেষ্টা করেছি। ঢুকে বেশ ভালো লাগছিল, কতদিন এসব জায়গায় আসিনি, এখানে গাছের পাতার মধ্য দিয়ে শিরশিরে শব্দ হয়, মাঝে মাঝে তরুণ-তরুণীর কণ্ঠে শোনা যায় ফিসফিসিয়ে অভিমান বা উল্লাসের সুর।

সন্ধেবেলা একা কোনো জিনিস ভালো লাগলেই মন খারাপ হয়ে যায়। আমারও যথারীতি মন খারাপ হয়েছিল, সুতরাং আমি আস্তে আস্তে হাঁটছিলুম। এমন সময় চিৎকার শুনতে পেলুম, সাপ, সাপ!

আবার বলছি, সত্য ঘটনা! সাপ শুনেই আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠেছিলাম, বুঝতে পারছিলাম না জলে ঝাঁপিয়ে পড়বো, না গাছে উঠবো। কয়েক কোটি বছর ধরেই আমি সাপকে বিষম ভয় ও ঘৃণা করি।

গোটাকয়েক ছেলে, এদের সঙ্গে কোনো নারী নেই, কিন্তু হাতে ট্রানজিস্টার আছে, ওরাই প্রথমে সাপটিকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। ঘাসের মধ্যে নয়, ঘাস থেকে বেরিয়ে সুরকি-ঢালা রাস্তা পার হবার চেষ্টা করছিল সাপটা, এই সময় ছোকরাদের চেঁচামেচিতে বেশ বিরক্ত হয়ে ওঠে ও মাথা ঘুরিয়ে ফিরে তাকায়।

প্রায় হাত তিনেক লম্বা, ধূসর গায়ের রং, নিশ্চিত বিষাক্ত। কারণ, যে-সাপ সোজা ছুটে না পালিয়ে মুখ ঘুরিয়ে তাকায় সে বিষাক্ত না হয়ে যায় না।

আমি ততক্ষণে আমার জামার সব-কটা বোতাম খুলে ফেলেছি, মুহূর্তে জামা খুলে ফেলার জন্য তখন আমি তৈরি। কারণ, আমি শুনেছিলুম, সাপ দেখলে ছুটে পালানো যায় না, সাপ সামনা-সামনি এসে পড়লে গায়ের জামা খুলে ওর ওপর ছুঁড়ে দেওয়াই নাকি বাঁচার একমাত্র উপায়।

ছেলেগুলো রৈ-রৈ করে উঠলো, কেউ ছুটে পালালো না। আমি অবশ্য জানি ওরা প্রত্যেকেই আমারই মতন কাপুরুষ, কিন্তু দলবদ্ধ হলে কেউ কারুর কাপুরুষতা দেখাতে চায় না। ওরা তখন মার মার, লাঠি নিয়ে আয়, তুই ওদিকে দাঁড়া—এই সব চিৎকার শুরু করলো।

কিন্তু কারুর কাছেই কোনো অস্ত্র নেই, লাঠি তো দূরে থাক, চেঁচামেচিই চলতে লাগলো বেশ খানিকক্ষণ, এর মধ্যে একজন বুদ্ধি করে নিজের পায়ের ছুঁচোলো জুতোর একপাটি ছুঁড়ে মারলো। জুতোটা সাপটার গায়ে লাগলো না, সামনে গিয়ে পড়তেই সাপটা থমকে দাঁড়িয়ে আবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালো। চড়াৎ করে দু'বার বেরিয়ে এলো চেরা জিভ, অল্প একটু ফণা মেলে ধরলো, এ তো নিশ্চিত বিষাক্ত।

আমি তখন যদিও নিরাপদ দূরত্বে আছি, কিন্তু ভয়ে বুক হিম হয়ে এলো।

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, এখানে ওখানে ঘাসের ওপর বসে আছে জোড়ায় জোড়ায় তরুণ-তরুণী, কিন্তু কারুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। ভ্রাম্যমাণ যুগলেরাও কেউ কৌতূহলী হয়ে এখানে এলো না, এদিকে তাকালোই না, হয়তো ভেবেছিল এসব ইয়ার্কি। ছেলের দল সাপটাকে তাড়া করতে লাগলো, সাপটা এবার একটু দ্রুত ভাবে ছুটে মেয়েদের জন্য নতুন তৈরি করা বাথরুমটার পাশে একগাদা জড়ো করা বালির বস্তার ফাঁকে ঢুকে পড়লো।

ছেলের দল কোথা থেকে কয়েকটা ইঁটপাটকেল যোগাড় করে এখন সেই দিকে ছুঁড়ছে। কিন্তু এখন কোনোই ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। সাপটা নিশ্চিন্তে বালির বস্তার আড়ালে লুকিয়ে। লাঠি হাতে একজন উদ্যানরক্ষীকেও দেখা গেল

কাছাকাছি, উত্তেজিতভাবে বোঝান হলো সাপটার অস্তিত্ব, সে ঠোঁট উল্টে বললো, না, সাপ নয়।

—নিজের চক্ষে দেখলুম, ই-য়া বড় সাপ। সাপ নয় কি বলছ।

—কলকাতা শহরে আবার সাপ কোথায়?

—দেখো না ঐ বালির বস্তাটার কাছে গিয়ে!

লোকটি লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে গেল। লাঠি দিয়ে একটা খোঁচা মারলো বালির বস্তার মধ্যে। বেশ দূর থেকেও আমি স্পষ্ট ফোঁস শব্দ শুনতে পেলুম। লোকটির মুখে স্পষ্ট ভয় তবু উদাসীন গলায় বললো, ঢোঁড়া, ঢোঁড়া, বিষ নেই, ও কিছু নয়।

এরপরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চললো, কিন্তু দেখা গেল বালির বস্তা সরিয়ে সাপটিকে খোঁজার সাহস কারুরই নেই। একটু বাদে জটলা ভেঙে গেল। আমি তখনও দাঁড়িয়েছিলাম, এখন মুশকিল হলো এই যে, আমাকে যেতে হলে এখন ঐ বালির বস্তাগুলোর পাশ দিয়েই যেতে হয়। কিন্তু সে কথা ভাবতেই আমার বুক গুরগুর করতে লাগলো।

অবশ্য, ভিড় ভেঙে যাওয়ায় ইতিমধ্যে লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। অনেকে ঐ বালির বস্তাগুলোর পাশ দিয়েই নিরুদ্বেগে হেঁটে যাচ্ছে, কিন্তু ওরা তো জানে না, আমি যে সাপটার অস্তিত্ব জানি। আমি ওপাশ দিয়ে যেতে পারবো না। ইচ্ছে হলে, আমি অবশ্য উল্টোদিকে ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে যেতে পারি, কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে এমন কাপুরুষতা আছে যে আমার নিজেরই লজ্জা করতে লাগলো।

নিজের কোনো ব্যবহারে যখন নিজেরই লজ্জা হয়, তখন মনে হয় যেন আশেপাশের সব লোক আমার সেই বোকামি দেখে ফেলছে। আমার মনে হলো, আমি উল্টোদিক ঘুরে হাঁটতে শুরু করলে আশেপাশের সব লোক যেন হেসে উঠে বলবে, ইস, ভাতু কাঁহাকা! কিন্তু যাই হোক, স্মার্টনেস দেখাতে গিয়ে আমি সাপের পাশ দিয়ে কিছুতেই হাঁটবো না।

সুতরাং আমি পাশের রেস্টুরেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। যেন আমি এখানে চা খেতেই এসেছিলাম। আবার উল্টোদিকে ফিরে যাবো।

তখনও চা খাওয়া শেষ হয় নি, ভয়ার্ত মেয়েলী গলায় রিনরিনি স্বর শুনতে পেলাম, ওমা, এ কি, সাপ সাপ!

—আমি রেস্টুরেন্টে বসে ওদের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—দুটি ছেলে-মেয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘাসের ওপর বসে আছে, খুবই তরুণ বয়স, এখনো কলেজের

গন্ধ লেগে আছে গায়ে। তরুণীটি স্প্রিংয়ের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে উঠলো, যুবকটিও উঠে দাঁড়াতেই তরুণী তার কণ্ঠলগ্না হয়ে বললো, ঐ ত্যাখো, কত বড় সাপ!

আগেকার ছেলেগুলোর চিৎকারে কেউ ভ্রূক্ষেপ করে নি, এবার একটি মেয়ের চিৎকারেই যথেষ্ট কাজ হলো। বহু কৌতূহলী লোক সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে, অনেকে এগিয়েও গেল। একজন আবার চেঁচিয়ে উঠলো, পুলিশ পুলিশ! পুলিশ কোথায়?

দেখা গেল, যুবকটি বেশ সাহসী—অথবা, প্রেমিকার সামনে কে না সাহসী হয়! সে বেশ দৃঢ়স্বরে বললো, দেখতে পেয়েছি, দাঁড়াও, নড়ো না, ভয় নেই।

সাপটা ওদের থেকে পাঁচ-ছ গজ দূরে, যুবকটির হাতে দুখানা মোটা বই ছিল, সে একটা বই ছুঁড়ে মারলো সাপটার দিকে। বইটা সাপটার গায়ে গিয়ে লাগতেই সে ফণা তুলে বইটার ওপর ছোবল মারলো। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বইটা ছুঁড়ে মারলো। সাপটা আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু যথেষ্ট আহত হয় নি, এবার বেশ ভয় পেয়ে সরসর করে ছুটে পালালো।

এরপর অবশ্য বহু খোঁজা-খুঁজি করেও আর সাপটাকে পাওয়া গেল না। নীরক্ত, বিবর্ণা মেয়েটিকে আলিঙ্গনে রেখে যুবকটি বেরিয়ে এলো সুরকির রাস্তায়। মেয়েটি অস্ফুট স্বরে বললো, উঃ আমার কত কাছে এসে পড়েছিল! যদি না দেখতে পেতুম—

আমি ভাবলুম, সাপটা মেয়েটার কাছে গিয়েছিল কেন? সাপটা কি আসলে ছদ্মবেশী শয়তান? ভিক্টোরিয়ার বাগানে না হয়ে ব্যাপারটা যদি ইডেন গার্ডেনে হতো, তা হলে তো বর্ণনা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায়।

এসব বাগানের মালিক কে? যদি ভগবান হয়, তবে আমার বলতে ইচ্ছে হলো, প্রভু, আর কেন ছলনা করছো? ঐ নিষ্পাপ সুকুমার যুবক-যুবতীর পিছনে আবার কেন শয়তানকে লেলিয়ে দিচ্ছো? একবার তো স্বর্গ থেকে পতন হয়ে গেছে, আবার তুমি ওদের কোথায় ঠেলে ফেলে দিতে চাও?

তখন দৈববাণী শ্রবণের মতো অনুভব হলো আমার, একবার যখন ওরা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ফেলেছে, তখন শয়তান আর কোনো প্রেমিক-প্রেমিকার ক্ষতি করতে পারবে না। দেখলি না, ছেলেটি কি রকম অবলীলাক্রমে সাপটার দিকে বই ছুঁড়ে মারলো।

৪৩

*****

মেয়েদের ভালোবাসতে শেখার পরই আমি কুকুরকে ভালোবাসতে শিখি। হ্যাঁ, ভালোবাসা শেখারও তো নির্দিষ্ট স্তর আছে। এখন যে-কোনো যুবতী সুন্দরীকে দেখলে কিংবা তার সঙ্গে কথা বললে—এমন কি দূর থেকে গলার আওয়াজ শুনলেই বুকের মধ্যে রক্ত ছলাৎ করে ওঠে, মনে হয়, এ জীবনটা মধুময়। কিন্তু বেশ মনে আছে ছেলেবেলায় মেয়েদের একদম দেখতে পারতুম না ?

প্রথম ইস্কুল জীবনে, সমবয়সী মেয়েরা যখন গায়ে পড়ে মিশতে আসতো, আমরা মোটেই তাদের পছন্দ করতুম না, বলতুম, তোমরা মেয়েরা আলাদা থাকো না গিয়ে! হায়, সেই যখন মেয়েরা গায়ে পড়ে মিশতে আসতো—তখন তাদের গ্রাহ্যই করিনি, এখন বড় হয়ে ওঠার পর, মেয়েরাই আর আমাকে গ্রাহ্য করে না। কত আত্মাভিমানিনী, তেজী, উদাসীনা, মরীচিকার মতন মেয়েদের দিকে আমাদেরই গায়ে পড়ে ছুটোছুটি করতে হয়!

ছেলেবেলায় বন্ধুদের বাড়িতে ক্যারাম খেলতে যেতুম, কোনো বন্ধুর বোন যদি সঙ্গে খেলার জন্য বায়নাক্কা করতো—তখন তাদের মাথায় গাঁট্টা মেরে ভাগিয়েছি, অথচ, পরবর্তী কালে, হায়, কত বন্ধুর বোনের জন্য যে কত বুক খালি-করা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে!

মেয়েদের না, কুকুরের কথা বলছি এখন। ছেলেবেলায় আমি কুকুর একেবারে সহ্য করতে পারতুম না। আমার ছোটকাকার একটা বিশ্রী, জঘন্য কুকুর ছিল, সেটা ন্যাকার মতন সব সময় পায়ে লুটোপুটি করতো, আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতুম না তাকে। ছোটকাকার কাছে কোনোদিন আমি পয়সা চেয়ে পাইনি, অথচ কুকুরের জন্য—সাবান, ডগ বিস্কুট, (আমি নিজেই সে বিস্কুট দু'একখানা লুকিয়ে খেয়ে দেখেছি, খুব খারাপ খেতে নয়) রবারের বল, রঙিন বগ্‌লস কিনে দিতে তিনি উদারহস্ত।

এটাই কুকুরটার প্রতি আমার শত্রুতার ছিল প্রধান কারণ। কুকুরটাও আমার দিকে এমন চোখ মিটমিট করে তাকাতো—যার মধ্যে আমি স্পষ্ট একটা আদুরে হিংসুকপনা দেখতে পেতুম। আবার লালি, লুল্লু, লালটুসোনা এই রকম কত ন্যাকা নাম ছিল তার। কুকুরটা ছিল ছোট্টখাট্ট সুযোগ পেলেই আমি সেটাকে আড়ালে লাথি কষাতুম।

আমার দাদার এক বন্ধুর বাড়িতেও আমি যেতে পারতুম না কুকুরের ভয়ে। অবনীদা আমাকে দেখলেই বলতেন হেমেন রায়ের যখের ধন পড়েছিস? শিবরামের মণ্টুর মাস্টার পড়েছিস? আমাদের বাড়িতে আসিস, অনেক বই আছে, নিয়ে যাস্! অবনীদাদের বাড়ির দরজায় একটা সিংহের মতো আকৃতির কুকুর বাঁধা থাকতো, মানুষ দেখলেই সেটা মেঘ-গর্জনের মতো গম্ভীর গলায় ভঁাউ ভঁাউ করে ডাকতো! সেই ডাক শুনে সে বাড়ির ধারে কাছে যাবারও সাহস ছিল না আমার।

কুকুরের মতন অমন একটা ভয়ংকর জিনিসকে কেন মানুষ বাড়িতে খাতির করে রাখে আমি বুঝতেই পারিনি। একদিন ইস্কুল থেকে ফেরার পথে, হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই, একটা নেড়িকুত্তা আমার পায়ে এসে খ্যাক করে কামড়ে দিল। খুব বেশী লাগে নি বটে, কিন্তু বাড়িতে এসে সে কথা বলতেই সবাই আঁতকে উঠে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কী রকম কুকুর ছিল? ল্যাজ গোটানো কান ঝোলা? জিভ দিয়ে লালা পড়ছিল?

ওসব কিছুই আমি লক্ষ্য করিনি, সবাই বললো, আমার নাকি জলাতঙ্ক হতে পারে। ইনজেকশন দেওয়া হলো, তবু আমার জলাতঙ্কের আতঙ্ক কাটে না। তারপর প্রায় এক বছর, গ্লাস, চৌবাচ্চা, নদী—যেখানেই জল দেখেছি আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছি, ভেবেছি, জল দেখে কি আমার আতঙ্ক হচ্ছে? বুঝতে পারিনি, অনেকক্ষণ জলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেরই চোখে জল এসে গেছে।

তারপর তখন ক্লাস নাইনে পড়ি, আমাদের পাড়ায় নতুন ভাড়াটে এলো। একটু অদ্ভুত ধরনের লোক, ওরা বর্মা-ফেরত বাঙালী। ও বাড়ির লোকেরা হলুদ-সবুজ-রঙা সিল্কের লুঙ্গি পরে। ও বাড়ির ছেলেরা বাবাকে বলে ড্যাডি। ও বাড়িতে প্রায় সব সময় গ্রামোফোনে বিলিতি বাজনা বাজে। ওরা দোলের দিনও রঙ খেলে না, ছাদে নেট খাটিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলে।

এক দিন, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, ওপর থেকে ব্যাডমিণ্টনের কর্ক ঠক করে এসে আমার মাথায় পড়লো। তিনতলা ছাদের কার্নিস থেকে উঁকি মেরে একটি

চতুর্দশী বালিকা সুরেলা গলায় আমার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললো, বলটা একটু ওপরে পৌঁছে দেবেন, প্লীজ—।

সেই থেকে আরম্ভ। তখন নাক ও ঠোঁটের মাঝখানে একটা কালো রেখা দেখা দেওয়ায় নিজেকে ছেলের বদলে পুরুষ হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করেছি। ট্রামে বাসে কেউ 'তুমি' বললে চটে যাই। চেনাশুনো মেয়েদের দেখলে ভুরু তুলে গম্ভীর হয়ে থাকি, মনে মনে তাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব। মনে হয়, আহা বেচারারা শুধু ছেলেবেলা নিয়েই মেতে থাকে। কোনো মেয়ে তখন আমাকে কিছু অনুরোধ করার কথা কল্পনাই করতে পারে না।

সেই সময়, তিনতলার ছাদ থেকে একটা চোদ্দ বছরের মেয়ের সরাসরি হুকুম, বলটা ওপরে পৌঁছে দিন! কিন্তু তা শুনেই আমার মনে হলো, স্বর্গ থেকে কোনো দেবী আমাকে ডাকছেন। আমি কর্কটা হাতে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলাম। কী যেন ছিল মেয়েটির নাম, শোভনা কিংবা সুশোভনা, ঝকঝকে ফর্সা রং, ঘাগরার মতন কুচি দেওয়া লাল টুকটুকে স্কার্ট পরা, গড়গড় করে ইংরাজিতে কথা বলছে, কর্কটা নেবার সময় আমার হাতে মেয়েটির ছোঁয়া লাগলো, ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠলো আমার সারা শরীর। সেই দিন থেকেই আমার মেয়েদের প্রেমে পতন এবং মূর্চ্ছার আরম্ভ।

আমরা ইস্কুলের তিনজন বন্ধু—প্রত্যেক দিন বিকেলে শোভনাদের বাড়িতে যেতাম। শোভনা আমাদেরই সমবয়েসী, অনায়াস স্বচ্ছন্দ ওর ব্যবহার। আমাদের রেকর্ড শোনাতো, আমাদের সঙ্গে ওয়ার্ড মেকিং খেলতো, আমরা মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখতুম। আমরা তিনজনেই ওর প্রেমে পড়ে গেলুম। শোভনার মা আমাদের নানারকম খাবার খাওয়াতেন, সেইসঙ্গে রেফ্রিজারেটরের ঠাণ্ডা জল। তার আগে আমি কখনো অত ঠাণ্ডা জল খাইনি। এক দিন তিনি নানারকম পায়েস আর পিঠে খাওয়ালেন, বললেন, তোমাদের বাড়িতে এসব হয় নি? আজ যে নবান্ন!—আমরা কলকাতায় থেকেই নবান্নের কথা ভুলে গিয়েছিলুম, ওঁরা বর্মায় থেকেও তা ভোলেন নি।

শোভনার মা শুধু রাগ করতেন, আমাদের ক্যারাম খেলা দেখলে। বলতেন, ওসব বসে বসে কুড়েমির খেলা কেন, ছুটোছুটি করো না—আমরা তখন সারা বাড়ি জুড়ে লুকোচুরি খেলতাম, শোভনা বলতো, যে আমায় প্রথম খুঁজে বার করতে পারবে, তাকে আমি একটা স্পেশাল প্রাইজ দেবো!—এই কথা বলে শোভনা রহস্যময়ভাবে হাসতো, আমি ভাবতাম, আমিই যদি ওকে প্রথমে খুঁজে না পাই—তবে আমার সারা জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে!

কিন্তু মেয়েদের কথা লেখার জন্য এ লেখাটা শুরু করিনি। কুকুরের কথা—কুকুরও না, কাকের কথা।

যাই হোক, শোভনাকে দেখে মুগ্ধ হবার পর, আমি কুকুরকেও ভালোবাসতে শুরু করি। শোভনাদের বাড়িতে একটা মাঝারি সাইজের কুকুর ছিল, আমি প্রথম প্রথম সেটাকে দেখে আড়ষ্ট হয়ে থাকতুম। কিন্তু সেটা জাতে কুকুর হলেও স্বভাবে ছিল বিড়াল—এমন বাধ্য। শোভনা হুকুম করতো, স্ট্যাণ্ড আপ, টেডি। অমনি সোজা হয়ে দাঁড়াতো। শোভনা বলতো, শেক হ্যাণ্ডস, টেডি! কুকুরটা অমনি একটা হাত বাড়িয়ে দিতো।

বস্তুত, শোভনার যে কোনো হুকুম পালন করার জন্য আমি কুকুরটার চেয়েও বেশী বাধ্য ছিলুম তখন। কিন্তু, শোভনাকে খুশী করাব জন্যই, আমি কুকুবটাব সঙ্গে ঝগড়া করিনি। কুকুরটার সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে যায়। আমার জীবনে সেই প্রথম কুকুব বন্ধু।

এখন শোভনা কোথায় হারিয়ে গেছে, কিন্তু কুকুর জাতটার প্রতি আমার বন্ধুত্ব রয়েই গেছে। কোথাও কোনো বাড়িতে গিয়ে কুকুর দেখলে একটু আদর করতেই ইচ্ছে হয় এখন। মাথায় চাপড় মারি না বটে, কিন্তু মুখ দিয়ে চুঃ চুঃ শব্দ করি। এবং সব বাড়িতে গিয়েই গৃহ-স্বামিনীকে খুশী করাব জন্য বলি, আমি অনেক কুকুর দেখেছি, কিন্তু এমন আশ্চর্য ভালো কুকুব কোথাও দেখিনি। কী সুন্দর চোখ দুটো, একেবারে মানুষের মতন।

আমাদের বাড়িতে কোনো কুকুর নেই, কিন্তু আজ সকালবেলা দোতলাব বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিচে একটা ছোট্ট কুকুর দেখতে পেলাম। একটা খয়েরি রঙের নেড়িকুত্তার বাচ্চা নিচের রকে বসে কিউকিউ করে ডাকছে।

পাশের বস্তির দু'তিনটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে সেটাকে খোঁচাখুঁচি করছে, একজন আবার ওটার ল্যাজে দড়ি বেঁধে টানছে। এ সব কুকুরের বাচ্চাবা যে কোথা থেকে আসে, কোথায় আবার যায়—কেউ জানে না!

সকালবেলায় সব মানুষেবই মন একটু উদার থাকে। সুতরাং কুকুবের বাচ্চাটার প্রতি আমার বেশ খানিকটা দয়া হলো। ভাবলুম, বাচ্চা ছেলেমেয়ে-গুলোকে একটু ধমকে দিই। কিন্তু তখনই ওদের প্রতিও দয়া হলো। মনে হলো, আহা ওদেরও তো একটু খেলাধুলোর জিনিস পাওয়া দরকার। ওরা কুকুরটাকে নিয়ে খেলছে, খেলুক না। কুকুরটার যদি বাঁচার হয়, এমনিতেই বাঁচবে, কিংবা কপালে মৃত্যু থাকলে মরবেই।

পরক্ষণেই মনে হলো, এটা বেশী দয়ার বাড়াবাড়ি। অতএব বাচ্চাগুলোকে

বারণ করাই ঠিক করে, ওপর থেকে প্রচণ্ড এক ধমক লাগালাম। বাচ্চাগুলো পালিয়ে গেল।

তারপর মনে পড়লো, শুধু মনে মনে দয়া করাই যথেষ্ট নয়। কুকুরটাকে কিছু খাওয়ানোও উচিত। কিন্তু সকালবেলা কুকুরের খাবার কোথায় পাবো? ও আছে তো! পর পর পাঁচ দিন রুটি খেয়ে আমার মুখ পচে গেছে, কাল রাত্রে আর খেতে পারিনি। কাল রাত্রের রুটিগুলো এখনও খাবার টেবিলে পড়ে আছে। সেই কয়েকখানা রুটি নিয়ে এলাম।

অতটুকু বাচ্চা কি রুটি খেতে পারবে? এক টুকরো ছিঁড়ে গুলি পাকিয়ে ওর মুখের সামনে ছুঁড়ে দিলাম। বাচ্চাটা এসে রুটিটা কপাৎ করে গিলে, লোভীর মতন ওপরে তাকালো। আমি আর একটা টুকরো ছুঁড়ে দিলাম! আর, তখুনি একটা মজার ব্যাপার হলো।

একটা কাক কোথা থেকে টুক করে দ্বিতীয় রুটির টুকরোটা তুলে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এলো আরও পাঁচটা কাক। পরের রুটির টুকরোও কাকের মুখে গেল। এর পর আরও কাক এলো, প্রায় পনেরো ষোলোটা কাক। এত কাকও যে কোথায় ছিল কে জানে। শুরু হলো ছিনিমিনি খেলা। আমি রুটির টুকরো গুলি পাকিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছি, কাকের দল মাঝপথে হাওয়া থেকেই সেটা মুখে লুফে নিচ্ছে। দু'একটা টুকরো দৈবাৎ পড়ছে কুকুরটার সামনে, সে সেটা খেয়ে নিয়ে কাকেদের দিকে তাড়া করে যাচ্ছে।

ব্যাপারটার মধ্যে একটা মজার খেলা পেয়ে আমার বেশ ভালো লাগলো। আমি অনবরত রুটি ছুঁড়ে দিতে লাগলুম।

মাথার মধ্যে একটা ঝিনঝিনে শব্দ হতে লাগলো, এই ব্যাপারটা থেকে কি যেন আমার মনে পড়ার কথা। কি যেন মনে পড়ার কথা, কি যেন, অমনি মনে পড়লো, হঠাৎ শোভনার কিশোরী মুখ। শোভনাদের বাড়ি, ওর মা, সেই লুকোচুরি খেলা। কিন্তু কাকদের ওড়াউড়ির সঙ্গে শোভনাদের বাড়ির কথা মনে পড়ার কি সম্পর্ক? কিছু একটা আছে, মনে করতে পারছি না, কিছু একটা।

যেই সেটা মনে পড়লো, অমনি আমি একা একা হেসে উঠলুম। সত্যি যোগাযোগটা মজার। শোভনার মা এক দিন নানারকম পায়েস আর পিঠে খাইয়ে বলেছিলেন, আজ নবান্ন, তোমাদের বাড়িতে এ সব হয় না? নবান্নর দিন নতুন পায়েস খেতে হয় সবাইকে। শুধু নিজেরা নয়, পশু-পাখিকেও খাওয়াতে হয়। খুব ছেলেবেলা ঢাকায়, আমাদের দেশের বাড়িতে, আমরা

নবান্নর দিন আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে কাকদের ডাকতাম! এখন কলকাতায় কবে নবান্ন তা টেরই পাওয়া যায় না! তোমরা যাও, ছাদে গিয়ে কাকদের খাইয়ে এসো আগে, শোভনা, যা ওদের ছাদে নিয়ে যা।

কী আনন্দ লেগেছিল ছাদে সেদিন ছোটাছুটি করতে। নতুন চালের মিষ্টি গন্ধ আর শোভনার হাসির শব্দ একসঙ্গে মিলেমিশে আমার কৈশোরের সে দিনটাকে রঞ্জিত করে দিয়েছিল। নিচে নেমে আসার পর সবাই লাইন করে বসেছিলাম, শোভনার মা আমাদের পরিবেশন করেছিলেন। কি মিষ্টি ছিল তাঁর হাতের রান্না।

মজার কথা এই, আজও নবান্নের দিন। সকালের খবরের কাগজেই সে কথা পড়েছি, আমাদের বাড়ির কারুর সে কথা মনেই নেই। নবান্নের দিন কাকদের নতুন চালের ভাত খাওয়ানো নিয়ম না? কাকেরা বোধ হয় সেই প্রতীক্ষাতেই ছিল। আমি না জেনেই তাদের বাসি রুটি খাওয়াচ্ছি।

৪৪



এখনো মাঝে মাঝে আমি মশা মারতে গিয়ে নিজের গালে থাপ্পড় মেরে বসি। পেল্লায় সেই থাপ্পড়ের চোটে নিজের গালটা যখন জ্বলতে থাকে, তখন নিজের ওপর না মশার ওপর, কার ওপর যে বেশী রাগ হয় বুঝতে পারি না।

অনেক কিছুই এখনও বুঝতে পারি না। আমার দাদার ছোট ছেলে বিল্টু একটা ফড়িং-এর ডানা ছিঁড়ে ফেলেছে নিষ্ঠুরভাবে, দেখে আমার এমন অসম্ভব শরীর শিউরে উঠলো যে, আমি ঠাস করে ছেলেটার গালে এক চড় কষালুম। আমার চাষাড়ে হাত, ছেলেটার কচি মুখমণ্ডল মুহূর্তে রক্তিম হয়ে উঠলো। টল-টলে জলভরা দু চোখে যত রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে আমায় জিজ্ঞেস করলো, কাকা, তুমি আমায় মারলে কেন?

কেন? মুখ ঝামটা দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়লো, সত্যিই তো, ঠিক কেন মারলুম? ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকরা যখন গিনিপিগ খুন করে, তখন গিয়ে থাপ্পড় মারি? আমি নিজেই তো আই. এস. সি পড়ার সময় কত ব্যাঙ কেটেছি। কেউ আমায় সেজন্য শাস্তি দিয়েছে? বরং, ব্যাঙ না কেটে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ফেল করলেই বহু শাস্তি পাবার সম্ভাবনা ছিল। বিল্টুর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে ওর কি পদ্ধতি কে জানে? আজ ফড়িং-এর ডানা ছিঁড়ছে ভবিষ্যতে ও যে আর একজন ডারুইন হবে না—তা কে বলতে পারে? সুতরাং আমি বললুম, আচ্ছা যা, বিকেলে তোকে চকলেট কিনে দেবো এখন!

আমার বন্ধু প্রদীপ মোটরগাড়ি কিনেছে, পথের মোড়ে দেখা হওয়ায় বললো, চল্, তোকে বাড়ি পৌঁছে দিই। বৃষ্টির পর সারা রাস্তা ভিজে ছপছপে, তবুও পুজোর বাজারে অধার্মিক ক্রেতা-বিক্রেতার প্রবল ভিড়। রাস্তা গিসগিস করছে, গাড়ি চালানো সত্যিই মুশকিল। এক ভদ্রমহিলা দুটি বাচ্চা নিয়ে একেবারে গাড়ির সামনে পড়েছিলেন, বিকট আওয়াজে ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে একটুর জন্য দুর্ঘটনা হলো না। প্রদীপ রুক্ষ মুখে বললো, দেখলি কাণ্ডটা। যদি এক সেকেণ্ড দেরি হতো, পাবলিকের হাতে আমায় মার খেয়ে মরতে হতো! লোকে রাস্তা চলতে জানে না—যত দোষ ড্রাইভারের—

আমি বললুম, যা বলেছিস্। অধিকাংশ লোকই শহরে থাকার যোগ্য নয়।

বিহারী মজুরগুলোকে ত্থাখ না—সব সময়েই যেন চান করতে যাচ্ছে, কাঁধে একটা গামছা। রাস্তায় হাঁটার সময় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে যখন তখন যেখানে সেখানে চুলকোবে! বাঙালগুলোও এতদিন কলকাতা শহরে আছে—অথচ রাস্তায় হাঁটার সময় যাবে একদিকে, তাকাবে আর একদিকে! সব কটা এণ্ডি-গেণ্ডি বাচ্চাকে নিয়ে পথে বেরুনো চাই—

প্রদীপ বললো, শুধু বাঙালদের দোষ দিস্ না, আমিও বাঙাল। কিন্তু ফুট-পাথ দিয়ে হাঁটার অভ্যেস কারুরই নেই। পুলিসের উচিত জেব্রা ক্রসিং দিয়ে সবাইকে রাস্তা পার হতে বাধ্য করা! এত গাড়িঘোড়া কলকাতা শহরে—

আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে জোর দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই কতকগুলো সাধারণ ট্রাফিকের নিয়ম না জানলে কারুকে কলকাতা শহরে ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়। হা-হা করে মাঝরাস্তা দিয়ে গল্প করতে করতে যাবে—হঠাৎ এপার থেকে ওপারে ছুটে যাবে, এদের ধরে ধরে শাস্তি দেওয়া উচিত।—

অথচ, নিজে যখন আমি পায়ে হেঁটে যাই, তখন মোটরগাড়ির উৎপাতে আমার গা জ্বলে যায়! ফর্সা জামা-কাপড় পরে পথের ধার ঘেঁষেই যাচ্ছি, কোথা থেকে একটা মোটরগাড়ি হুস্ করে কাদা ছিটিয়ে জামা-কাপড়ে বাটিকের কাজ তুলে দিয়ে গেল! নিষ্ফল আক্রোশে আমি মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে থাকি সেই অপস্রিয়মাণ গাড়িটার দিকে। তখন আমার মনে হয়, পথ তো পথচারীদের জন্যই। কলকাতা শহরে আর গাড়ি আছে কটা লোকের? পদযাত্রীরাই তো পথের মালিক। গাড়িওলাদেরই উচিত পথের লোকদের বাঁচিয়ে সাবধানে গাড়ি চালানো। যদি না পারো, গাড়ি না চালালেই হয়!

তবে, আমি প্রদীপকে ও কথা বললুম কেন? শুধু কি ওকে খুশী করার জন্যই! কোনো তো দরকার ছিল না, ওকে খুশী না করলেও ওতো আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিত ঠিকই। কিংবা, প্রদীপের বিপরীত কথা বললেই যে ও চটে যেতো, তারই বা মানে কি আছে? তাহলে ও কথা বললুম কেন?

অনেক কেন'রই উত্তর জানি না। বারান্দা দিয়ে দেখলুম, একটা চড়ুই পাখি গুটি গুটি হাঁটছে। কাছে গেলেও উড়লো না। উড়তে শেখে নি। তা হলে তো বেড়ালের পেটে এক্ষুনি প্রাণ যাবে! তাড়াতাড়ি আমি চড়ুই-এর বাচ্চাটাকে ঠাকুরঘরে এনে রাখলুম, জানালা বন্ধ করে। ওর খাবার জন্য চালের খুদ ছড়িয়ে দিলাম সামনে।

সে সময় আমাদের কুচু নামে একটা পোষা বেড়াল ছিল খুব গুণ্ডা ধরনের। বেড়ালটা এমন ভাবে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো যেন—সব কথাই বুঝতে

পারে। আমি তাকে কান ধরে শাসিয়ে দিলুম। আমি তাকে বললুম, ছাখ, এখন ক'দিন আমি তোকে না চিবিয়েই মাছের কাঁটা দেবো, মাংসের হাড় একেবারে সাদা করবো না, কিন্তু তুই খবর্দার ঐ পাখিটাকে ধরতে যাবি না, বুঝলি!

কিন্তু বেড়ালের জাত তো! বিকেলের দিকে কোন্ ফাঁকে ঠিক ঢুকে পড়েছে, পাখিটার ওপর ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে আমি উপস্থিত। নিমকহারাম বেড়ালটার ওপর এমন রাগ হলো যে দরজার খিল দিয়ে আমি ওকে মেরে পা খোঁড়া করে দিলুম। বেড়ালটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে একেবারে বাড়ি ছেড়েই পালালো। মনে হলো, চড়ুই-এর বাচ্চাটা আমার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

পরদিন সকালবেলাই দেখা গেল, পাখিটা মরে কাঠ হয়ে আছে। বেড়াল ওকে ছোঁয়ওনি। তবু মরলো কেন? খাবারও তো দিয়েছিলুম, বেশ খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। তবে?

একটু ভাবতেই বুঝতে পারলুম, সম্পূর্ণ দোষ আমারই। আমি পাখিটাকে খাবার দিয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু জল দিইনি। পুরো দেড়দিন জল না খেয়ে মানুষই বাঁচতে পারে কিনা সন্দেহ এতো একটা পাখি। বেড়ালটা খাদ্য হিসেবে পাখিটাকে মারতে গিয়েছিল স্বাভাবিকভাবে, আর আমি অমনোযোগের সঙ্গে দয়া দেখাতে গিয়ে অকারণে পাখিটাকে মারলুম।

মরার পর পাখিটার চোখ সাদা হয়ে গেছে। কালকের বেড়ালমারা ভাঙা খিলটা দেওয়ালের এক পাশে দাঁড় করানো! বাড়ির কেউ যাতে আমাকে না দেখে ফেলে, আমার পাপের কথা যাতে পৃথিবী জানতে না পারে, তাই আমি চুপি চুপি পাখিটার পা ধরে তুলে নিয়ে ছাদের কোণে ফেলে আসতে যাচ্ছিলুম। একগাদা চড়ুই আমার মাথার ওপর ওড়াউড়ি করে আমার অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছে। ছাদের পাঁচিলের ওপর বেড়ালটা বসে আছে, অলস চোখ তুলে আমাকে দেখে বেশ দীর্ঘ মীড় খেলানো গলায় বললো, মিঁ—আ—ও—ও!

তৎক্ষণাৎ পশুপক্ষীর ভাষা আমার শেখা হয়ে গেল। আমি বেড়ালটার বক্তব্য স্পষ্ট বুঝতে পারলম। চোখের মণিটা বিন্দুর মতন ছোট করে, অদৃশ্য ভুরু কুঁচকে বেড়ালটা আমাকে বলছে, খুব তো নকল দয়া দেখাতে দেখাতে যাওয়া হচ্ছিল! এখন! শুধু শুধু আমাকে মারলে কেন?

আবার, কেন? আর পারি না। আশেপাশে কোনো মশা নেই, তবু আমি নিজের গালে কষে এক থাপ্পড় বসালুম। আর কোনো যুক্তিটুক্তির মধ্যে যাচ্ছি না আমি। পৃথিবীতে যা চলছে তাই চলুক। এসব 'কেন'র উত্তর খুঁজতে খুঁজতে মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়!

৪৫

*****

ল্যান্সডাউন রোডে একটা বড় গাড়ি-বারান্দাওয়ালা বাড়ি। বাড়ির সামনে লোহার গেট। গেটের মাথায় এবং দেয়ালে মাধবীলতার ঝোপ। গেটের ওপাশে একটি নারী। সেই নারী দু হাতে লোহার গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, একটু ভারি স্বাস্থ্য, মাথায় ঘন থোকা থোকা চুল, খুব ফর্সা রং, রাত্রি ন'টার অন্ধকারে তাঁর মুখখানি যেন গন্ধরাজ ফুলের মতন ফুটে আছে। এ সবই আমার এক পলকে দেখা।

গেটের বাইরে, রাস্তার উপর একটি যুবক দাঁড়িয়ে! যুবকটিও ভারী রূপবান, দৃঢ় স্বাস্থ্য, দীর্ঘ দেহ। প্যাণ্ট ও শার্ট পরা, কিন্তু দেখলে মনে হয় কিছু আগে গলায় টাই বাঁধা ছিল। কি করে একথা মনে হয়, তা আমি বোঝাতে পারবো না, কিন্তু আমার নিশ্চিত মনে হলো বিকেল পর্যন্ত যুবকটি টাই অবস্থায় সুসজ্জিত ছিল, একটু আগে খুলে রেখেছে। যুবকটির দাঁড়ানোর ভঙ্গি একটু অদ্ভুত, সে গেটের ওপাশের মহিলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে পাশ ফিরে, যদিও তার একটি হাত গেটের লোহার শিক ধরা।

তবে ওই দুজনের দাঁড়ানো বেশ ঘনিষ্ঠ ছবির মতন, মহিলা তাঁর মুখ চেপে ধরেছেন গেটের ওপর, তাঁর মুখের খুব কাছেই যুবকটির হাত। এই দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে একটি মিষ্টি দুঃসাহস আছে, রাত্রি ন'টায় অসংখ্য পথচারীর দৃষ্টিকে গ্রাহ্য নেই! সেই বাড়ির লোকেরও কারুর কোনো আপত্তি থাকলে ওরা তুচ্ছ মনে করেছে।

এ সবই আমার এক পলকের দেখা। আমি ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে হেঁটে আসছিলুম, হঠাৎ ওদিকে চোখ পড়লো! এ রকম দৃশ্য ফিল্মে খুব দেখা যায়, কিন্তু রাত ন'টায় কলকাতায় দেখতে পেয়ে ভারী ভালো লাগলো! কিন্তু যখন আমার চোখে পড়েছে, তখন আমি ওদের খুবই কাছাকাছি, একটু বেশীক্ষণ ধরে দেখার জন্য গতি শ্লথ করতে পারি না, তা ছাড়া সেই মহিলার মুখের দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করাও ভদ্রতাসম্মত নয়।'

সুতরাং আমি ঘাড় নিচু করে খুবই নাগরিক ভঙ্গিতে, যেন আমি ওদের দেখতেই পাইনি এই ভাবে—ওই জায়গাটুকু পেরিয়ে এলুম। কিন্তু আমার শ্রবণেন্দ্রিয় ছিল ধনুকের ছিলার মতন টান্‌টান, ইঁদুরের মতো উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম ঐটুকু সময়। আমি দুটি আশ্চর্য কথা শুনতে পেলুম। মহিলাটির গলা কান্না-বিজড়িত, মনে হয় তিনি অনেক দিন ধরে কাঁদছেন, মহিলাটি কান্নায় ভাঙা গলায় বললেন, সত্যিই তুমি পারো না ?

ছেলেটি স্পষ্ট অথচ চাপা গলায় বললো, না, আমি যে বিদেশী !

তারপর আমি একা হাঁটতে হাঁটতে বহু দূর চলে গেলাম। একবারও পিছন ফিরে তাকাই নি। হয়তো আর ইহজীবনে ঐ দুজনকে দেখবো না। দেখলেও চিনতে পারবো না—ওরা যদি মোটরগাড়ি চেপে হুস্‌ করে চলে যায় আমার চোখের সামনে দিয়ে, কিংবা দেখা হয় রেলের কামরায়, কিংবা বোটানিকাল গার্ডেনের পিকনিকে দেখি ওদের হুড়োহুড়ি করতে, আমি চিনতে পারবো না। কারণ, আমার চোখে ভেসে আছে ঐ অদ্ভুত দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি, মহিলাটি গেটে মুখ চেপে, যুবকটি পাশ ফিরে—এবং দুটি বাক্য, সত্যিই তুমি পারো না ?—না, আমি যে বিদেশী !

পৃথিবীর কঠিনতম ধাঁধার মতো ঐ দুটো কথা। কী ওর মানে ? দুজনেই কথা বলছিলেন বাংলায়। উচ্চারণে সামান্যতম জড়তা ছিল না, ওদের বাঙালী না হবার কোনই সম্ভাবনা নেই, তবু ছেলেটি কেন বললো, না, আমি যে বিদেশী ! মহিলাটি কেঁদে কেঁদে যুবকটির কাছে কী প্রার্থনা করছিলেন ? উদ্ধার ? কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, সেই বাড়ির গেট এক পাল্লা খোলা ছিল, মহিলাটি অনায়াসে বাইরে আসতে পারতেন, যুবকটি যেতে পারতো ভিতরে, তবু ওরা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল সমকোণে, লোকচক্ষু বা বাড়ির শাসন অবহেলা করে। মহিলাটির চোখে জল। এবং নিশ্চিত বাঙালী হয়েও ছেলেটি উদাস গলায় বললো, না, আমি যে বিদেশী !

সেই দাঁড়িয়ে থাকার ছবিটি ও দুটি মাত্র সংলাপে কি যেন এক গভীর দুঃখের সুর ছিল। দুঃখ মানুষকে বড় কাছে টানে। আমি তো আনন্দের দৃশ্যও কম দেখিনি। গিয়েছি কার্নিভালে, মেলায়, সমুদ্রতীরে। দেখেছি উচ্ছল, সুখী, মানুষ-মানুষীর মুখ। দেখেছি পার্টিতে দৃপ্ত যুবা-যুবতীর নাচ, এরোপ্লেনের সীটে দেখেছি কলহাস্যময় নবীন দম্পতি, সমুদ্রপারে খুশী-চঞ্চলা পুরুষের বাহুলগ্না নারীর এমন খলখল হাস্য শুনেছি—যার কাছে সমুদ্রের গর্জনও ম্লান হয়ে গেছে।

কিন্তু তাদের অধিকাংশ মুখ মনে পড়ে না। কিন্তু চকিতে শোনা দু-একটা

দীর্ঘশ্বাস বা চাপা কান্না—সেই সব মুখ বা ভঙ্গি কিছুতে ভুলতে পারি না। খুব জানতে ইচ্ছে করে, তাদের গল্পটা কী। দুঃখের মধ্যে যেন একটা অফুরন্ত গল্প আছে। সুখের গল্প বড় একরকম, কিন্তু দুঃখের গল্প সব সময়েই রহস্যময়, বহু বিচিত্র, আদি অন্তহীন।

আর একটা দৃশ্য মনে পড়ে। এক সময় আমার খুব মাথা ধরতো সন্ধের দিকে। ভেবেছিলাম, এবার বুঝি চশমা নিতে হবে। কিন্তু তখনও আমার দৃষ্টিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, মাথা ধরা অবস্থাতেও এক মাইল দূরে কোনো শাড়ির আভাস দেখতে পেলে বলে দিতে পারতুম মেয়েটির বয়েস কত। সুতরাং অনেকে বললে, চোখের অসুখ ছাড়াও অন্য কারণে মাথা ধরতে পারে, ডাক্তার দেখাও!

ডাক্তার জাতকে আমি সাধারণত এড়িয়ে চলি। কারণ, সাধারণভাবে আমার ধারণা ছিল, ডাক্তারদের হৃদয় নেই।

যাই হোক, ডাক্তারদের কাছে যেতে হলে খুব বড় ডাক্তারের কাছে যাওয়াই ভালো—এই ভেবে, কলকাতার একটি বড় হাসপাতালের একজন বিখ্যাত ডাক্তার সপ্তাহে একদিন আউট ডোরে বসেন খোঁজ নিয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তখন প্রায় দুপুর। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ডাক্তারের ঘরে আমার ডাক পড়লো।

ঘরে ঢুকেই আমি বুঝতে পারলুম, এখানকার আবহাওয়া অন্যরকম। কি যেন একটা নাটক এখানে অনুষ্ঠিত হবে এখুনি। ডাক্তারটি প্রায়-প্রৌঢ়, কিন্তু সুকুমার মুখ, টেবিলে বসে কী যেন লিখছেন। আর একটি অল্পবয়সী মেয়ে, সেও ডাক্তার, কেননা বুকে স্টেথস্কোপ ঝোলানো, এক পাশে দাঁড়িয়ে।

এই দৃশ্যের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছুই নেই, কিন্তু সেই দুজন নারী-পুরুষের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলুম, এখানে একটা গভীর নাটক আছে। মেয়ে-ডাক্তারটি অত্যন্ত সুন্দরী, তেজী চেহারা, কিন্তু কী অস্বাভাবিক বিষণ্ণ মুখ। ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, দু চোখে যেন পাতলা জলের পর্দা, এমন দীর্ণ কাতর মুখ আমি বোধহয় কখনো দেখিনি। আমার বুকের মধ্যে নীরবতীক্ষ্ণ আর্তনাদ জেগে উঠলো, ইচ্ছে হলো আমি মেয়েটিকে বলি, কী তোমার দুঃখ? এমন কঠিন দুঃখও মানুষ পায়?

ডাক্তারের মুখ রেখাহীন, গম্ভীর। টেবিল থেকে চোখ তুলে আমাকে বললেন, বলুন?

আমি একটিমাত্র বাক্যে আমার রোগের কথা জানালুম। কিন্তু, তখন আর আমার কোনো কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, ইচ্ছে ছিল না চিকিৎসার। বরং ইচ্ছে করছিল, তখুনি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি যেন একজন দর্শক, হঠাৎ

ভুল করে নাটকের মাঝখানে মঞ্চের ওপর উঠে পড়েছি, আমার উপস্থিতি যেন আমারই লজ্জা।

ডাক্তার কড়িকাঠকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ব্লাড পেসারটা দেখা দরকার।

মেয়ে ডাক্তারটি আমাকে একটি অয়েল ক্লথ মোড়া বিছানা দেখিয়ে খুব আস্তে বললেন, শুয়ে পড়ুন। আমি নির্দেশ মান্য করলুম, মেয়েটি আমার বাহুতে কাপড়ের পাট জড়াতে লাগলেন। আমি শুধু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কি ক্লান্ত, অলসভাবে তিনি আমার হাতে ব্যাণ্ডেজ জড়াচ্ছেন, যেন যে-কোনো মুহূর্তে দু' হাতে মুখ চেপে তিনি কেঁদে উঠতে পারেন। তাই তাঁর করা উচিত।

আমি মনে মনে বললুম, কী দরকার তোমার আমাকে দেখার, তুমি যাও, কোনো নির্জন প্রান্তরে গিয়ে কিছুক্ষণ কেঁদে মন হালকা করে এসো।

এমন সময় পুরুষ প্রৌঢ় ডাক্তারটি হঠাৎ বললেন, রেবা, যদি তোমার শরীর খারাপ লাগে, তা হলে আমিই ব্লাড পেসারটা দেখে নিচ্ছি।

মেয়েটি মুখ না ফিরিয়েই স্পষ্ট গলায় বললেন, না, আমার শরীর খুব ভালো আছে।

ওরা ডাক্তার, ওরা হৃদয়হীন, ওরা শরীর ছাড়া অন্য কথা জানে না। ওরা মন খারাপের কথা জিজ্ঞেস করে না, জানতেও চায় না, ওরা শুধু জানে শরীর ভালো আছে, না খারাপ আছে। শরীর, শরীর, হাসপাতালে শুধু শরীরের গন্ধ।

কোনো ওষুধ না খেয়েই তিন দিন বাদে আমার মাথাধরা সম্পূর্ণ সেরে যায়। কারণ, আমি খবরের কাগজে পড়লুম সেই মেয়ে-ডাক্তারটি আত্মহত্যা করেছে। কারুকে দায়ী করে নি, সে নিজে একা একা চুপ করে মরে গেছে। কিন্তু, তাকে আমি কেন যে দেখেছিলাম! মেয়েটি মরে গেল, কিন্তু তার সেই বিষণ্ণ মুখখানা চিরকালের জন্য ঢুকিয়ে গেল আমার মাথার মধ্যে!

৪৬

*****

এক একটা দিন আসে একেবারে অন্যরকম। সেদিন সমস্ত নিয়মকানুন উল্টে-পাল্টে যায়। সেই সব হঠাৎ-আসা দিনগুলোর জন্যই মানুষের প্রতি বিশ্বাস, আশা, সমবেদনা এইসব ভালো ভালো জিনিসগুলো টিমটিম করে টিঁকে আছে।

দিন চারেকের জন্য একটা মফস্বল শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আজকাল বিশেষ কিছু আশা করি না বলে তেমনভাবে বঞ্চিতও হই না। সুতরাং বেড়াতে গিয়ে যে-টুকু ভালো লাগা উচিত, সেটুকু ঠিকই ছিল।

ফেরার ট্রেন রাত সাড়ে দশটায়, সেটা মিশ্ করলুম, সেই প্রথম দুর্ঘটনা। অথচ পরদিন কলকাতায় ফিরতেই হবে।

পরের ট্রেন ভোর পাঁচটায়, সেটা ধরতেই হবে। অ্যালার্ম ঘড়ি এবং মাত্র একদিনের আলাপ হওয়া ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাহায্যে রাত চারটেয় উঠে আবার স্টেশনে এলুম। এবার আমার দেরি হয়নি, ট্রেনের দেরি হচ্ছে। এই সব ব্যাপারে বেশ রাগ হয়—গত রাত্রে সাড়ে দশটার ট্রেন—আমি মাত্র দেড় মিনিট আসতে দেরি করেছিলুম বলে—আমায় ফেলে রেখে চলে গেল, এমনই তার ব্যস্ততা। অথচ আজ যে ট্রেন নিজেই আসতে দেরি করছে—তবু আমি তাকে ফেলে চলে যেতে পারবো না, আমাকে তার প্রতীক্ষায় বসে থাকতেই হবে!

তার ওপর অসম্ভব শীত, কোট, কম্ফর্টার ভেদ করে ঢুকেছে শীতের ছুঁচ, একটা কথা বলতে গেলেই সোরি মিঞার টপ্পার মতন গলা কাঁপছে।

খুবই ছোট্ট স্টেশন, কোনো আরামপ্রদ ঘেরা বিশ্রাম ঘর নেই, দু-পাশ খোলা একটা জায়গার নাম ওয়েটিং রুম, বারোয়ারি রাস্তার মতন সেখান দিয়ে অবিরাম বাতাসের যাতায়াত চলছে। বিশেষ কোনো লোক নেই, কিছু আদিবাসী ঐ শীতের মধ্যেও মেঝেতে ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। একটা কুকুর একজনের কম্বল ফাঁক করে সেখানে ঢোকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি

ছাড়া আর একমাত্র জাগ্রত ব্যক্তি—কাউন্টারের রেলবাবুটি। যেন সমস্ত দোষটাই তার—এইভাবে তার দিকে রাগের চোখে ঘন ঘন তাকাচ্ছিলুম। গরম ঘরের মধ্যে আরামে বসে লোকটি আমার শীতকাতর অবস্থাটা দেখে মজা পাচ্ছে।

হঠাৎ লোকটি জানলা থেকে সরে গেল. একটু বাদে দেখলুম বাইরে। আমার কাছাকাছি এসে লোকটি বললো, ওরেঃ বাপ, কী ভয়ঙ্কর শীত পড়েছে আজ। যাবার আগে শেষ কামড় দিয়ে যাচ্ছে!

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ট্রেন আর কত লেট করবে?

—কী জানি, বলতে পারছি না। আগের স্টেশনেই তো এখনো রীচ করে নি! লোকটা উদাসীনভাবে হাত-ঘড়ি দেখে আবার বললো, উঃ, কী শীত, কী শীত! এক কাজ করুন, এখানে দাঁড়িয়ে কেন কষ্ট পাবেন? আসুন, অফিস ঘরে এসে বসুন!

এবার আমার অবাক হবার পালা। রেলের যে-সব কর্মচারী রাত্রিবেলা জেগে থেকে কর্মপরায়ণতা দেখায়—তাদের অনেকেই যে আসলে ঘুষখোর হয়—এ সম্পর্কে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। ঐ লোকটিকেও আমি সেই চোখেই দেখছিলুম। কিন্তু হঠাৎ আমাকে ঘরে বসতে বলার নিমন্ত্রণ? তাছাড়া আমার ফার্স্ট ক্লাসের টিকিটও নয়, থার্ড ক্লাস, সুতরাং অতিরিক্ত খাতির দেখাবার কোনোই কারণ নেই। মাটিতে শোওয়া লোকগুলিকে দেখে লোকটি বললো, মাটির মধ্যে কি করে এরা শুয়ে আছে, ভগবানই জানে! এই ঠাণ্ডায় মানুষ বাঁচে? এই জন্যই তো এদের প্রায় সবকটা প্লুরিসিতে ভোগে।

লোকটি নিচু হয়ে হাত দিয়ে কম্বল মোড়া এক একটি মূর্তিকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে জাগাতে বললো, এই, ওঠ্, চল্, অফিস ঘরে চল্!

সবাই মিলে ঘরে বসলুম, দরজা-জানলা বন্ধ করার ফলে বেশ আরাম লাগতে লাগলো। ঘরের মধ্যে চা তৈরি করার বন্দোবস্ত ছিল। লোকটি নিজের হাতে চা তৈরি করে সকলকে খাওয়ালেন, সাঁওতাল কুলিগুলো সমেত। কৃতজ্ঞতায় আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম প্রায়। লোকটির ব্যবহার এমনি যেন এ-সবগুলো খুবই স্বাভাবিক—এর জন্য তার কোনো ধন্যবাদ প্রাপ্য নেই। আমার মনে হচ্ছিল, লোকটি যেন রেল কোম্পানির প্রহ্লাদ। পরে আমার আবার মনে হলো—হয়তো এরকম ভদ্রলোক আরও অনেক আছেন, কিন্তু সময়মতো আমাদের চোখে পড়ে না—শুধু খারাপ, ঘুষখোর লোকগুলির সঙ্গেই আমাদের মুখোমুখি হতে হয়।

দিনটা শুরু হলো এইভাবে। বিস্ময়ের পর বিস্ময় সেদিন আমার জন্য অপেক্ষা করে ছিল। ট্রেন এলো পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেট করে এবং বিষম ভিড়। কিন্তু ওঠা মাত্র জায়গা পেয়ে গেলুম। কারুর সঙ্গে ঝগড়া কিংবা ঠেলাঠেলি করতে হলো না, দু-তিনজন যুবক অপ্রত্যাশিতভাবে জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, নিন, আপনারা বসুন, আমরা সারারাত আরামে বসে এসেছি!

আমিই তখন অপ্রস্তুতভাবে বললুম, না, না, আপনারা জায়গা ছাড়বেন, মানে, দাঁড়িয়ে যাবেন কেন? বসুন না, এরই মধ্যে···

যুবকেরা বললো, না, না, আমরা এমনিই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সূর্য-ওঠা দেখবো।

হঠাৎ কি রাতারাতি সব কিছু বদলে গেল? কোথায় আছি? ভারতবর্ষে না স্বর্গে? বসে বসে এই সব ভাবছিলুম, হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনের স্পীড কমে এলো এবং অবিলম্বে থামলো মাঠের মধ্যে। কোথাও স্টেশনের চিহ্ন নেই, তবু ট্রেন থামলো কেন?

দরজার কাছে যুবকরা চেঁচিয়ে উঠলো, এই বিমল, তুই ঐ গেটে যা, কেউ চেন টানছে, ছাখ, কোন্ কামরা দিয়ে নামে—আজ ধরবো শালাদের—

আমি নিশ্চিন্ত হলুম। এই তো ভারতবর্ষে আছি, স্মাগলাররা ঘন ঘন চেন টেনে গাড়ি থামাবে, তাদের কেউ থামাতে পারবে না—

—ঐ যে একজন নামছে, ঐ যে, ধর শালাকে—

যুবকেরা বাঘের মতন ঝাঁপিয়ে নেমে গেল। আমিও উঁকি মারলুম। একজন খাকি পোশাক-পরা লোক একটা বড় বস্তা ঘাড়ে করে রেল লাইন পার হয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। যুবকেরা গিয়ে তাকে চেপে ধরেছে, চেঁচিয়ে বলছে, গার্ড সাহেবকে ডাক, কোথায় গার্ড সাহেব—আজ এ ব্যাটার পঞ্চাশ টাকা ফাইন করতে হবে।

দেখা গেল পলাতক আসামীটি স্মাগলার মোটেই না, বরং তার উল্টো। রেলওয়ে প্রোটেকশান ফোর্সের লোক, ডিউটির শেষে বাড়ির কাছে নামবার জন্য চেন টেনেছে। ততক্ষণে সেখানে বিরাট ভিড়, বিরক্ত যাত্রীরা মন্তব্য করছে, রেল তোমার বাবার সম্পত্তি? চলো আজ তোমার নামে রিপোর্ট হবে—যেখানে সেখানে চেন টানা? আর পি এফ হয়ে মাথা কিনেছো? গার্ড সাহেব একপাশে দাঁড়িয়ে, তিনিও চান লোকটি ফাইন দিক অথবা পুলিসের হাতে ধরা পড়ুক। লোকটি হাঁউমাঁউ করে কেঁদে দোষ স্বীকার করে বললো, তার কাছে ফাইন দেবার টাকা নেই এবং পুলিসে ধরালে তার চাকরি যাবে।

এরপর যে-ঘটনাটা ঘটালো তাকে সত্যিকারের গণতন্ত্রের একটি সার্থক উদাহরণ বলা যায়। ট্রেনের সমস্ত যাত্রী কামরার দরজার-জানলায় ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, অনেকে নেমে এসেছে নিচে—তাদের সমক্ষে লোকটির বিচার হলো। লোকটি দোষ করেছে ঠিকই—কিন্তু সেই দোষে ওর চাকরি যাক—তা কেউ চায় না। কিন্তু ওকে বেকসুর খালাস দেওয়াও চলে না। সুতরাং ঠিক হলো, লোকটি কান ধরে পঞ্চাশবার ওঠ-বোস করবে সবার সামনে, যাতে আর কখনও যেন বিনা কারণে চেন টানবার সাহস কারুর না হয়। পঞ্চাশ টাকা জরিমানার বদলে পঞ্চাশ বার কান ধরে ওঠ-বোস। হাজার হাজার যাত্রী উল্লাসে সমর্থন জানিয়ে লোকটির প্রতিবারের ওঠা-বসা গুণতে লাগলো, ছয়, সাত···তেইশ, চব্বিশ···

মনটা আমার শান্তিতে ভরে গেল। এইভাবে যদি ভারতবর্ষের সব সমস্যার সমাধান করা যেত! পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই একটা স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়া আছে।

কিন্তু আমার জন্য আরও চমক অপেক্ষা করছিল। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে ট্রেন বদল করার জন্য আমি প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলুম। এই সময় একটা ছোট ভিড় চোখে পড়লো। এগিয়ে গেলুম।

একটি হিন্দুস্থানী যুবতী হাপুস নয়নে কাঁদছে। বছর তিরিশেক বয়েস, লাল ফুল ছাপা শাড়িপরা শক্ত চেহারার নারী, পায়ে রুপোর মল, কিন্তু কাঁদছে একেবারে দীনহীনা অবলার মতন। তাকে ঘিরে কয়েকজন রেলওয়ে পুলিস—দ্বিতীয় দেয়ালটি কৌতূহলী জনতার।

এখানেও আর পি এফ! এরাই যত গণ্ডগোলের মূল দেখছি! ব্যাপারটা জানা গেল, ঐ নারীটি দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে দুর্গাপুরে আসছিল কাজ খুঁজতে, কিন্তু যে পুঁটুলীর মধ্যে তার যথাসর্বস্ব ছিল—সেটা ট্রেন থেকে চুরি হয়ে গেছে। তার যথাসর্বস্ব মানে দুখানা শাড়ি, তেরটা টাকা, একটা কম্বল আর একটি ঘটি। আর পি এফ-এর লোকরা চোরাই চাল খুঁজতে ওকে ধরতেই এই ফ্যাসাদে পড়েছে। মেয়েটির কান্না কিছুতেই থামে না।

রেলের একজন টিকিট চেকারও ভিড়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি বললেন, ও কি আর পাওয়া যাবে? যত চোরের রাজত্ব এ লাইনে। এই, এই নে—আজকের দিনটা চালা—! চেকারবাবু নিজের পকেট থেকে একটা টাকা বের করে মেয়েটির দিকে ছুঁড়ে দিলেন। আর পি এফ-দেরও একজন পকেটে যা খুচরো পয়সা ছিল দিয়ে দিল মেয়েটিকে। দেখাদেখি আরেকজন। আমি স্তম্ভিত। হঠাৎ কি

কাল শেষ রাত্রে কলিযুগ শেষ হয়ে সত্যযুগ শুরু হলো? টিকিট চেকাররা চিরকাল হাত বাড়িয়ে ঘুষের টাকা নিতেই অভ্যস্ত। তারাও যে কখনো নিজের পকেট থেকে টাকা বার করে বিনা কারণে অন্যকে দেয়—এ রকম কখনো দেখিনি, শুনিও নি! আমারও কিছু একটা করা উচিত বলে আমি পকেটে হাত দিলুম।

জনতার অনেকেই মেয়েটিকে চাঁদা দিতে লাগলো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। মেয়েটা নাচ দেখাচ্ছে না, ভেলকি দেখাচ্ছে না, শুধু কাঁদছে—তার জন্যই সাহায্য!

এই সময় আর একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার প্রৌঢ়া মহিলা—দুর্গা প্রতিমার মতন আয়ত প্রশান্ত তাঁর মুখ—তিনি এসে বললেন, আহা, মেয়েটি কাঁদছে কেন? সব চুরি হয়ে গেছে?—দুর্গাপুরে এসেছে কেন?—কাজ খুঁজতে?—ঠিক আছে, এই তুই চল্ আমার বাড়িতে থাকবি। খাবি, কাজ করবি। যদি পছন্দ না হয় অন্য জায়গায় পরে কাজ খুঁজে নিস—যে কদিন না পাস্ আমার বাড়িতে······আয়, কাঁদিস না, আয়—

একটু আগে আমি একটা খবরের কাগজ কিনেছিলাম। সেটা না পড়েই ট্রেন লাইনে ফেলে দিলাম। আজ সকালে এ পর্যন্ত কোথাও কোনো অশান্তি নেই, অবিচার নেই, মানুষে মানুষে হিংসা নেই—বড় প্রীতিময় আজকের এই সকালবেলা। একমাত্র খবরের কাগজেই দেখতে পাবো যুদ্ধ বিগ্রহ, ঈর্ষা, কোন্দল লোভ আর জোচ্চুরির কাহিনী। যাক আজ আর কাগজ পড়বো না—মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস ফিরে আসুক!

একটা বিখ্যাত কবিতার কয়েক লাইন বার বার মনে পড়তে লাগলো: পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো/ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু/দেখেছি আমারই হাতে হয়তো নিহত/ভাই বোন বন্ধু, পরিজন পড়ে আছে/পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

৪৭

*****

আমাদের বাড়ির সামনে খানিকটা গাছপালায় ভরা জমি পড়ে আছে। জমিই বললুম, গাছপালা সত্ত্বেও তাকে বাগান বলা যায় না। কয়েকটি এলোমেলো বড় বড় রকমারি গাছ, বাকি জায়গাটা জুড়ে কচু-ঘেঁচু-এরণ্ডর আগাছা।

ফ্ল্যাট বাড়ি তো, তাই কেউই আগাছা পরিষ্কার করে বাগান করে নি। চার-পাশের দেয়াল ভাঙা বলে কিচেন গার্ডেনিং করার চেষ্টাও হয় নি।

জানলা দিয়ে তাকালে এখন চোখে পড়ে, আগাছাগুলো ক্রমশ শুকিয়ে দড়ির মতন হয়ে আসছে। অন্যান্য আসল গাছের চেয়েও আগাছার রং বেশী গাঢ় দগদগে সবুজ থাকে, এখন সেগুলো বিবর্ণ চকলেট রঙের, কিছুদিনের মধ্যেই সেগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বেশীদিন বৃষ্টি না পড়লেই ওরা মরে যায়। বুঝতে পারলুম, শীত আসার দেরি নেই।

আঃ, শীত আসছে, ভাবলেই এত ভালো লাগে। এই কলকাতা শহরে শীত-কালই তো একমাত্র সুখের সময়। শীতকালে ট্রাফিক জাম হয় না, শীতকালে আন্দোলনও খুব কম হয়। শীতকালে লোকে বিকেলে বেড়াতে বেরোয়, শীত-কালে ঠোঁট ফাটা সত্ত্বেও মানুষ হাসে, শীতকালে রাগ কম হয়, অনেক বিচ্ছিন্ন প্রেমের পুনর্মিলন হয়ে যায়।

আঃ, শীতকাল আসছে ভাবলেই এত ভালো! শীতকাল হচ্ছে ফুলকপির সময়, টাটকা মাছের সময়, ছেলেবেলায় খেজুর রস খাবার স্মৃতি অনুভবের সময়, (বড় বয়সে খেজুর রস খেয়ে দেখেছি, যাচ্ছেতাই লাগে। কিন্তু ছেলেবেলায় খেজুর রস খেয়ে যে কি খুশী হতুম সেই কথা মনে পড়লে মনটা খুশী হয়ে ওঠে) শীতকালে কোথাও পচা বা নোংরা জিনিস থাকে না, ধুলো থাকে না, শীতকালে শুধু আগাছা মরে যায়—আর সব কিছু সজীব হয়ে ওঠে।

সত্যি, আমাদের বাড়ির মাঠে যে-কটা বড়বড় গাছ সেগুলো সবই চিরহরিৎ,

পাতা খসে না। আম-পাম জাম, বেল-নারকোল-কুল-নিম, এদের কারুর পাতা ঝরে না। শুধু আগাছাগুলো মরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, ভালোই।

শীতকাল কে বলেছে বিবর্ণ? শীতকালই তো রঙের সময়! আমরা বাঙালীরা পোশাকে সাধারণত বেশী রং পছন্দ করি না, তাই সারা বছর সাদা বা সাদার কাছাকাছি হাল্কা রং। কিন্তু শীতকালের গরম জামায় রঙের খেলা, শীতকালে লাল সোয়েটার, কালো শার্ট বা নীল আলোয়ানকে কেউ বলবে না ক্যাঁটকেঁটে! গরম জামা-কাপড়গুলো এবার আস্তে আস্তে নামাতে হবে। কোটটা কাচানো আছে তো? লণ্ড্রি থেকে—গতবছর কাচাতে দেওয়া শালটা আনা হয়েছে কি?

দুপুরের দিকে এক একদিন লোভী ইচ্ছে হয়, আজ স্নান না করলে হয় না? বুঝতে পারি, শীত এসে গেল। নাঃ, এর মধ্যেই স্নান বাদ দিলে লোকে যা-তা কুঁড়ে বলবে, আর কয়েক সপ্তাহ যাক্, তারপরেই মাঝে মাঝে স্নান বাদ দিয়ে মৌজ করতে হবে। ছেলেবেলায় পুকুর পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতুম, কিছুতেই স্নান করতে ইচ্ছে করতো না, তখন জলের মধ্যে গামছাটা ছুঁড়ে দিতুম, আস্তে আস্তে ডুবতো, যখন দেখতুম আর উপায় নাই, তখন ঝাঁপিয়ে পড়তেই হতো। এখন সে-সব ঝঞ্ঝাট নেই, বাথরুমে ঢুকে ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছে এলেই হলো।

আসন্ন শীতের আমেজটা ক'দিন ধরেই উপভোগ করছিলুম। শীত আসছে, শুধু এই জেনেই মনটা খুশী খুশী হয়ে উঠছে। শীত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কি কি গান আছে মনে করার চেষ্টা করে গুনগুন করে সুর ভাঁজছি। 'শীতের বনে কোন্ সে কঠিন আসবে বলে···শিউলি ফোটা আ, আ, ফুরোলো রে ফুরোলো'···রবীন্দ্রনাথের শীতকালের গানগুলোয় যেন একটু দুঃখ-দুঃখ। খালি বসন্তের জয়! কিন্তু শীতকালে দুঃখের কি আছে? শীতকালই তো আনন্দের সময়, ভালো খাওয়া, ভালো ঘুম, ভালো পোশাক, ভালো প্রেম! বসন্তে কি আছে কলকাতায়? কিচ্ছু নেই, শুধু চিড়বিড়ে রোদ্দুর।

একটু বেশী রাত্রের বাসে আসতে আসতে ঠাণ্ডা হাওয়া ভোগ করছিলুম। একে তো বসার জায়গা পেয়েছি, তা ছাড়া ঠাণ্ডা হাওয়া—এমন সৌভাগ্য একবছর হয় নি। পাশে বন্ধু ছিল, সে হঠাৎ বাইরে তাকিয়ে বলে উঠলো, আচ্ছা, ওরা শীতকালে কোথায় যায় বলতো?

আমি অন্যমনস্কভাবে বললুম, কারা?

—ঐ যে ত্যাখ না, ঐ যারা শুয়ে আছে?

আমি জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিলুম। রাস্তার ওপর যে-কটা বাড়ির গাড়ি বারান্দা আছে (গাড়ি বারান্দা বলে কেন? ফুটপাথের ওপর বারান্দা, তার

তলায় কি গাড়ি থাকে ?) সবগুলো বারান্দার নিচে মানুষ শুয়ে আছে। যেন কখনো দেখিনি, এই ভঙ্গিতে আমি উদ্‌গ্রীব ভাবে লক্ষ্য করে দেখে বললুম, কোথায় আর যাবে ? কাছেই থাকবে !

বন্ধু বললো, ভ্যাট্ ! শীতকালে কাউকে রাস্তায় শুতে দেখেছিস্ ?

—রাস্তায় শোবে না তো যাবে কোথায় ?

—যা যাঃ ! আমরা ঘরের একটা জানলা খুলে পর্যন্ত শুতে পারি না শীতকালে, আর ওরা রাস্তায় শোবে, চালাকি পেয়েছিস ?

—ঘরের মধ্যে বেশী শীত, রাস্তায় অতটা শীত করে না, সারাদিন রোদ্দুরে তেতে থাকে তো !

বন্ধু বেশ রেগে উঠে বললো, বাজে বক্‌বক্ করিস্ নি ! এমনভাবে বলছিস্, যেন তুই নিজে কতো রাস্তায় শুয়েছিস ! রাস্তাটা না হয় তেতে থাকে, আর যে কনকনে উত্তুরে হাওয়া দেয়—

—কে জানে, তখন ওরা কোথায় থাকে !

—তুই মনে করে ছাখ্, গত শীতকালে কাউকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে দেখেছিস ?

আমি মনে করার চেষ্টা করলুম। ঠিক মনে পড়লো না। তবে মনে হচ্ছে যেন শীতকালের রাত্রে ফাঁকাই থাকে, ফুটপাথে কোনো বাধা থাকে না। যাক্ ওকথা ভাবতে ভালো লাগছে না এখন।

বন্ধুটি তবু চিড়বিড় করতে লাগলো, এ তো বেশ একটা ধাঁধা দেখছি ! শুনেছি, কলকাতা শহরে অন্তত পঞ্চাশ হাজার লোকের কোনো ঘর-বাড়ি নেই, তারা স্রেফ রাস্তায় শোয়। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে শীতকালে কোথায় ঘর-বাড়ি পায় ! শীতকালে কোথায় উপে যায় ? এ তো একটা বিরাট ধাঁধা দেখছি।

আমি হাসতে হাসতে বললুম, এর মধ্যে ধাঁধার কি আছে ? এরা গরমকালে রাস্তায় শোয়, আবার পরের গরমে রাস্তায় শোবে, মাঝখানের শীতকালটা শুধু অদৃশ্য হয়ে থাকে ! আমাদের বাড়ির মাঠের আগাছাগুলো শীতকালে সব মরে যায়, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আবার পরের বর্ষায় দেখি মাঠভর্তি আগাছা ! আগাছার তো আর কেউ চাষ করে না ! আসলে আগের বছরের আগাছাগুলোই পরের বছর আবার ফিরে আসে। মাঝখানের সময়টা অদৃশ্য হয়ে থাকে !

বন্ধুটি একটু গোঁড়া ধরনের, হাসি-ঠাট্টা বিশেষ পছন্দ করে না, সে বললো, গাছগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় না, ওদের বীজ লুকোনো থাকে মাটিতে, পরের বছর আবার তাই থেকে গাছ হয়।

আমি তখনও হাসি বজায় রেখে বললুম, তা হলে এ লোকগুলোও রাস্তায় বীজ রেখে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার ফিরে আসে।

—তুই যে কতদূর নির্বোধ, তুই যখন বেশী কথা বলিস্ তখনই বেশী করে বোঝা যায়।

—এ কথাটা তোর পছন্দ হলো না? আচ্ছা, তা হলে যাযাবর পাখির মতন ওরা কোনো গরম গনগনে দেশে চলে যায়, এই সময়।

—কোথায়?

—আমি কি জানি! তাহলে তুই-ই বল্, ওরা কোথায় যায়?

—আমি জানি না বলেই তোকে জিজ্ঞেস করছিলুম!

—তাহলে যে-জিনিসটা আমিও জানি না, তুইও জানিস না, তা নিয়ে আলোচনা করার দরকার কি? একেই বলে কাকদন্ত গবেষণা! কে-কোথায় শোয় তা নিয়ে ভেবে আমাদের সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

শীতকাল হচ্ছে আনন্দের সময়, এই শীতে আমরা আনন্দ করবো। চল্, এই শীতে পুরী বেড়াতে যাবি?

৪৮

*****

বেচু রক্ষিত নামে একজন লোক কেষ্টনগর থেকে কলকাতায় আসছিলেন তাঁর ভগ্নিপতির বাড়িতে। ট্রেনে ওঠবার আগে চার টাকার সরপুরিয়া-সরভাজা কিনে নিয়েছেন দিদি জামাইবাবুর জন্য। কলকাতায় তখন দুধ-ক্ষীরের জিনিসপত্র পাওয়া যায় না, তাই কেষ্টনগরের নামকরা মিষ্টি নিয়ে চলেছেন ওদের খুশী করতে।

ব্যাপারটার শুরু এইখান থেকে। বেচু রক্ষিত মিষ্টির হাঁড়িটা বাঙ্কের ওপর সুটকেশ-বিছানার পাশে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়েছেন। এক ঘুমে কলকাতা। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেই ধড়মড় করে উঠে প্রথমেই তিনি খোঁজ নিয়েছেন মিষ্টির হাঁড়ির। না, কেউ চুরি করে নি, কেউ খোলেও নি। কিন্তু হাঁড়িটার ওপর দুটো নীল রঙের ডুমো-ডুমো মাছি বসে আছে। ওরা সেই কেষ্ট-নগর থেকেই হাঁড়ির মধ্যে রসের খোঁজ পেয়ে হাঁড়ির গায়ে লেগে আছে। বিরক্ত হয়ে বেচু রক্ষিত হাতের ঝাপটায় মাছি দুটোকে তাড়িয়ে বললেন, যাঃ যাঃ! মাছি দুটো একটু ভন্‌ভন্ করে উড়লো আশপাশে, তার পর হাতের ঝাপটার ভয়ে দূরে দূরে রইলো!

গাড়ি থেকে নেমে, কাঁখালে সতরঞ্চি মোড়া বেডিং, বাঁ-হাতে টিনের সুটকেশ ও ডানহাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে বেচু রক্ষিত শেয়ালদা স্টেশন থেকে এবং আমাদের এই কাহিনী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কেষ্টনগরে সেই নীল ডুমো মাছি দুটো ভন্‌ভন্ করে ওড়াউড়ি শুরু করে পরস্পরকে বললো, এ আবার কোথায় এলুম রে? চল্, ভালো করে আগে জায়গাটা দেখে নেওয়া যাক! এই বলে, হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে তারা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে গেল। মাছি দুটি যুবক যুবতী। যুবক মাছিটি একটু চালিয়াৎ গোছের, সে বললো, বুঝেছি, এ জায়গাটার নাম নবদ্বীপ। যুবতী মাছিনী বললো, কি করে বুঝলে?

—একবার নবদ্বীপের এক মাছিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল, ওঃ, নবদ্বীপে একেবারে···

—বুঝেছি. সেই যে মাছিনীটাকে পেয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে কয়েকদিন···

—আর তুমি বুঝি তখন···

—থাক, আর ভ্যানভ্যান করতে হবে না।

যাই হোক, ওরা দুজনে উঁচু থেকে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই বুঝে ফেললো, ওরা কলকাতা শহরে এসেছে। কেষ্টনগরের আসল দুধ-ক্ষীর খাওয়া মাছি তো, বুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। কলকাতা শহরকে চিনতে পেরে ওরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। মাছি মাছিনীকে বললো, আর ঝগড়া করিসনি। আজ জীবনটা সার্থক হলো। কলকাতা শহরের কত নাম শুনেছি, কোনদিন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলুম এখানে আসতে পারবো? কেষ্টনগরের মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে. এখানে ওসব মিষ্টি-ফিষ্টির পাট নেই, এখানে খুব ভালো ভালো নোংরা, আস্তাকুঁড় আর জঞ্জাল আছে।

মাছিনী বললো, ছাখো না নিচে, কত মাছি গিস্‌গিস্ করছে। কত দেশ থেকে মাছি আসে এখানে—ছাখো, রাস্তা-ঘাট একেবারে ভরা!

কিন্তু নিচে নেমে এসে দেখলো, একটাও মাছি নেই. সব মানুষ। মাছি দুটো খুব মুশকিলে পড়লো, সারা শহরে আর একটাও মাছি নেই, এমন কি মশা কিংবা পিঁপড়ে—এই সব ছোট জাতের প্রাণীও নেই। সব মানুষ। কলকাতার আকাশে মাত্র এই দুটো মাছি, অনেক লোক ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। একটা বাচ্চা ছেলে বললো, বাবা ও দুটো কি, চড়ুই পাখির বাচ্চা? বাবা গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, না, ওদের বলে মাছি। মফস্বল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে বোধ হয়। এই নিয়ে কাগজে একটা চিঠি লিখতে হবে তো!

সব কটা রাস্তা ধপ্‌ধপে ঝকঝকে, কোথাও এক ছিটে ময়লা নেই, কোথাও জঞ্জাল জমে নেই, মাছি দুটো পড়লো মহা মুশকিলে। ঝাড়ুদারেরা অনবরত রাস্তা সাফ করছে, ধুয়ে দিচ্ছে, নোংরা জমাবার কোনো সুযোগই নেই। এ কি আর কেষ্টনগর, ময়রার দোকানের ভাঙা ভাঁড়গুলোতে যা রস জমে থাকে তাতেই কত মাছির সংসার চলে যায়। ঝাড়ুদাররা দিনে মাত্র দুবার ঝাঁট দেয় কি না দেয়। আর এ কলকাতা শহর, এখানে প্রত্যেক দোকানে কাচের বাক্স দিয়ে জিনিসপত্র ঢাকা, প্রত্যেক বাড়ির লোকেরা মুখ বন্ধ টিনের বাক্সের মধ্যে ময়লা জমা রাখে, মেথররা অনবরত এসে সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছে।

মাছি মাছিনীকে বললো, শেষকালে কি এখানে এসে না খেয়ে মরবো নাকি?

মাছিনী বললো, চলো না, মাছের বাজারে যাই, সেখানে তো মাছের কানকো নাড়িভুঁড়ি ফেলবেই ?

ঘুরতে ঘুরতে এলো মাছের বাজারে। মাছের বাজার ধোয়াসাফ, কিছু নেই, খুব সকালবেলা দু'চার রকম মাছ নাকি ওঠে দেখতে দেখতে সেগুলো সাফ হয়ে যায়, অনেক লোক মাছের চুবড়ি ধোওয়া জলও কেনে পয়সা দিয়ে—সুতরাং একটু বেলা হলে মাছের বাজারে আঁষটে গন্ধটুকুও থাকে না। এখন মাছওলা আর মেছুনী বসে বসে কীর্তন গাইছে খোল করতাল বাজিয়ে। নিরাশ মাছিনী সঙ্গী মাছিকে বললো, এ কোথায় এলুম গো! এ কি শহরের ছিরি? একটুও নোংরা নেই—একে শহর না বলে তো মরুভূমি বললেই হয়! আম জামের সময় হলে রাস্তায় অন্তত দু'একটা আমের খোসা ঠিকই পড়ে থাকতো।

খিদে পেয়ে মাছির শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, তার গলার আওয়াজ ভন্‌ভনের বদলে পিনপিন, সে বললো, এ শহরকে কিছু বিশ্বাস নেই! তাও হয়তো সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে ফেলে। আমের সময় না হোক, কলার তো সময়! রাস্তায় একটাও কলার খোসা দেখলি ?

—সত্যিই! এ শহরের লোকেরা কলা খায় না নাকি ?

—খাবে না কেন ? বোধ হয় হয় খোসাশুদ্ধু খায়!

—মাছিদের জন্য একটু দয়ামায়াও নেই ?

ঘুরতে ঘুরতে এলো একটা বিরাট বাড়ির সামনে, যাকে বলে রাইটার্স বিল্ডিং! মাছি মাছিনী একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে, ভালো ভালো ময়লার বদলে ওরা এখন থুতু-কফ খেতেও রাজী। সেখানে গিয়েও ওরা অবাক।

মাছি মাছিনীকে বললো, হ্যাঁরে, কলকাতার বদলে কি আমরা ভুল করে বিলেতে চলে এলুম ? মাছিনী বললো, সত্যি, মানুষগুলো এমন নিষ্ঠুরও হয়।

রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কোথাও একছিটে ময়লা নেই, দেয়ালে পানের পিক নেই, সিঁড়ির পাশে সিক্নি নেই, আলুর দমের ঝোল মাখানো একটি শাল পাতাও নেই পর্যন্ত। ঝকঝকে তকতকে সব কিছু, লোকগুলো নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্ছে. মাঝে মাঝে উঠে থুতুটুকু ফেলার জন্য বারান্দায় গিয়ে থুক না করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে এসে সযত্নে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এরা কি মানুষ ? মানুষ এমন হৃদয়হীন হয় ?

মাছি বললো, চল, এখানকার মানুষেরা কিছুতেই ময়লা থাকতে দেবে না, বুঝেছি। দেখি কোথায় এমন জায়গা আছে কি না—যেখানে মানুষ নেই, সেখানে যদি আপনি আপনি ময়লা-টয়লা কিছু থাকে।

কিন্তু কলকাতার লোক এমন বোকা নয় যে, ফাঁকা জায়গা রাখতে দেবে। কোথায় মানুষ নেই? মাঝে মাঝে পার্ক ময়দান—তাও মানুষ দখল করে রেখেছে, সব জায়গা মানুষ বসে বসে পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ কিছু নোংরা না করে ফেলে।

নাঃ, মাছি দুটো ভাবলো, মানুষকে আর বিশ্বাস নেই। এবার জন্তু-জানোয়ারের খোঁজ করা যাক্। হ্যাঁরে, এ শহরে কি বেড়াল ছানা মরে না? কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে না? তাদের মরা দেহগুলো কোথায় যায়? রাস্তায় একটাও তো নেই! মোষের গাড়ির মোষের কাঁধে ঘা পর্যন্ত নেই, ব্যাপার কি? মাছি মাছিনীকে বললে, বুঝলি, এ সবই আমাদের না খাইয়ে মারার ষড়যন্ত্র।

মাছিনী বললো, চল্, প্রাণ থাকতে এ শহর থেকে পালাই! আমাদের কেষ্টনগর এর থেকে ঢের ভালো ছিল।

—এই জন্যই এ শহরে মিষ্টি বন্ধ করেছে, বুঝলি? যাতে আর কোনো জায়গা থেকে মাছি না আসে! মিষ্টির গন্ধ পেলে দেশ-বিদেশ থেকে মাছি তো আসতোই!

—মিষ্টি কে চাইছে? একটু পচা জঞ্জালও রাখতে নেই আমাদের জন্য?

চারপাশের এত বড় বড় বাড়ি, মাঝখানে একটু ফাঁকা মতন জায়গা। ভালো করে ওরা লক্ষ্য করে দেখলো, ঠিক ফাঁকা নয়, ছোট ছোট ঘরের মতন। মাছিনী আহ্লাদে বললো, চল্ ঐখানে যাই, ঐ ছোট ছোট ঘরগুলি নিশ্চয়ই মানুষের নয়, ওখানে জন্তুরা থাকে। জন্তুরা তো নিজেদের ময়লা লুকোতে পারবে না।

ওপর থেকে ওরা নিচে নেমে এলো আবার। কোথায় জন্তু জানোয়ার? একটা বস্তি—এখানেও মানুষ। আর কি আদর্শ বস্তির আদর্শ মানুষ। পরিষ্কার নিকোনো ঘরগুলো, অনেক ঘরের সামনে আবার আলপনা দেওয়া, পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, নর্দমা দিয়ে যে জল বইছে, তা পর্যন্ত পরিষ্কার। ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত নাকের সিকি ফেলে রাস্তা নোংরা করার বদলে নিজের সিকি নিজেই খেয়ে ফেলছে!

—মাছিনী, আজ আর বাঁচার আশা নেই!

—এই নাকি কলকাতা। এ শহরের এত নাম-ডাক? দূর দূর।

—গুজব! মাছি সমাজে যে বলে কলকাতা একেবারে স্বর্গের মতন, যেখানে সেখানে ময়লা-নোংরা ছড়ানো—এবার বুঝলি তো, সব গুজব। কলকাতা না দেখেই কলকাতা সম্বন্ধে যত গল্প! বিলেত না গিয়েই বিলেত ফেরৎ।

বিকেলের দিকে মাছি ত্নটো একেবারে করপোরেশনের অফিসে গিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং নগরপালের ঘরে গিয়ে তাঁর নাকের সামনে ভন্ ভন্ করতে লাগলো। নগরপাল আঁৎকে উঠে বললেন, কি? আমার শহরে মাছি? তাজ্জব কাণ্ড। কে কোথায় আছিস্?

একদল লোক ছুটে এলো, সবাই মিলে তাড়া করতে লাগলো, মাছি তুটোকে। কোথা থেকে তুটো উটকো মাছি শহরে ঢুকে পড়েছে, এই নিয়ে কলকাতার নামে কলঙ্ক রটে যাবে। কাল না এ খবর আবার কাগজে বেরিয়ে যায়। মারো, মারো!

মাছি তুটো কিন্তু ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেল না। নগরপালের কাছাকাছি উড়তে লাগলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ওরা একেবারে মুমূর্ষু, সারাদিন কোথাও একটু বসারও জায়গা পায় নি, গায়ের সেই চিক্কণ নীল রং মলিন হয়ে গেছে, গলার আওয়াজ প্রায় শোনাই যায় না. ওরা মরিয়া হয়ে নগরপালের মুখের সামনে ঘুরে ঘুরে কাতরভাবে অভিযোগ জানাতে লাগলো, অন্যায়! এ আপনার অন্যায়, বিদেশ-বিভুঁই থেকে তু-একটা পোকা-মাছি এখানে বেড়াতে এলে—তাদের জন্য আপনি কোনো ব্যবস্থাই রাখেন নি? শহরের কোনো একটা জায়গায় অন্তত একটুখানি ময়লা তাদের জন্য রাখা উচিত ছিল! সারা শহর ঘুরে দেখলুম, কোথাও এক ছিটেও ময়লা নেই। এ আপনার অন্যায় নয়? আমাদের মেরে ফেলতে চান? এ রকম করলে কলকাতায় বেড়াতে আসবো কি করে অ্যাঁ? আমরা আর কতখানি খাবো, অন্তত এক রত্তি ময়লাও যদি রাখতেন—

৪৯

*****

মাঝে মাঝে মনে হয় না, কেউ বুঝি নাম ধরে ডেকে উঠলো? খুব ভিড়ের রাস্তা, ট্রাম-বাস-রিকশা-লোকজন, এই সব মিলিয়ে একটা শব্দ, এবং এই শব্দকে ছাড়িয়েও আর একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ডেকে ওঠে আপনার নাম, আপনার নাম যাই হোক না, শ্যামল বা শ্যামলী, অরুণ বা অরুণা, মাধব বা মাধবী, চিন্ময় বা চিন্ময়ী। কখনো এমন শোনেন নি, খুব হনহন করে হেঁটে যাবার সময়, অন্যমনস্ক, এমন সময় আপনার নাম ধরে সেই তীক্ষ্ণ ডাক? আমি শুনেছি অনেকবার, থমকে দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত মুখে তাকিয়ে এধার-ওধার দেখেছি, কেউ না, কেউ আমায় ডাকে নি, সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত।

কখনো কখনো দেখেছি, সত্যিই কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। কাছেই একজন মানুষ ব্যাকুলভাবে ডাকছে, নীলু! নীলু! লোকটি অচেনা, কিন্তু আমার আমেদাবাদের কাকা, ছেলেবেলার জ্যেঠামশাই, বিলেত ফেরৎ মামা, কারখানার মজুর পিসতুতো ভাইরাও তো আমার অচেনা, সুতরাং আমি হতচকিতভাবে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, কী? আমায় খুঁজছেন? লোকটি ভ্রূক্ষেপও করে না, তাকায় না পর্যন্ত আমার দিকে, তবু ডাকতে থাকে, নীলু! নীলু! তখন দেখতে পাই, দূর থেকে আমার সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারার একটি লোক—নীলু নাম যাকে একেবারেই মানায় না—হাসতে হাসতে আসছে। তারপর ওরা আমাকে অগ্রাহ্য করে, কাঁধ ধরাধরি করে চলে যায়। কারণ বুঝতে পারি না, তবু বিষম অপমানিত লাগে সেই সময়। মুখখানা তেতো হয়ে যায়। আমার কী দোষ?

বাস ধরার জন্য ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত ও বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন একজন প্রৌঢ়। কোনো কথা না বলে অতিশয় পরিচিত ভঙ্গিতে দু-হাত তুলে নমস্কার

করলেন। লোকটিকে বিন্দুমাত্র চিনি না, আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেও তৎক্ষণাৎ দুহাত তুলে ওঁকেও প্রতি-নমস্কার করলুম। লোকটি নমস্কার শেষ করে তখন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছেন। আপাদমস্তক আমাকে নিরীক্ষণ করে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর চলে যেতে যেতে বললেন, অসভ্য! ধর্মশিষ্টাচার একেবারে দেশ থেকে লোপ পেতে বসেছে!

লোকটি কি পাগল? কি দোষ করলুম আমি?

ঘাড় ঘুরিয়ে কারণটা বুঝতে পারলুম। আমার পিছনেই একটা ছোট কালীমন্দির। লোকটি আমায় নমস্কার করে নি, মূর্তিকে প্রণাম করেছেন। মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। আমি লোকটিকে না হয় না জেনেই, প্রতি-নমস্কার করলুম, সেটা হয়ে গেল অশিষ্টাচার? ঐ পাথরের মূর্তি কোনোদিন ওকে প্রতি-নমস্কার করবে?

এই রকম অনবরতই ভুল ডাক আর ভুল মানুষের সঙ্গে দেখা হয়।

সন্ধের শো-তে সিনেমা দেখবো, বন্ধুর জন্য দাঁড়িয়েছিলাম একটা বিদেশী ছবির হলের সামনে। টিকিট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ, বন্ধুর দেখা নেই, শেষ ঘণ্টা পড়ে গেল, সামনেটা ফাঁকা হয়ে গেল, শুধু আমি আর ওপাশে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির মুখ চোখে অস্থিরতা, ওরও বন্ধু আসে নি? আমার বন্ধুও আসে নি। ওর বন্ধুও আসে নি।

সন্ধে গাঢ় হয়ে নামবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি যেন ক্রমশ করুণ হয়ে আসতে লাগলো। আমার কাছে তো দুটো টিকিট, এমনকি হয় না, আমরা দুজনেই একসঙ্গে সন্ধেটা কাটালুম সিনেমা দেখে? দুজনের সাময়িক শূন্যতা যদি সাময়িক-ভাবে ভরানো যায়? এই রকম বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটা বিখ্যাত গল্প আছে। আমি মনকে বললুম, সাবধান! গল্প কখনো অনুসরণ করতে গেলে মেলে না। জীবন অনুযায়ী গল্প হয়, কিন্তু গল্প অনুযায়ী জীবন হয় না আর।

তবু একটা কৌতূহল ছুঁক ছুঁক করছিল। দেখাই যাক না, হয়তো অন্যরকম একটা গল্পও হয়ে যেতে পারে। আমি মেয়েটির দিকে তাকালুম, রাস্তার ধারের দিকে অল্প ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে, চোখ দুটি যেন ব্যাকুল হয়ে ঘুরছে চারদিকে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, গল্পের নায়কদের মতন আমি অমন সহজে অচেনা মেয়ের সঙ্গে যে কথাই বলতে পারি না।

এখনো সময় আছে, এখনো ইচ্ছে করলে ইণ্টারভেলের আগে ঢুকে পড়ে ফিল্মটা দেখা যায়। আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠে, মেয়েটির দিকে তাকিয়ে আলতোভাবে হাসলুম। হাসিটা অনেকটা সেই কালীমূর্তিকে নমস্কার করার মতন। মেয়েটির

দিকে চেয়ে হেসেছি বলা যায়, অথবা মেয়েটিকে ছাড়িয়ে পিছনের রাস্তায় এই মাত্র যে-লোকটি পা পিছলে পড়ে গেল, তাকে দেখেও হেসে থাকতে পারি। উত্তরে, আমার হাসির চেয়েও একটু বড়ো আকারের হাসি হাসলো মেয়েটি। আমি আগেই দেখে নিয়েছি, আমার পিছনে দেয়াল ছাড়া কিছু নেই। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সন্ধেবেলায় একা মেয়ে হাসবে কেন ?

তবু আমি কথা বলার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। একটু দাঁড়িয়ে রইলুম। একবার মনে হলো, মেয়েটির হাসিটা কি বিদ্রূপের ? মেয়েটি আবার অল্প হাসির আভাস দিল, এ হাসি যেন দুঃখের! তখনই আমার মনে হলো, টিকিট বিক্রী করা কিংবা একা সিনেমা দেখা বা রাগ করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার চেয়ে, এই দুজনে একসঙ্গে সিনেমা দেখাই তো সবচেয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক। আমি মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেলাম এবং নির্ভীক ও জড়তাবিহীন স্বরে বললুম, আপনারও···আসেনি বুঝি ?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে আবার হাসলো। এবার হাসিতে দুঃখ নেই। আমি বললুম, দেখুন, আমার কাছে দুটো টিকিট আছে, আপনি দেখবেন ? মেয়েটি এবার ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কত দেবেন ?

আমি প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। শুনেছিলাম যেন, ও বললো, কত নেবেন ? ভেবেছিলাম, আরেঃ! ওকি ভাবছে, আমি টিকিট নিয়ে ব্ল্যাক মার্কেট করছি ? সুতরাং ব্যস্ত হয়ে বললুম, না, না, আপনাকে দাম দিতে হবে না। এমনিই আমার সঙ্গে যদি আপনার সিনেমা দেখতে আপত্তি না থাকে— তবে, এক সঙ্গে—

—কত দেবেন ? আগে থেকে কথা হয়ে যাক্!

আমি এবারেও বুঝতে পারিনি। অবাক হয়ে বললাম, কতোর দেবো ? না. না, আপনাকে দাম দিতে হবে না।

মেয়েটির গলা এবার চাপা ও কর্কশ। তীব্র ভাবে বললো, ন্যাকা নাকি ? বিনে পয়সায় পিরীত ? শুধু বায়স্কোপ দেখিয়েই···আমি, সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরে বিস্বাদ মুখে চকিতে দূরে সরে গেলাম। ভয়ে ফিরে তাকাইনি। হলো না, একটা গল্প পর্যন্ত হলো না! এতো সাধারণ ঘটনা। ভুল দুজনের দেখা হয়ে গেল আবার।

এই রকম ভুল দেখা যে কতবার অসংখ্যবার হয় আমার। শুধু আমিই ভুল করি না, অন্যরাও ভুল করে। রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি, পিছন থেকে আচমকা কাঁধের ওপর বিরাট চাপড় দিয়ে একজন বললো, কী রে হরিপদ! আমি মুখ

ফেরাতেই লোকটা দায়সারা গোছের ভাব করে বললো, ও, বুঝতে পারিনি মাপ করবেন! আমি অত্যন্ত চটে গিয়ে বললুম, আপনার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই! ঐ রকম বিচ্ছিরি নাম আমার হতে পারে? লোকটি লজ্জিত না হয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললো, হরিপদকে দেখতে আপনার চেয়ে অনেক অনেক সুন্দর।

আমি বললুম, চুলোয় যাক্। সুন্দর হোক বা কুচ্ছিৎ হোক, আমি হরিপদ নই, হরিপদ হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, আপনি না দেখে শুনে আমাকে অত জোরে মারলেন কেন? লোকটি আমার মুখোমুখি রুখে দাঁড়িয়ে বললো, অত তেজ দেখাচ্ছেন কি? ভদ্রতা জানেন না—

যেন হরিপদ না হওয়াটা আমারই দোষ! হরিপদ না হবার জন্য আমাকে এবার মার খেতে হবে। ওঃ!

রাস্তার মোড়ে একদিন সকালবেলা দেখি খুব ভিড়, দু-তিনটে পুলিশের গাড়ি! নাক ভর্তি কৌতূহল নিয়ে আমি ভিড়ের মধ্যে নাক গলালুম। একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দুটো কুকুর। শুনলুম, রোমহর্ষক কাণ্ড। সামনের বাড়িতে গত রাত্রে জোড়া খুন হয়ে গেছে। অপরাধীকে ধরা যায়নি, কিন্তু অপরাধীর এক পাটি জুতো পাওয়া গেছে। ঐ পুলিশ কুকুর লাকি-মিতাকে জুতোর গন্ধ শুঁকিয়ে আসামীর সন্ধানে ছোটানো হবে।

শুনেই আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলুম। তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করে আমি একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়লুম। বলা যায় না, আমার যা ভুলের ভাগ্য কুকুর দুটো ফস্ করে এসে হয়তো আমাকেই ধরতো!

৫০

*****

শুনেছিলুম, তিনি ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছেই কোথাও থাকেন। ঠিক বাড়ির নম্বরটা জানি না। বাড়ি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বছর তিনেক আগে এক দুপুরবেলা আমি ট্রাম থেকে ঠনঠনের সামনে নেমে পড়েছিলাম। একটু ভয় ভয় করছিল, কি জানি কেমন লোক, আমি বিরক্ত করতে এসেছি বলে যদি ধমকে ওঠেন! যাই হোক, আজ দেখা না করে আর ফিরছি না।

কালীবাড়ির রকে একজন লোক বসে আছে, এমন চেহারা যে বয়েস বোঝার কোনো উপায় নেই। লোকটির মুখে কাঁচা-পাকা মুড়ি-মিছরি ধরনের দাড়ি—কিন্তু মাথার চুল কুচকুচে কালো। আমি একটুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এ পাড়ায় শিবরাম চক্রবর্তী কোথায় থাকেন, বলতে পারেন?

লোকটি প্রথমেই আমার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করলো। হয়তো আমার লেখা উচিত ছিল, 'করলেন', কিন্তু লোকটার ব্যবহার এমন যাচ্ছেতাই যে এসব লোককে কিছুতেই আপনি বলা যায় না। ওরকম কুটিলভাবে আমার পা-থেকে মাথা পর্যন্ত দেখার দরকারটা কি? লোকটির গলার আওয়াজ কাক ডাকার মতন, জিজ্ঞেস করলো, কে থাকে? কি নাম?

আমি সম্ভ্রমপূর্ণ গলায় পুনরায় বললুম, আজ্ঞে, শিবরাম চক্রবর্তী। দয়া করে যদি—

—বাড়ির নম্বর কত?

—আজ্ঞে বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক জানি না। সেই জন্যই তো—

—বাড়ির ঠিকানা জানো না, কলকাতা শহরে লোক খুঁজতে এসেছো? কে পাঠিয়েছে তোমায়?

—কেউ না। উনি বিখ্যাত লোক, তাই আমি ভেবেছিলাম—

লোকটি হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়লো। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, বিখ্যাত লোক এ পাড়ায়?

তারপর সে ঠোঁট দুটি পুরো ফাঁক করলো। অর্থাৎ হাসি। বললে, এ পাড়ায় বিখ্যাত লোক দুজনই আছে, আমি আর কাশীরাম ভট্‌চার্যি। আমায় তো চেনোই দেখছি, কাশীরাম ভট্‌চার্যির নাম শুনেছো? প্রখ্যাত জ্যোতিষী, সম্পর্কে আমার আপন ভগ্নিপোত, তুমি বোধহয় তাকেই—

আমি বললুম, আমি আপনার ভগ্নিপতির কখনো নাম শুনিনি বটে, কিন্তু উনি নিশ্চয়ই খুব বিখ্যাত। তবে আমি ওনাকে খুঁজতে আসি নি আমি খুঁজছি শিবরাম চক্রবর্তীকে।

—তবে যে বললে বিখ্যাত লোককে খুঁজছো? সে লোকটা কিসে বিখ্যাত?

—উনি একজন লেখক। আমাদের শ্রদ্ধেয়—

—লেখক! কি লেখে?

—প্রধানত হাসির গল্পই লেখেন। তা ছাড়া, আগে—

—হাসির গল্প? চালাকি পেয়েছো?

লোকটি এবার বেশ ক্রুদ্ধ। সোজা হয়ে বসে বললো, হাসির গল্পে আবার লেখার কি আছে হে? ওসব মানুষে লেখে? হে-হে-হে-হে, যত ইচ্ছে হাসো না, যখন খুশী, এর মধ্যে আবার লেখাপড়ার কথা কি? লেখে লোকে ধম্মো-কম্মো, সদা সত্য কথা বলিবে, কি করে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হয়—এই সব নিয়ে। তুমি এসেছো হাসির গল্পো চালাতে? আমার সঙ্গে ফাজলামি-এয়ার্কি?

ইতিমধ্যে তিন চারজন কৌতূহলী লোক জমে গেছে। একজন জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার? পকেটমার না জুতো চোর? আজকাল কালীবাড়িতে এমন জুতো চোরের উপদ্রব হয়েছে। আরেকজন বললো, পকেটমার নয় তো?

মূল লোকটি খেঁকিয়ে উঠে বললো, ছোকরাকে দেখছি তখন থেকে এখানে ঘুরঘুর করছে। বাবুরাম চক্কোবত্তী না কাকে খোঁজার ছুঁতো—

আমি ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, বাবুরাম না, শিবরাম।

—ও নামে কেউ এ পাড়ায় থাকে? আপনারাই বলুন! আমি তিরিশ বছর এ পাড়ায় আছি, আমি জানি না!

জনতা বললো, ঐ তো কাশীরামবাবু আসছেন, ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না!

বেশ টের পেলুম, লোকে আমায় ঘিরে ধরেছে। দৌড়ে পালাতে গেলে

ছিতে-বিপরীত হবার সম্ভাবনা। কাশীরামবাবুর চেহারা রোগা-চিমশে ধরনের, কপালে ফোঁটা-তিলক। দেখে আরও ভয় হলো। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, খুব বেশী রোগা লোকেরা কিছুতেই সরল কথা বোঝে না। সব সময়েই তাদের জেরা করার টেণ্ডেন্সি। ইনিও এসে বৃত্তান্ত শুনে সহাস্যে বললেন, আগে বলো তো বাপু, এ পাড়ার সেই লোকটির সঙ্গে তোমার কি দরকার ?

সর্বনাশ, এ কথা আগে তো একবারও ভাবিনি। দরকার তো কিছু নেই ! আমি আমতা আমতা করে বললুম, না, মানে, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে—

জনতা গর্জন করে উঠলো, অ্যাঁ, দেখতে ? একজন জলজ্যান্ত মানুষকে শুধু চোখের দেখা দেখতে ? স্পাই ! স্পাই !

কাশীরামবাবুই দয়ালুভাবে বললেন, আহা-হা, আগেই মারধোর শুরু করো না ! আগে দেখা যাক্, সত্যিই ও নামের কোনো লোক এ পাড়ায় থাকে কি না ! যদি এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যে কোথাও সে থাকে, আমি গুণে বলে দেবো !

ফতুয়ার পকেট থেকে খড়ি বার করে তিনি মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলেন। গোটাকয়েক চৌখুপ্পি আর ঢ্যাঁড়া। চক্রবর্তী তা হলে তোমার হলো গিয়ে অমুক গোত্র, নামের প্রথমে যদি তালব্য শ থাকে—। আমি তখন দরজা জানলা বন্ধ ঘরের মধ্যে বেড়ালের মতন আটকে পড়েছি। ভাবছি এবার আঁচড়ানো কামড়ানো শুরু করবো কি না, নাকি কেঁদে কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি দেবো !

খানিক বাদে চোখ খুলে কাশীরাম জ্যোতিষার্ণব বললেন—তেমনি হাসি হাসি মুখে, নাঃ ও নামে কোনো লোক থাকতে পারে না। সর্বৈব বাজে কথা। এ পাড়ায় কেন, কোথাও নেই !

আমি বললুম, তা হলে মণ্টুর মাস্টার কিংবা বাড়ি থেকে পালিয়ে—এগুলো কে লিখেছে ? নাকি আপনি বলতে চান, এ রকম কোনো বই-ও নেই ?

এমন সময় একটি শৌখিন চেহারার যুবা, ফর্সা, সুদর্শন, একমাথা কোঁকড়ানো চুল, ধপধপে আদ্দির পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম—ভিড়ের মধ্যে থেকে এসে আলতোভাবে আমার কাঁধ ছুঁয়ে বললে, আহা, ওকে ছেড়ে দিন ! ও আমাকে খুঁজছে।

আমার চেয়েও কাশীরামের বিস্ময় বেশী। হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, আপনিই ? তা চক্রবর্তী আপনার উপাধি না খেঁতাব ? রাঢ়ী না বারেন্দ্র ? খড়দা মেল

না ফুলেল মেল ? ওঃ! তাই বলুন, এই জন্য আমার গণনা একটুঁর জন্য মেলে নি! বলেই কাশীরাম ভিড়ের মধ্যে সুট্ করে মিশে গেলেন। যুবকটি আমার হাত ধরে ফাঁকায় নিয়ে এসে সস্নেহে বললেন, এবার বলো!

—আমার বুকের ধড়ফড় তখনো কমে নি। ঢোক গিলে বললাম, আপনার এত বয়স কম ? আমি ভেবেছিলাম একেবারে অন্যরকম!

যুবকটি বললেন,

অন্যরকম, অন্য-বেশী
বেশীর কম, কমবয়েসী।

বুঝলে ?

অথবা বলতে পারো, বয়সের ভয়েসে কখনো বেশী Boyish কখনো বায়সের মতন Raw, কখনো ভঁইসের মতন······

আমি বললুম, সত্যিই যদি আপনার কম বয়েস হয়, তবে আমাকে 'তুমি' বলবেন না। আমিও রোজ রোজ দাড়ি কামাই।

—রোজ রেজরে দাড়ি কামাও ? না দাড়ি কামিয়ে রোজের রুজি রোজগার করো ? তোমার চেহারাখানা তো দেখলে মনে হয়, চেয়ার-হারা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামানোই······

—একটু আস্তে আস্তে বলুন না, আমি লিখে নিই। অত তাড়াতাড়ি বলছেন, একটু মাঝে মাঝে দাঁড়ি কমাও না বসালে—

—বেশ, বেশ, শিখে গেছো দেখছি। তোমারও হবে। চালিয়ে যাও। পেছন থেকে রুক্ষ গলার আওয়াজে শুনতে পেলাম, এই পল্টু! পল্টু!

এক ঝলক তাকিয়ে দেখি একজন বেঁটে-কালো গুণ্ডা চেহারার লোক আমাদেরই দিকে তাকিয়ে ডাকছেন। যুবক শিবরাম চক্রবর্তীর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার নাম যে পল্টু নয়, সেটা অন্তত আমি ভালো রকমই জানি। আবার পল্টু পল্টু ডাক শুনে আমি ওঁকে বললুম, আপনাকে ডাকছেন বোধহয়। আপনার ডাকনাম পল্টু বুঝি ?

—হ্যাঁ।

—তা হলে আপনি শিবরাম নন্। শিবরামের ডাক নাম কখনো পল্টু হতে পারে না!

পিছন থেকে সেই লোকটি এসে বললো, ও বুঝি তোমায় বলেছে ও শিবরাম। ব্যাটা মহা জোচ্চোর। শিবরাম হচ্ছি আসলে আমি। আমার নাম শিবরাম সেন।—এ কথা বলেই লোকটার কি হাসি।

আমি বললুম, কিন্তু আমি তো শিবোরাম চক্রবর্তীকে খুঁজছি। সেন তো না!

—ঐ হোলো। আমিই আস্তে আস্তে চক্রবর্তী হয়ে উঠবো। শুনবে? আমি মুক্তারামবাবু স্ট্রীটের বাড়ির তক্তায় শুয়ে শুক্তো খাই। স্ত্রীকে দিয়ে জামাটা ইস্তিরি করিয়ে নিয়ে মিস্তিরি খুঁজতে যাচ্ছিলুম এমন সময় চটির সঙ্গে চটাচটি হয়ে—

প্রাগুক্ত যুবক বললেন, ধুৎ। বাজে! ওসব মুখস্থ। কেন ছেলেটাকে শুধু শুধু ঠকাচ্ছো? আমার মতন বানান্ নিয়ে বানানোর ক্ষমতা আছে তোমার? এসো না কমপিটিশান হয়ে যাক্।

—কমপিটিশানে কে জাজ্ হবে?

—কেন, এই ছেলেটি!

—উঃ, ও যদি কারুকে কম পিটি, কারুকে বেশী পিটি করে?

—আচ্ছা ঐ তো বড়দা আসছেন, বড়দাকে জাজ্ করা যাক্।

একজন সৌম্য চেহারার প্রৌঢ় আসছিলেন। বিশাল দেহ, মাথা ভর্তি চক্‌-চকে টাক, সোনার চশমা, গরদের পাঞ্জাবী, হাতে ছড়ি। মনে হয় কোনো রিটায়ার করা জমিদার বিকালের ভ্রমণে বেরিয়েছেন। লোক দুটো ওঁর কাছে গিয়ে বললে, বড়দা, আপনি বিচার করে বলুন তো, আমাদের মধ্যে কে সত্যি-কারের শিবরাম?

প্রশস্ত হাস্যে সেই প্রৌঢ় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে দেখে খুশী হলাম। পাঠকদের দেখা পাওয়াই তো আমাদের সৌভাগ্য! তুমি পাঠক আর এ দুটো হচ্ছে ঠক্। এই দুটোর কথায় কোনো কান দিও না। ওরা হচ্ছে রাম শিব, আমিই হচ্ছি আসল শিবরাম। শিবরামের Soul—আর কারুর কথায় বিশ্বাস করো না, আমার কোনো ব্রাঞ্চ অফিস নেই।

লোক দুটোর একজন বললো, ইঃ, শোল না শুকতলা? আরেকজন বললো, বড়দা, একি হচ্ছে? এ আপনার অন্যায়!

রহস্যময়ভাবে প্রৌঢ় বললেন, আমিই যে আসল শিবরাম, তোরা এতদিন জানতে পেরেছিলি? অবশ্য, এখন আমি প্রমাণ দিতে গেলে তোদের কাছে হেরেও যেতে পারি। জানিস্ তো, বার্নার্ড শ-এর মতো গদ্য কে লিখতে পারে এই নিয়ে একবার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। স্বয়ং বার্নার্ড শ-ও তাতে ছদ্মনামে লেখা পাঠিয়ে পেয়েছিলেন মোটে তৃতীয় পুরস্কার। তেমনি, তোদের কাছে আমি হেরে গেলেও—

যুবাটি বললো, আপনার চালের ব্যবসা, আপনি লাকি ম্যান, তা বলে চালাকি

করছেন এখানে? আপনি যদি শিবরাম চক্রবর্তী হন্ তো, আপনার চুল কোথায়? শৈল চক্রবর্তীর সব ছবিতে আছে, কপালের কাছে এক গোছা চুল এসে পড়েছে, এই দেখুন না, আমার মতন—

প্রৌঢ় হঠাৎ চুপসে গিয়ে বললেন, ওসব আগেকার ছবি। আগে যখন আমার চুল ছিল—

—বাজে কথা! কুড়ি বছর ধরে আপনাকে দেখেছি এইরকম গোল আলুর মতন মাথা, জন্মো থেকে আপনার টাকালু!

এর পর সেই তিনজন লোক শিবরামত্ব নিয়ে মহা ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। আমি কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর দৌড়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লুম।

শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে তারপরও আমার কোনোদিন দেখা হয় নি। দেখা হবেও না জানি। আমার ধারণা শিবরাম চক্রবর্তী নামে কোনো লোক নেই। শিবরাম চক্রবর্তী আসলে অনেকগুলো লোক। কিংবা সব মানুষেরই মনের মধ্যে যে একটি করে ছেলেমানুষ লুকিয়ে থাকে—তারই সার্বজনীন নাম শিবরাম চক্রবর্তী।

৫১

✲✲✲✲✲

আমি ভেবেছিলাম এসব গল্পগুলো আর আজকাল সত্যি হয় না। সেই যে, বৃদ্ধ ভদ্রলোক সারা জীবন কাজ করার পর রিটায়ার করে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কিংবা গ্রাচুইটির টাকা নিয়ে ফিরছেন, বাড়ি পৌঁছোবার আগেই সব টাকাটা পকেটমার হয়ে গেল। সারা জীবনের সঞ্চয় শেষ করে সামনে শুধু ধূ-ধূ শূন্যতা। শুধু গল্পে নয়, খবরের কাগজে এ-রকম খবর পড়েছি যে, মেয়ের বিয়ের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে যথা-সর্বস্ব টাকা তুলে নিয়ে ফিরছেন কোনো স্নেহময় পিতা, মাঝপথে গুণ্ডারা ছিনিয়ে নিয়ে গেল সব টাকা। হয়তো তখন শানাইয়ের অর্ডার পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেছে, বর্ষিয়সী মহিলারা পিঁড়িতে আল্পনা দেওয়া শেষ করেছেন, নিমন্ত্রণের চিঠি সব বিলি করা হয়েছে, জামাইয়ের জুতোর মাপ পর্যন্ত নেওয়া বাকি নেই, এমন সময় সেই আসন্ন উৎসব-বাড়িতে শ্মশানযাত্রীর মতো ফিরে এলেন হৃত-সর্বস্ব মেয়ের বাবা। এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

শুধু গল্পে নয়, খবরের কাগজেও এ রকম খবর পড়েছি। কিন্তু আমি ভেবে-ছিলাম, এখন আর এ-সব হয় না। এখন টাকার দাম একদল মানুষের কাছে খোলামকুচি হলেও আরেক দলের কাছে—যাদের হারায়—একেবারে বুকের মণি। এখন প্রাণ হারায় কিন্তু টাকা হারায় না আর।

আমার প্রতিবেশী অপূর্ববাবুর স্ত্রী সন্ধেবেলা নিজের ষোলো বছরের মেয়ে, আর তিনটি বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে জামাকাপড় কিনতে বেরিয়েছিলেন। অপূর্ব-বাবু লোকটি একটু অলস প্রকৃতির, এবং অলস লোকদের যা প্রধান বিলাসিতা—উনি প্রায়ই আমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তর্ক করতে আসেন। কথায় কথায় প্রায়ই বলেন, আমি যদি মুখ্যমন্ত্রী হতাম, তা হলে এদেশের—ইত্যাদি। ওঁর কথা শুনতে শুনতে আমার হাই ওঠে, বিছানায় এলিয়ে পড়ি, তবু যে ওঁকে চলে যেতে বলতে পারি না, তার কারণ শুধুই আমার ভদ্রতাবোধ নয়, অপূর্ববাবু লোকটি

নিরীহ এবং সরল এবং অসৎ নন—এবং শুধু এই কটা গুণই আজকাল এমন দুর্লভ যে, এই রকম কোনো মানুষ দেখলে তার অন্যান্য দোষ ক্ষমা করা যায়।

রাত দশটার সময় অপূর্ববাবুর বিধবা বোন এসে বললেন, হ্যাঁরে, বউমারা যে এখনো ফিরলো না? একটু ছাখ—

অপূর্ববাবু আলস্যের ভঙ্গি করে বললেন, যাবে আর কোথায়? মেয়েছেলেদের কেনাকাটা কি আর সহজে শেষ হয়।

—কিন্তু ছ'টার সময় বেরিয়েছে, এখন দশটা বাজলো।

—পঞ্চাশ দোকানে ঘুরবে, তবে তো কিনবে? ওই জন্যই তো আমি সঙ্গে যাই না!

এগারোটা বাজলো, তখনো অপূর্ববাবুর স্ত্রীর দেখা নেই। শহরের এই উপকণ্ঠে এগারোটা অনেক রাত, শেষ বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমিই বললুম, মশাই, একটু খোঁজ-খবর করুন, এত রাত হয়ে গেল!

অপূর্ববাবু হাসতে হাসতে বললেন, কোথায় খোঁজ করবো বলুন? কোন্ দোকানে গেছে, আমি কি আর জানি? বোধহয় আজ একটু ট্যাক্সি করে আসার শখ হয়েছে!

সাড়ে এগারোটা আন্দাজ অপূর্ববাবুর চেহারা কিন্তু একেবারে বদলে গেল। অলস লোকদের যা স্বভাব, হঠাৎ এক সময় অতি ব্যস্ত হয়ে ওঠে। চোখ-মুখ শুকনো করে অপূর্ববাবু বললেন, কী সর্বনাশের কথা বলুন তো! এখন আমি কি করি? কলকাতা শহর চোর-গুণ্ডায় ঠাসা, ওর কাছে যে আমার যথাসর্বস্ব!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, যথাসর্বস্ব মানে কত টাকা? অপূর্ববাবু একটি আধা-সরকারী অফিসে সামান্য চাকরি করেন। বোনাস নেই, ঘুষ নেই, শুধু মাইনের টাকা। পুজোর বাজারের ভিড় এড়াবার জন্য আগেই অফিস থেকে এক মাসের বেসিক পে ১৮০ টাকা এনেছেন, সেই সঙ্গে যাবতীয় গুপ্ত সঞ্চয় যোগ করে ওঁর স্ত্রী ২৪০ টাকা নিয়ে বাজার করতে বেরিয়েছেন।

আমি বললাম, রাস্তা হারিয়ে ফেলবে না তো?

—না, আমার মেয়ে সঙ্গে আছে, সে রোজ কলেজ যায়, সে সব রাস্তা চেনে। এখন আমি কি করি? থানায় যাবো? হাসপাতাল—

অপূর্ববাবু খুবই অসহায় হয়ে পড়েছেন দেখে আমি বললুম, চলুন বেরিয়ে দেখা যাক্।

শহরের উপকণ্ঠের মহিলাদের কোনো বিশেষ জিনিসপত্র কেনার সময় শহরের হৃৎপিণ্ডের প্রধান দোকানগুলোতে যাবার ঝোঁক হয়। অবশ্য নিউ মার্কেট

পর্যন্ত যাবার দৌড় ওদের নেই। সুতরাং কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে অনুমান করা যায়। একটা ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম।

বেশী খুঁজতে হলো না। রাত বারোটায় রাস্তাঘাট নিঝুম হয়ে গেছে, দোকানপাট সব বন্ধ। কলেজ স্ট্রীট বাজারের কাছে একটা জায়গায় খুব ভিড়। ট্যাক্সি থেকে নেমে উঁকি দিতেই দেখতে পাওয়া গেল একটা বন্ধ কাপড়ের দোকানের সিঁড়িতে অপূর্ববাবুর স্ত্রী অনড় হয়ে বসে আছেন, চোখে দৃষ্টি শূন্য, বাচ্চা ছেলেগুলো কান্নাকাটি জুড়েছে, ষোল বছরের মেয়েটি মাকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ভিড়ের মুখে মুখে প্রচুর সমবেদনা ও কৌতূহল।

ঘটনাটা জানতে পারা গেল। বেশ কয়েকটা দোকান ঘুরে এক দোকানে সব পছন্দ হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে-বসে, অপূর্ববাবুর স্ত্রী একে একে পছন্দ করেছেন, ওঁর বিবাহিত মেয়ে-জামাইয়ের জন্য শাড়ি আর পাঞ্জাবি, কুমারী মেয়েটির জন্য একটা হাল ফ্যাশানের শাড়ি (এইটাই সবচেয়ে দামী), বিধবা ননদের জন্য থান, বাচ্চাদের প্যাণ্ট-শার্ট, স্বামীর জন্য তাঁতের ধুতি। নিজের জন্য কিছু আর টাকায় কুলোয় নি যদিও। দাম দেবার সময় দেখলেন, পাশে ওঁর হাত-ব্যাগটা নেই। নেই? নেই! নেই! নেই!

আর সব আছে, দোকানের ঝলমলে আলো, রং-বেরঙের শাড়ির বাহার, অসংখ্য ক্রেতার মুখের হাসি-খুশী, সবই ঠিকঠাক আছে, শুধু নেই অপূর্ববাবুর স্ত্রীর হাত-ব্যাগ। একটা কালো ধুমসো মতো লোক গা ঘেঁষে ছিল না? সেও নেই। সে কি কোনো জিনিস কিনেছে? কেনে নি। সে শুধু চুরি করতেই এসেছিল।

গোলাপী-রাঙা শাড়িখানা মেয়ের গায়ের ওপর মেলে ধরে উজ্জ্বল মুখে বলেছিলেন, হ্যাঁরে খুকী, এই রংটা তোকে খুব মানিয়েছে। মানাবে না, দামও তো কম নয়! ছেলেদের পোশাকে লেগেছিল ওঁর স্নেহ-মাখানো হাত, স্বামীর ধুতির ওপর দৃষ্টি পড়েছিল চাপা প্রেমের, ননদের থানের গায় লেগেছিল ভক্তি—সবগুলোই-ই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল—সে-গুলো সবই আবার ফিরে গেল গাদার মধ্যে। অপূর্ববাবুর স্ত্রী দোকানের মধ্যে পাথরের মতন বসে রইলেন।

দোকানের কর্মচারীরা একেবারে নৃশংস নয়। তাদেরও প্রায় চোখে জল এসেছিল, এমন কি তারা কাপড়গুলো সব ধারেও দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু তিনি আর একটিও কথা বলেন নি। দোকান বন্ধ না করলে পুলিসে ধরে, তাই ওরা বাধ্য হয়েই ওকে জোর করে বার করে দিয়েছে। সিঁড়িতে সেই থেকে বসে আছেন অপূর্ববাবুর স্ত্রী।

অপূর্ববাবু ব্যাকুল হয়ে ছুটে গিয়ে বললেন, ওগো শুনছো? শুনছো? কী সর্বনাশ। তুমি ওরকম করে বসে আছো কেন? টাকা গেছে গেছে, তুমি বাড়ি চলো! ওঁর স্ত্রী একবার চোখ তুলে তাকালেন। তারপর ঢলে পড়ে গেলেন অজ্ঞান হয়ে।

২৪০ টাকা কি আর এমন, একে যথাসর্বস্ব বলা যায় না! অপূর্ববাবুর স্ত্রী দু-একদিন বাদেই আঘাত সামলে উঠলেন। অপূর্ববাবুর কি আর এমন ক্ষতি হলো? এতে উনি ছেলেমেয়ে নিয়ে না খেয়েও মরবেন না, বা জামা-কাপড়ের অভাবে একেবারে উলঙ্গ হয়েও থাকতে হবে না! কি আর হবে, বেঁচে ঠিকই থাকবেন। বড়জোর পুজোর মধ্যে ওর ছেলেমেয়েরা নতুন জামা-না পরার লজ্জায় বাড়ি থেকে বেরুবে না। অপূর্ববাবুর মামার বাড়িতে দুর্গা পূজা হয়—সেখানে নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া হবে না। ওঁর বিধবা দিদি কপাল চাপড়ে বলবে, আমার ভাগ্যটাই চিরকাল এমন—। বেশী কিছু ক্ষতি নয়, বেঁচে ঠিকই থাকবেন। যা হারালেন, তা হলো আনন্দ, পুজোর কয়েকটা দিনের আনন্দ হারালেন।

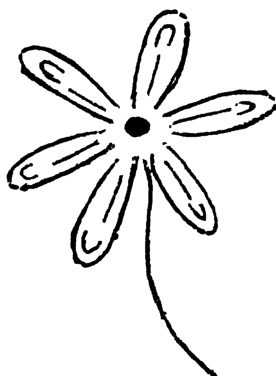
যে-লোকটা টাকা চুরি করলো, সে ২৪০ টাকায় কি পাবে? বেশী কিছু না, খানিকটা আনন্দ। অপূর্ববাবুর পরিবারের আনন্দ চুরি করে সে নিজে আনন্দ করবে। ওই দীর্ঘশ্বাস-মিশ্রিত টাকা নিয়ে লোকটা হয়তো মদটদ খাবে, জুয়া খেলবে, স্ত্রীলোক নিয়ে ফুর্তি করবে। খানিকটা আনন্দ। যারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা চুরি করে, তাদের মতই, ওই লোকটাও ভোগ করবে আনন্দ—খানিকটা শান্তিহীন, রুক্ষ আনন্দ।

মায়াকাননের ফুল

(উপন্যাস)







প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৭৫

নীল-(১)-১৭

নবনীতা দেবসেনকে

লেখকের কথা

এই লেখাটি পড়তে গিয়ে প্রথম দিকে পাঠক-পাঠিকাদের খানিকটা খটকা লাগতে পারে। মনে হবে অজস্র ছাপার ভুল। আসলে ইচ্ছে করেই অনেক বাক্য অসমাপ্ত রাখা হয়েছে। বাংলা ভাষার ক্রিয়াপদগুলো একটু একঘেয়ে। অনেক সময় সেগুলো বাদ দিলেও পুরো বাক্যের মানে বোঝা যায়। যেমন আমরা মুখের কথায় অনেক সময়।

লেখক খানিকটা বলে দিচ্ছেন বাকিটা পাঠক-পাঠিকারা কল্পনা করে নেবেন। অর্থাৎ লেখক ও পাঠক মিলেমিশে বাক্যগুলি তৈরি করছেন। এইভাবে, একটি উপন্যাসের মধ্যে লেখক ও পাঠকের সরাসরি যোগাযোগ হতে পারে। তবে, বলাই বাহুল্য, এটা একটা সামান্য পরীক্ষা মাত্র, বিরাট কোনো দাবি নেই। তাছাড়া সব জায়গাতে যে ক্রিয়াপদ বাদ দিতেই হবে, এমন কোনো ধনুর্ভঙ্গ পণও আমার। যখন যেমন মনে। অনেকটা কৌতুকের ছলেও।

নীললোহিত

কোথায় যাবো? কোনো একটা নতুন জায়গায়।

যেতে হবে ট্রেনে। আগে থেকে টিকিট ফিকিট কিছুই। ইচ্ছেই তো জাগলো বিকেলে। সারা ট্রেনটি মানুষে জম-জমাট। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত টহল দিয়ে। কোনো কামরাতেই আর একজনও অতিরিক্ত মানুষের জায়গা হবে না। শুধু ফার্স্ট ক্লাসের বগিগুলো এখনো কিছু ফাঁকা। কিন্তু থার্ড ক্লাসে টিকিট ফাঁকি দেবার অভ্যেস থাকলেও ফার্স্ট ক্লাসে নেই। এরকম ঝুঁকি নিতে সাহস ঠিক।

কাঁধে ঝোলানো ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট। যা হোক কিছু একটা করা।

স্টেশন থেকে কোনো দিন ফিরে যাই নি। শেষ মুহূর্তে যে কোনো কামরায় লাফিয়ে উঠেও অন্তত।

শুনেছি, কাকে যেন ঘুষ দিলে থ্রি-টায়ার বা টু-টায়ার কামরায় টিকিট পাওয়া যায় যে কোনো সময়ে। কিন্তু যাকে সেই ঘুষটা দিতে হবে তাকে খুঁজে বার করবো কী উপায়ে? ঘুষখোরদের কি মুখ দেখে চেনা যায়? তাছাড়া ঘুষ দেবার সঠিক পন্থাটা কি? টাকাটা কি আগে থেকেই বাড়িয়ে দিতে হয়, না ওরা নিজেরাই? ওদের মধ্যে যে একটি মাত্র সৎলোক আছে, যদি আমি ঠিক তার সামনেই পড়ে যাই? যদি সে রাগ ও দুঃখের সঙ্গে বলে, ছিঃ, আপনি আমাকে অপমান?

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, আমি এ পর্যন্ত কখনো কারুকে ঘুষ দিই নি। কারুকে নিতেও দেখি নি। এমনকি, এতগুলো বছর বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে, এরকম একটা বড় শহরে, অথচ আমার চোখের সামনে একটাও মৃত্যু ঘটে নি, দুর্ঘটনাও না। আর সবাই দেখেছে, আমারই দেখা হয় নি। কোনো নিষ্ঠুর রমণীও আমার চোখে পড়ে নি। কত কী যে বাকি আছে!

—দাদা, আগুনটা

পাশ ফিরে দেখলাম, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একজন মধ্যবয়স্ক ফর্সা চেহারার লোক, মুখে সিগারেট গোঁজা, হাতটা আমার সিগারেটের দিকে। লোকটির নাক ও চোখে স্পষ্ট মঙ্গোলীয় ছাপ। এমন হতে পারে, তিব্বতরাজ একবার যখন বাংলাদেশ জয় করেছিলেন, তখন তাঁর সৈন্য বাহিনীর কারুর সঙ্গে এদের পরিবারের রক্তের সংমিশ্রণ। এরকম হঠাৎ মনে আসে।

ধীরে সুস্থে পকেট থেকে দেশলাইটা। ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত লক্ষ্য রাখলাম লোকটির দিকে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যে অন্য কারুর কাছ থেকে আগুন চায়,

সে নির্ঘাত কৃপণ। কেননা কাছেই দেশলাই কিনতে। এটাও আমার এক মুহূর্তের চিন্তা। পরে ভুল প্রমাণিত।

দেশলাইটা ফেরত দিয়ে লোকটি হনহন করে চলে গেল সামনের দিকে। ধুতি-পরা লোকের এতজোরে হাঁটা কি ঠিক?

বাচ্চাদের ঝুমঝুমির যে রকম আওয়াজ, স্টেশনের মানুষজনের ভিড়ের মধ্যে সেই রকম একটা আওয়াজ সব সময়। তাছাড়া, একই সঙ্গে এখানে ব্যস্ততা ও মন্থরতা। বেঞ্চগুলোতে যারা জায়গা পেয়েছে তারা এরই মধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেয়। গরম দেশে শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও প্রকাশ্যে ঘুমোতে লজ্জা পায় না। এই সন্ধে বেলাতেও। আমার একটুও ভালো লাগে না এসব দেখতে।

জানলাগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে। কোনো জানলার পাশে যদি কোনো সুন্দরী। যে কোনো একটা কামরায় উঠতেই হবে, তখন মোটামুটি একটু চোখের আরাম যাতে। সে রকম কেউ নেই। হঠাৎ নাকি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে মেয়েদের গলার হার টেনে ছিঁড়ে নেয় আজকাল। মেয়েরা তাই ভেতরের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে।

আমার খুব কাছেই দুটি যুবক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলা খাচ্ছে। বেশ নধর, পাকা হলুদ রঙের। লক্ষ্য রাখি, কলার খোসা ওরা কোথায়। ছেলেবেলায় বয়স্কাউট ছিলুম তো। কেউ প্ল্যাটফর্মে বা রাস্তার ওপর ফেললে তার সামনেই তাকে অপমান করার জন্য আমি খানিকটা আড়ম্বরের সঙ্গে পা দিয়ে সেগুলো সরিয়ে।

ছেলে দুটির কলা খাওয়া এখনো শেষ হয় নি, এর আগেই একটা অন্যরকম দৃশ্য। ওদের সামনে দাঁড়ানো একটি ভিখিরি। বেশ বৃদ্ধ ও লম্বা। ওরা প্রথমে তার দিকে নজরই দেয় না। তারপর একসময় বিরক্ত। একজন তার হাতের অতিরিক্ত একটি কলা বৃদ্ধটির দিকে বাড়িয়ে বলে, এই নাও!

এটা নতুন কিছু নয়। এর পরের টুকু।

ভিখিরিটি যেন কুঁকড়ে গেল। অত্যন্ত বিনীতভাবে বললো, না, না, না, আমার ভুল হয়েছে। আপনাদের মুখের গ্রাস।

—আরে নাও না, নাও না, বলছি তো

—আমায় মাপ করবেন, আমার ভুল হয়েছে

ভিখিরিটি দ্রুত সেখান থেকে পা চালিয়ে। আমি সেদিকে একটু চিন্তিত-ভাবে। অদ্ভুত তো! এই ঘটনাটা দেখে আমার কিছু একটা মনে হওয়া উচিত ছিল। চোখের সামনের যে কোনো ঘটনা সম্পর্কেই আমরা তক্ষুনি একটা সিদ্ধান্ত

নিয়ে। এই ভিখিরিটিকে দেখে আমার খুশী হওয়া উচিত না বিরক্ত? ভদ্র ভিখিরি হিসেবে এ অনন্ত, কিংবা অন্ত ভিখিরিদের চেয়েও অনেক বেশী বোকা?

তারপর হাসি পেল। ভিখিরিও মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে চায় না। অথচ

ঘণ্টা বাজলো। এবার ট্রেন। আমি সোজা সামনের কামরার দিকেই পা বাড়াচ্ছিলুম, এমন সময় সেই মঙ্গোলিয়ান মুখ ভদ্রলোকটি হন্তদন্ত হয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথায় যাবেন?

—কেন বলুন তো?

—একটা টিকিট আছে, এক্সট্রা···আমাদের একজন লাস্ট মোমেণ্টেও এলো না।

—কোথাকার টিকিট?

—ডেহরি অন শোন···আপনি যা দাম দিতে চান, মানে আপনি যদি অত-দূরে নাও যান···এখন তো আর ফেরত দেবার সময় নেই···

—আমি ডেহরি অন শোনেই যাবো। কত টাকা দিতে হবে।

—আগে উঠে পড়ুন, উঠুন, গাড়ি এক্ষুনি

লোকটি আমার হাত ধরে প্রায় টানতে টানতেই। দরজার সামনে বেশ ভিড়। তার মধ্যে সেই ভিখারিটা। কেউ কেউ তাকে ধমক দিচ্ছে, আরে বাবা, সরো, সরো—

আমি কোনোক্রমে ভেতরে ঢুকে। আস্ত একটি বাঙ্ক আমার জন্য। টিকিট ও রিজার্ভেশন কার্ড হাতে দিয়ে লোকটি বললো, একেবারে ওপরেরটা। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

—না, কিছু না।

—আপনি ডেহরি অন শোনেই যাচ্ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আশ্চর্য! কি অদ্ভুত যোগাযোগ।

বস্তুত এইখান থেকেই গল্পের শুরু। ডেহরি অন শোনে আমার চেনা কেউ নেই, কোনো দিন সেখানে যাওয়ার কথা ভাবিই নি। একেবারে নিরুদ্দেশে কেউ বেরিয়ে পড়ে না, বিশেষত আমি পরীক্ষাতেও ফেল করি নি, প্রেমেও ব্যর্থ হই নি এখনো। মনে মনে এঁচে রেখেছিলাম, সমীরের ওখানে যদি···খুব বেশী দূর নয়।

কিন্তু অত্যন্ত ভিড়ের ট্রেনে যদি কেউ আমাকে হঠাৎ একটা টিকিট দেয়, তবে আর সেখানে না যাওয়ার কোনো যুক্তি আমার নেই। ব্যাপারটাকে আরও

যুক্তিযুক্ত করার জন্য আমি কাঁধের ব্যাগটা ওপরের বাঙ্কে রেখে, ফের দরজার কাছে এসে সেই লম্বা মতন ভিখিরিটাকে দশ পয়সা। সে যখন নমস্কার করতে আসে, আমি লক্ষ্য করি, তার ডান হাতে ছ'টা আঙুল।

মঙ্গোলিয়ান-মুখ লোকটির নাম অরবিন্দ ভৌমিক। তার বন্ধুর আসার কথা ছিল, কেন আসতে পারে নি, সেজন্য ঈষৎ দুশ্চিন্তিত মুখে আমায় প্রশ্ন করলো, বলতে পারেন, বেলেঘাটার দিকে আজ কোনো গণ্ডগোল হয়েছে কিনা।

এটা আমি সত্যিই জানি যে সকালবেলা বেলেঘাটায় একজন রাজনৈতিক কর্মী নিহত হয়েছে। দুপুরবেলা রেডিওতে।

—আপনার বন্ধুর নাম কি ?

—অশেষ মজুমদার, চিনতে পারবেন বোধ হয়, জাস্টিস চন্দ্রভূষণ মজুমদার—যিনি আবার ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডে…তাঁর মেজো ছেলে…আমার ফার্স্ট ফ্রেণ্ড

একটু থেমে কি যেন চিন্তা করে আবার বললো, অশেষ কোনোদিন কথা দিয়ে ফেইল করে না। যাক গে, আপনাকে কিন্তু ট্রেনে এই নামেই, মানে, চেকার যদি আসে—নাম জিজ্ঞেস করে না অবশ্য, তবু যদি, আপনি তা হলে ঐ নামটা—

—কোন নাম ?

—আমার বন্ধুর নাম যা বললাম

এমনও হতে পারে, অশেষ মজুমদারই আজ বেলেঘাটায়। রেডিওতে যেন ঐ রকমই একটা নাম। ট্রেনে আমাকে ঐ নামেই। কিন্তু অরবিন্দ ভৌমিকের বন্ধু হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, বয়েসের তফাতের জন্যই—

চলন্ত ট্রেনের হাওয়ায় কেউ বুকের কাছে জামায় হাপর দিয়ে ঘাম শুকোবার। বাইরে আলো অতি ক্ষীণ। এর মধ্যেই ওপরের বাঙ্কে উঠে বসা চলে না, রাত মাত্র আটটা। কেউ কেউ অবশ্য এরই মধ্যে ঘুমের তোড়জোড়।

অরবিন্দ ভৌমিক একা নয়, তার সঙ্গে একজন বৃদ্ধা। তিনি উল্টো দিকে চক্ষু বুজে। অরবিন্দ ভৌমিক বললো, মা, তুমি একটু এদিকে এসে বসো তো—ওনাকে একটু বসার

একজন মাসিক পত্রিকা পাঠরত যুবকের পাশে আমি এসে। তারপর পকেট থেকে টাকা পয়সা বার করে অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে। সামান্য খুচরো সাত পয়সার হিসেব মেলানো যায় না। সে বললো, ঠিক আছে।

আমি সেটা মানতে রাজি নই। ভিখিরিটিকে দশ পয়সা না দিলে ঠিকই হিসেব মিলে যেত—একথা অবধারিতভাবেই আমার মনে পড়ে। সে কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আমি বললাম, আচ্ছা, কাল সকালে

—আপনি আচ্ছা লোক তো—মোটে সাতটা পয়সা

সাতের সঙ্গে পাঁচ যোগ করলেই একটা দেশলাই কেনা যায়। আমি পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিতে গিয়েই ফের হাত সরিয়ে। ওর মায়ের সামনে

কিন্তু ওর মায়ের সামনে কি আমি সিগারেট খেতে পারি? মনস্থির করতে পারি না। বৃদ্ধা যখন সরু চোখে আমারই হাতের দিকে। আমি ম্যাজি-শিয়ানের কায়দায় সিগারেট দেশলাই লুকিয়ে। একটা অস্বস্তি।

আমার পাশের যুবকটি অন্যমনস্কভাবে ফস করে সিগারেট জ্বালিয়েই ধোঁয়া ছাড়লো সোজা সামনে। এর কোনো বাধা নেই। এতো অরবিন্দ ভৌমিকের বন্ধুর টিকিটে যাচ্ছে না!

এবার কামরাটার দিকে ভালো করে চোখ বুলিয়ে। আমাদের কিউবিকলে ছ'জন মানুষের মধ্যে বাকি দু'জন: একজন বছর তিরিশেক বয়েসের বউ ও একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ফ্রক পরা মেয়ে। এদের আমি আগেই দেখেছি, কিন্তু সরাসরি চোখের দিকে তাকাই নি। এখন আমরা সহযাত্রী, এখন কোনো বাধা নেই।

—আপনি ডেহ্‌রি অন শোনে কোথায় যাবেন?

এর উত্তর আমি একটু আগেই ভেবে ঠিক করে। আলগাভাবে বললাম, ওখান থেকে আবার ট্রেন বদলাবো

—কোনদিকে? ডাল্টন গঞ্জের দিকে?

যেন ঐ সব অঞ্চল আমার কতই চেনা, এই ভঙ্গিতে শুধু মাথা নাড়ি। তারপর ব্যস্তভাবে বলি, একটু আসছি।

অরবিন্দ ভৌমিক আমার বন্ধু নয়, আমার অভিভাবক নয়, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আসার তো কোনো প্রয়োজন নেই। তবু যেন কেন আমার একটু কৃতজ্ঞ ভাব। একটা টিকিট দিয়েছে বলে? টিকিটটা ওর নষ্ট হতোই। কিন্তু, প্ল্যাটফর্মের অত ভিড়ের মধ্যে শুধু আমাকেই নির্বাচন।

অকারণেই একবার বাথরুমের দিকে ঘুরে ফিরে। অন্যান্য কিউবিকলের যাত্রীরা এরই মধ্যে বিছানাপত্র গোছাতে ব্যস্ত, মাত্র আটটা বেজে পনেরো কুড়ি। অনেকে খাবারের কৌটো খুলে। চারজন যুবক তাস খেলায়। সমস্ত কামরাটি ঘুরে এসে আমি একটি কালো সিল্কের বোরখা পরা, ইদানীং মুখটুকু খোলা, মুসলমান রমণীকেই সুন্দরী শ্রেষ্ঠা আখ্যা দিই। আমাদের জায়গাটা থেকে সে অনেকটা দূরে। ভোরবেলা উঠেই এঁর মুখ দর্শন করতে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাতেই মনে পড়লো, সারা রাত কি এই জন্য আমাকে বারবার উঠে আসতে হবে? সিগারেট ছাড়া তো আমি বেশীক্ষণ। তা ছাড়া এত হাওয়ায় সিগারেট ঠিক জমে না।

চাঁদের হালকা ছায়া পড়েছে পৃথিবীতে। অসুন্দর শহরতলিও এখন একটু একটু রহস্যময়। বিশেষত খাল বা পুকুরের জল যখন অন্ধকারের মধ্যে চকচক করে ওঠে। জলের প্রতি আমার বড় বেশী টান। অচেনা জল দেখলেই ভালোবাসতে। হঠাৎ বুকের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে শৈশব।

মনে হয়, জলের ওপাশে ঐ যে প্রান্তর, যেখানে অন্ধকার আরও গাঢ়, সেখানে একটা গোপন সুড়ঙ্গ হয়তো। তার ওপাশেই স্বর্গ। এসব ছেলেবেলার কথা। পকেটে সব সময় একটা গুলিসুতোর ডিম থাকতো, যদি কখনো সুড়ঙ্গে ঢুকতে হয়—

ফিরে এসে দেখলাম, সকলেই বিছানা পেতে ঠিকঠাক। মাসিক পত্রিকা-হাতে যুবকটি বললো, আপনি বসবেন তো বসুন না—

তাহলে ওদের বিছানার ওপরেই বসতে হয়। বিছানাটি বধূটির। ইংরেজ-ভদ্রতার সঙ্গে বলি, না, না, আমি ওপরেই

একদম নিচের দুটি বাঙ্কে মহিলা ও বৃদ্ধা। মাঝখানের দুটিতে কিশোরী ও মাসিক পত্রিকা। আমার ওপাশে অরবিন্দ ভৌমিক।

চটি খুলে ওপরে আগে রেখে তারপর কসরৎ করে ওঠা। ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়তেই অরবিন্দ ভৌমিক বললো, আপনি বিছানা আনেন নি?

আমি আরও কী কী আনি নি তার একটি তালিকা তক্ষুনি শুনিয়ে দেওয়া উচিত। তার বদলে একটু সাদা-মাটা হাসির সঙ্গে জানালাম, না, দরকার হয় না।

—আমার সঙ্গে একটা এক্সট্রা বালিশ আর চাদর আছে

অনেক মানুষই বোঝে না যে অপরের কাছ থেকে কোনো রকম দয়া বা সাহায্য নেওয়া কারুর কারুর পক্ষে কি রকম অস্বস্তিকর। আমি আপন মনে থাকতেই বেশী।

—না। সত্যিই কোনো দরকার নেই।

—আরে নিন না। শুধু শুধু কষ্ট করবেন কেন?

নিতেই হলো। অপরের চাদর ও বালিশে কি রকম যেন অন্য লোক অন্য লোক গন্ধ। যদিও হোটেল কিংবা ডাকবাংলোতে একথা মনে হয় না। ধন্যবাদ বলার বদলে আমার মুখটা আড়ষ্ট হয়ে। ঝোলা থেকে একটা বই বার করে।

একটা দেশলাইয়ের বাক্স খালি হয়ে গেছে। সেটা অ্যাশট্রে হিসেবে। এখানে সিগারেট ধরাতে কোনো অসুবিধে নেই। এবার বেশ আরাম বোধ। ট্রেনে শুয়ে শুয়ে যাওয়া কী সৌভাগ্য। এখানে প্রত্যেকের জন্য প্রমাণ মাপের শোওয়ার জায়গা। অতিরিক্ত মাত্র সাড়ে চার টাকা। অন্য কামরাগুলোতে বহুলোক দাঁড়িয়ে। অনেকে দু'পায়ের উপর সমান ভার রাখতেও পারে নি।

কোনো নতুন জায়গায় যাওয়া[illegible]ই সেই জায়গাটা কল্পনায় দেখে নেওয়া আমার অভ্যেস। ডেহরি-অন-[illegible]য়গাটা কেমন? স্টেশনের ওপর দিয়ে অনেক বার গেছি কিন্তু কোনো বারই। এখন কেনই বা আমি যাচ্ছি সেখানে। যাই হোক, জায়গাটা কী রকম? স্টেশনের পাশেই একটা বিশাল গুলমোহর গাছ। ব্রীজের গা দিয়ে নদীতে নামার জন্য সিমেণ্টের সিঁড়ি। তার মধ্যে একটা সিঁড়ি মারাত্মক রকম ভাঙা। সিঁড়িতে সামান্য রক্তের দাগ। আমি স্পষ্ট দেখতে। শুকনো রক্ত। একদল ছেলে দুপদাপ করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। জানতে হবে তো রক্তের ছোপটা কিসের।

কিশোরী মেয়েটি এর মধ্যে ঘুমিয়ে। অরবিন্দ ভৌমিকের সঙ্গে চোখাচোখি এড়াতে গেল। আমাকে ওরই দিকে তাকাতে।

একটা ব্যাপারে খটকা লাগে। অরবিন্দ ভৌমিক যাচ্ছে তার মায়ের সঙ্গে, আর এক বন্ধুর আসার কথা ছিল। কি রকম যেন অদ্ভুত কম্বিনেশন। মাসিক-পত্রিকা-পড়া যুবকটির সঙ্গে বিবাহিতা মহিলা ও কিশোরীটির সম্পর্ক কি? মহিলাটি ও যুবকটি ভাই বোন? এরা এত কম কথা বলে কেন। কিশোরী মেয়েটি, বিশেষত, কি দারুণ গম্ভীর। ট্রেন যাত্রার চাঞ্চল্য পর্যন্ত নেই। এই বয়েসের সকলেই তো। হোক না অচেনা, তবু ঠিকঠাক সম্পর্ক না মিললে মনটা কী রকম যেন অপ্রসন্ন হয়ে।

কি একটা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। তুমুল হৈহৈ। বহুলোক জোর করে কামরায়। শুয়ে-থাকা মানুষগুলো চিৎকার করে উঠলো, দরজা, দরজা। কেউ নিজে থেকে উঠছে না। কামরা প্রায় ভরে গেছে বাইরের লোকে। তখন শুয়ে-থাকা মানুষের হুকুম, এই নিকালো, নিকালো, দেখতা নেই হ্যায়, রিজার্ভ কম্পার্ট—

—কে দরজা খুলেছে কে? দরজাটাও বন্ধ করে রাখা হয় নি? অ্যাঁ?

আমি চোরের মতন গুটিশুটি মেরে চুপচাপ। শেষবার আমিই সিগারেট খাবার সময় দরজা খোলা রেখে। কেউ কি টের পেয়েছে যে আমিই?

অনেকক্ষণ ধরে চ্যাঁচামেচি ও হল্লা। যারা উঠে এসেছে তারা কেউ নামবে

না। তাদেরও তো যেতেই। কণ্ডাকটর গার্ড উধাও। বচসা চলতে চলতেই ট্রেন হঠাৎ ছেড়ে। তখন আদি যাত্রীরা যে-যার নিজের বাঙ্কে গিয়ে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, প্রত্যেকেই একটু বেশী লম্বা হয়ে যায়, যাতে আর একটুও জায়গা না থাকে, আর কেউ সেখানে বসতে।

ফর্সা জামাকাপড় পরা নবাগতরা দাঁড়িয়েই থাকে, তাদের মুখ-মণ্ডলে অভিমান ও রাগ। অন্যরা মেঝেতেই। আমার [illegible]াথের নিচেই এক জোড়া সাঁওতাল দম্পতি, এদের কাপড় যদিও অত্যন্ত প[illegible] তবু এরা মেঝেতেই এবং মুখে কোনো অভিমান নেই। দুটি পুঁটলির ওপর ওরা দু'জন। ওদের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে। যেন বিহ্বলতার সমুদ্র থেকে এই মাত্র স্নান করে এসেছে।

অরবিন্দ ভৌমিক মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বললো, ঘুমের দফা গয়া। মাল-পত্তরের ওপর নজর রাখতে হবে, বুঝলেন ! কত চোর ছ্যাঁচোর আছে এর মধ্যে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস।

কিশোরী মেয়েটি এখন জেগে। সম্পূর্ণ খোলা চোখ, তার ঠোঁটে একটু দুঃখ-দুঃখ ভাব। এই বয়সে হয়। এত হৈচৈ-এর মধ্যেও ও একটিও কথা বলে নি।

মেয়েটির নাম কি ?

আমার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই স্বল্পবাক কিশোরীটির একটি নাম না দিলে, এর চরিত্র সম্পূর্ণতা পায় না। হলুদ রঙের স্কার্টের বদলে যদি ও শালোয়ার কামিজ পরে থাকতো, তা হলে আমি যেমন ওকে অগ্রাহ্য।

বার বার ওর দিকেই আমার চোখ। শুধু ওর রূপের জন্যই নয়। ওর নীরবতা। এই বয়েসের সব মেয়েরই শরীরে একটা হঠাৎ-আসা লাবণ্য বড় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। এর রূপ তার চেয়েও কিছু বেশী। কিন্তু এই বয়েসটা তো উচ্ছৃ-ঙ্খলতারও। ও কেন এত চুপ ?

চোখ বুজে মেয়েটির একটা নাম বসাবার চেষ্টা করছি এমন সময় কান্নার শব্দ। চমকে নিচের দিকে। প্রথমে বুঝতে পারি না। কে ? কোন দিকে ? তারপর শব্দ অনুসরণ করে। কিশোরী মেয়েটিই দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। মধ্যের যুবকটি হাত বাড়িয়ে উদ্বেগের সঙ্গে বললো, রমু, কি হয়েছে ?

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামিয়ে দেয়। যুবকটি আবার বলে, এই রমু, কি হয়েছে ?

বুঝতে পারি সমস্ত কামরা উৎকর্ণ হয়ে আছে মেয়েটির উত্তর শোনার জন্য। একতলার বধূটিও উঠে দাঁড়িয়ে।

অতি ব্যস্ততায় আমার এক পাটি চটি পড়ে গেল নিচে। সাঁওতাল যুবকটির গায়ের ওপরে।

সাঁওতাল যুবকটি তার সুন্দর বড় চোখ মেলে তাকালো আমার দিকে। তাতে বিস্ময় কিংবা বিরক্তি আছে বোঝা যায় না।

আমি মরমে মরে গিয়ে অত্যন্ত লজ্জিত গলায় বলি, ভাই, কিছু মনে করো না।

চটিটা আমার হাতের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে ওর গায়েই। ছি ছি। এই বিশ্রী ব্যাপারটার জন্য আমি সেই মুহূর্তে মেয়েটির দিকে মনোযোগ দিতে পারি না।

আমি নিচে নামবার আগেই সাঁওতাল যুবকটি আমার চটিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

এতে আমি আরও বেশী লজ্জিত বোধ। অপরের জুতো হাতে নেওয়া মোটেই সুচারু ব্যাপার নয়। কেন ও আমার জুতো। আমি ওর কাঁধে স্নেহের হাত রেখে বলি, ভাই, কিছু মনে করো নি তো!

এ কথার কি উত্তর দিতে হয় সে জানে না। এ সব ভদ্রলোকি ভাষা। যেমন আমি ওকে 'তুমি' সম্বোধন করছি। কাল সকাল থেকে আমি ওকে আপনি।

ঠিক। অনেক কিছুই কাল থেকে শুরু করবো, এই রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার বহুদিনের দুর্বলতা।

আমার নিচের বাঙ্কের যুবকটি ওকে একটু ঠ্যালা মেরে বললো, এই, একটু হঠ্ যাও তো!

তারপর কিশোরী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো, এই রমু, তোর কি হয়েছে? বল্ না কি হয়েছে?

মেয়েটি কান্না থামিয়ে এখন নীরব। অনেক সময় স্বপ্নের মধ্যে ভয় বা দুঃখ পেয়ে এ রকম কান্না। কিন্তু মেয়েটি তো জেগেই। এক মিনিট আগেই দেখেছি। ওর খোলা চোখ। ওর এখনকার নীরবতাই আরও বেশী কৌতূহল উদ্দীপক।

—রমু, কাঁদছিলি কেন?

মেয়েটি এবার বললো, কিছু না। তারপর সে অন্যদিকে মুখ। এই সময় ট্রেন একটা ব্রীজের ওপর দিয়ে যায়, বিরাট শব্দ। যেন সমস্ত লৌহসভ্যতার তারস্বরে চীৎকার।

—তোর পেট ব্যথা করছে?

—না

—তাহলে কাঁদছিলি কেন ?

একতলার বাঙ্কের মহিলাটি উঠে এসে শান্ত হুকুমের সুরে বললেন, কি হয়েছে আমাকে বল তো।

—কিছু হয় নি বলছি তো!

—আমার দিকে মুখ ফেরা

কিশোরী মেয়েটি মুখ ফেরালো। তখনো তার চোখের দু'পাশে অশ্রুরেখা। আমার বুকটা মুচড়ে ওঠে। এই চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েটির কি এমন দুঃখ, যাতে রাত্রে ট্রেনের কামরায় একা একা সে কেঁদে ওঠে। মনে হয়, এই দুঃখের অতলতা আমি ছুঁতে পারবো না। আমি সতর্ক হয়ে রুমাল। অন্য কারুর কান্না দেখলে হঠাৎ আমারও চোখে।

অরবিন্দ ভৌমিক বললো. যদি পেট-টেট ব্যথা করে···আমার কাছে ওষুধ আছে।

দেখা যাচ্ছে অন্যদের সাহায্য করার জন্য এর কাছে অনেক কিছুই মজুত। অবশ্য ওর কথায় কেউই ভ্রূক্ষেপ। মহিলাটি মৃদু ধমকের সুরে মেয়েটিকে বললেন, ছিঃ, এরকম কোরো না!

যুবকটি ও মহিলাটি দু'জনেই গম্ভীর। খুব একটা ব্যস্ততা বা উদ্বেগের চিহ্ন তো। ভেবেছিলাম ওঁরা মেয়েটির হঠাৎ কেঁদে ওঠার কারণ জানার জন্য। কিন্তু এখন মহিলাটি বললেন, কেঁদে কী হবে ? ও রকম ভাবে কাঁদতে নেই!

মেয়েটি হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছলো। তারপর বললো, ঠিক আছে, তোমরা শোও

মহিলাটি চলে গেলেন নিজের বিছানায়। যুবকটি তখনো দাঁড়িয়ে। সমস্ত কামরার লোক যে ওদেরই দিকে তাকিয়ে আছে, এটা জেনে সে একটু বিব্রত। ফস করে একটা সিগারেট জ্বেলে সে বললো, রমু ঘুমিয়ে পড়—

যেন ঘুমটা কারুর হুকুমের ওপর নির্ভরশীল। মেয়েটি কোনো উত্তর দিল না। তার গাম্ভীর্য ও কান্না, এই দুটি মিলিয়েই এই কিশোরী মেয়েটিকে বেশ খানিকটা উঁচু করে।

অরবিন্দ ভৌমিকের নাকে সশব্দে। কামরায় হুড়হুড় করে অবাঞ্ছিত লোক উঠে পড়ায় ও বলেছিল, চোর ছ্যাঁচোড় থাকতে পারে। সারারাত জেগে নজর রাখতে হবে।

কিশোরী মেয়েটি চিত হয়ে শুয়ে। হাত দুটি আড়াআড়ি করে চোখের ওপরে।

কান্না লুকোবার জন্য কিংবা আলো আড়াল করার জন্য, কে জানে। আমি ওর পায়ের ডগা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে তন্ন তন্ন করে। পায়ের নখে রক্তকুঙ্কুম। পরিচ্ছন্ন গোড়ালি। হাঁটু পর্যন্ত নগ্ন। তার সুডৌল পায়ের গোছ দেখে সাহেবরা প্রশংসা করতো। হলুদ রঙের স্কার্ট। কোমরে একটা বেল্টের মতন স্ট্র্যাপ থাকায় কোমরটি যথেষ্ট সরু দেখায়। তার বুকের স্বাস্থ্য ভালো। তার গলা দেখলে টিনকাটা মাখনের কথা মনে আসবেই। ধারালো চিবুকে খানিকটা জেদী ভাব। ঠোঁটে যেন লেগে আছে অভিমান। কিংবা ওটা আমার কল্পনা। রমু। ওর পুরো নাম কি? রমা কিংবা রমলা নাম তো ওকে মানায় না। দেখলেই বোঝা যায়, ও এখনো ঘুমোয় নি। কি ওর দুঃখ?

পাশের কিউবিকলে কিসের যেন বাগ্‌বিতণ্ডা। উৎকর্ণ হই। নতুন কিছু না, জায়গা দখলের লড়াই। আমাদের এদিকে নিচের দুটি বাঙ্কেই স্ত্রীলোক বলে কেউ জোর করে বসতে আসে নি। অন্য জায়গায় ছাড়বে কেন? এদিকের মেঝেতে সাঁওতাল দম্পতি ছাড়া আর কেউ নেই। দূরে এখন সবাই মোটামুটি মালপত্রের ওপর একটা না একটা বসার জায়গা।

পুঁটলি থেকে খাবার বার করে সাঁওতাল দম্পতি এখন ডিনার সেরে নিচ্ছে। কয়েকটা লাড্ডু। ইটের মতন শক্ত চেহারা। সেগুলো দাঁত দিয়ে ভাঙতে ভাঙতে খুব নিম্ন স্বরে কথা। আগে লক্ষ্য করি নি, মেয়েটি গর্ভবতী। তাই ওর চোখে মুখে এত অলস লাবণ্য। আমি লোভীর মতন ওদের খাওয়া। আমার খিদে পায় নি, শুধু দেখতে ভালো লাগছে এমন! পরের জন্মে আমি সাঁওতাল হবো। এই রকম গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে ট্রেনের কামরায় মেঝেতে বসে লাড্ডু খাবো।

ট্রেনে আমার সহজে ঘুম আসে না। যদি জানলার কাছে বসার জায়গা একটা! অন্য সবাই এখন ঘুমোচ্ছে মনে হয়। আর একবার কিশোরীটির দিকে। কি জানি বোঝা যায় না।. নিশ্বাসের স্পন্দনে তার বুক উঠছে নামছে না। কি সুন্দর এই বয়েস, যেন সবেমাত্র ভোর হলো। ভোরবেলার মতন একটি কিশোরী পা ফেলে ফেলে আসছে যৌবনের দিকে। একমাত্র তাকেই মানায়, আমি বললুম সুন্দর. তাই এ পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠলো। তবু সে একা আপনমনে কেঁদে ওঠে কেন? আর কিছু না, তার ঐ রহস্যটার জন্যই তার খুব কাছাকাছি যেতে।

খুব সাবধানে বাঙ্ক থেকে নিচে। চটি জোড়াটা হাতে। আমি চলে এলাম বাথরুমের দিকে। এখানে মেঝেতে অনেক লোকজন বসে আছে। এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে বাথরুমে যাওয়া বিশ্রী ব্যাপার।

একটু বিরক্তভাবে আমি বললাম, অন্য কোনো কামরায় আর জায়গা নেই ?

একজন বিদ্রূপের সুরে বললো, তাহলে আর এখানে এসেছি কেন, এখানে কি বেশী মধু আছে ? আপনি শোওয়ার জায়গা পেয়েছেন, শুয়ে থাকুন না

শুধু শুধু এদের কাছে ধমক। কী দরকার ছিল আমার মাথা ঘামাবার ! সত্যিই তো অন্য কামরায় জায়গা থাকলে কেনই বা এখানকার মেঝেতে। আমরা অনেক সময় জেনেশুনেও এরকম অবাস্তব প্রশ্ন।

আমি বাথরুমের দরজায় হাত দিতেই আর একজন বললো, ভেতরে লোক আছে।

অগত্যা একটা সিগারেট। আমার বিদ্রূপকারীই ফস করে হাত বাড়িয়ে বললো, একটু আগুনটা

লিকলিকে চেহারার একটি ছেলে। এই রকম রোগা লোকরা বেশীর ভাগ সময়ে রেগে থাকে। শারীরিক শক্তির অভাবটা কণ্ঠস্বর দিয়ে

—কত দূর যাবেন ?

—আর দুটো স্টেশন। আচ্ছা আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

আমি উৎসুকভাবে তাকাই। লিকলিকে ছেলেটি সিগারেটটা গাঁজার কল্কির স্টাইলে ধরেছে আঙুলের ফাঁকে। কণ্ঠস্বর বেশ ভরাট। প্রশ্ন করলো, আপনি কি রাজবল্লভপাড়ায় থাকেন ?

—না তো।

—আপনার দাদা এরিয়ান্স ক্লাবে সেণ্টার ফরোয়ার্ড খেলে না ?

—না, আপনি ভুল করেছেন

—কিন্তু আপনাকে আমি কোথাও দেখেছি। খুব চেনা চেনা লাগছে।

ছেলেটির দুটি তথ্যই সম্পূর্ণ ভুল। আমাকে ও অন্য কারুর সঙ্গে। এরকম আমার প্রায়ই হয়। আমার চেহারা এতই সাধারণ যে অনেকেই ভাবে, আগে কোথাও।

তখন মনে পড়লো, আমি অশেষ মজুমদারের টিকিটে। ইচ্ছে হলো এই কৌতূহলী ছেলেটিকে বলি, আমার নাম অশেষ মজুমদার, আমি খুব সম্ভবত আজ সকালেই বেলেঘাটায় নিহত হয়েছি !

এই কৌতুক আমি নিজেই মনে মনে উপভোগ। ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে আমি ওকে জানাই, আমার কোনো দাদা নেই। রাজবল্লভপাড়ার নাম শুনেছি বটে, কখনো যাই নি। আপনি আমাকে দেখে থাকতে পারেন

—কোথায় বলুন তো, কোথায় বলুন তো—

—কার্জন পার্কে। ওখানে আমি ম্যাজিক দেখাই।

ছেলেটি সন্দেহভরা চোখ নিয়ে আমার মুখের দিকে। তারপর বলে, ট্রেন লেট করবে মনে হচ্ছে।

বাথরুমের দরজা এই সময় খোলে।

ফিরে এসে আমি আবার আমার বাঙ্কে। বইটা খুললাম। তারপরেই তাকালাম পাশে। কিশোরী মেয়েটি চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়েছে। চোখ দুটি খোলা। সেখানে নিঃশব্দে অশ্রু। আমি অত্যন্ত ব্যাকুলতা বোধ করি। কেন একটি মেয়ে একা একা শুয়ে কাঁদবে? ওর সঙ্গের পুরুষ ও মহিলাটি এখন ঘুমন্ত। আমি ওর অচেনা, আমি তো ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে। যদি আর একটু ছোট হতো, যদি খুকী বলে সম্বোধন করা যেত। কিন্তু এখন ওর বিপজ্জনক বয়েস, অচেনা লোকের বেশী কৌতূহল কেউ সুনজরে দেখে না।

মেয়েটি পাশ ফিরলো। মনে হয় ওর শরীরটা কেঁপে কেঁপে। কান্না চেপে রাখার চেষ্টায়। কিংবা এটা আমার দেখার ভুল। কাঁপছে না। কেউ যদি স্নেহময় হাত ওর মাথায় বুলিয়ে এখন ওকে ঘুম পাড়িয়ে।

আমি কতদিন কাঁদি নি? বই পড়তে পড়তে কিংবা সিনেমা দেখার সময় প্রায়ই আমার চোখে জল আসে। সে অন্য। নিজের কোনো দুঃখে? মনে পড়ে না।

বইটা চোখের সামনে মেলা, আমি পড়ছি না। আমার সমস্ত কৌতূহল ঐ মেয়েটির দিকে। ও এখন আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমার ঐ রকম বয়সে, সদ্য স্কুল থেকে কলেজে, তখন আমি ম্যাজিসিয়ান হবার স্বপ্ন! ম্যাজিসিয়ান হয়ে দেশ-বিদেশে। পি সি সরকারের বই নিয়ে হিপনটিজম। যাদুসম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী ভোরবেলা ছাদে উঠে দূরের সবুজ গাছপালার দিকে একদৃষ্টে। ওতে চোখের জোর বাড়ে। শ্রেণীবদ্ধ নারকোল গাছগুলির পাশেই যে বাড়ি তার ছাদে একটি মেয়ে হাতে একখানি বই নিয়ে গোল হয়ে ঘুরতো। ভোরবেলা ঘুরে ঘুরে পড়া মুখস্থ করার অভ্যেস ছিল তার। এবং আসলে সে-ই জানতো ম্যাজিক। অবিলম্বে সে আমাকে তার পোষা কুকুর বানিয়ে।

এর চার পাঁচ বছর বাদে নন্দিতা যখন সুশোভনকে বিয়ে করতে চায়, এবং আমাকে জানায়, তখন আমার মনে হয়েছিল, আমি দাতা কর্ণের চেয়ে বড়। আমি সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারি, এমনকি আমার প্রেমিকাকেও। একদিন মাত্র আমি কথার ছলে সুশোভনের সামান্য নিন্দে করেই অত্যন্ত অনুতপ্ত বোধ করি। আমি এত নিচে নামতে পারি না। পৃথিবীতে আর যাকেই হোক,

সুশোভনকে কোনো দিন নিন্দে করার অধিকার আমার নেই। সে আমার প্রেমিকার স্বামী। সে চিরকালের সম্মান পাবে।

ট্রেন কোন একটা স্টেশনে যেন। অস্পষ্ট শব্দ। ট্রেন কি অনেকক্ষণ থেমে আছে? এখন কত রাত? না, আবার চলছে···

নন্দিতার বিশেষ সাধ ছিল কোনো একদিন আমার সঙ্গে প্যারিসের রাস্তায়। তারপর যখন ও নিজেই যায় আমি তখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়······একদিন একটা সাপ···

তন্দ্রার মত এসেছিল। মনে হয় যেন এক মুহূর্ত আগে চোখ বুজেছি, আসলে বেশ কিছুক্ষণ। বইটা পাশে ঝুলছে, আর একটু হলেই। বইটা তুলতে গিয়ে চোখ পড়লো। মেয়েটি তার জায়গায় নেই। কোথায় গেল? রাত প্রায় দুটো। আমি ওর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা। শূন্য বাঙ্কটার দিকে চোখ। সারা কামরা ঘুমন্ত। আমারও আবার ঘুম-ঘুম আসছিল, কিন্তু মেয়েটি ফিরে না এলে। এটা যেন আমারই দায়িত্ব।

তাকিয়ে আছি তো তাকিয়েই। এতক্ষণ কি করছে ও? বাথরুমের দরজা বন্ধ? এত রাত্রে ও যেখানে খুশী যেতে পারে। আমি বাধা দেবার কে?

আমি আবার ঘুমোবার। চোখ বুজলেই একটা হালকা লাল রঙের আভা। চোখের ওপরেই আলো। পাশ ফিরলাম। এবারে বেশ মনোমতন অন্ধকার। যেন একটা ঘন জঙ্গল। প্রত্যেকদিন এই জঙ্গলটাকে দেখি। একদিন আমি ওখানে। হঠাৎ মনে হয় কোনো একটা জরুরী জিনিস বোধ হয় বাড়িতে ফেলে। কি? টাকা, টুথব্রাশ, একটা ডটপেন, পাজামা, তোয়ালে—আর কি লাগতে পারে? আগামীকাল কি কারুর সঙ্গে দেখা করার। কিছু যেন একটা ভুল হয়ে। পেছনে, কলকাতায়, ফেলে এসেছি কোনো ভুল। কাল সকালে যদি মনে পড়ে, তখন অন্তত আড়াইশো মাইল।

মাস তিনেক আগে, যখন আসামে গিয়েছিলাম, শিলচর থেকে ডিমাপুর যাবার পথে, কি যেন স্টেশনের নামটা, কি যেন, ওরাং······না, না, ডিব্রুগ্ড়···
···না, না লালডেঙ্গা·· না না মনে পড়েছে, হারাংগাজাও, কি চমৎকার নাম, যেন আমার পূর্বজন্মের জন্মস্থান, সেখানে, যেন, সেখানে একজন খুনে ডাকাত, হাতে হাতকড়া, আমাকে বলেছিল, আমাকে, পাশেই দাঁড়ানো দুটি পাহাড়ী তরুণী, তারা···

ধড়মড় করে জেগে উঠলাম। সত্যিই ঘুমিয়ে। এরকম উচিত হয় নি। তাড়াতাড়ি পাশ ফিরে দেখলাম, ওদিকের দ্বিতীয় বাঙ্কটা তখনো ফাঁকা। মেয়েটি গেল কোথায়? এতক্ষণ।

খুব ব্যস্ত হয়ে আমি নেমে। ওর সঙ্গী যুবক ও মহিলাটি নিশ্চিন্ত ঘুমে। আমি প্রথমেই যাচ্ছিলাম বাথরুমের দিকে। তার দরজাটা খোলা। ঢকাস ঢকাস শব্দ হচ্ছে, তবু আমি একবার তার ভেতরে উঁকি।

মেঝেতে অনেক লোক বসেছিল, এখন একজনও নেই। মাঝখানের কোনো স্টেশনে নিশ্চয়ই সবাই। খোলা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, হ্যাণ্ডেল ধরে, বাইরে মুখ ঝুঁকিয়ে।

আমি থমকে একটু দূরে। মেয়েটি যদি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে চায়, তা হলে আমার আপত্তি করার কি আছে? বিশেষত অচেনা মেয়ে। কিন্তু যে মেয়েটি খানিকক্ষণ আগে একা একা কাঁদছিল, সে যদি চলন্ত ট্রেনের খোলা দরজায়? আমি মনস্থির করতে পারি না। রাত্তির বেলা চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়ালে বিপদের স্পর্শ আছে, গুরুজনরা বকে, কিন্তু ঐ বয়েসে আমিও।

একটু দূরে আমি বিসদৃশ। অন্য সবাই ঘুমিয়ে, আমি একটি কিশোরী মেয়ের কাছাকাছি উঁকিঝুঁকি। খুব সহজভাবে যদি ওর সঙ্গে ভাব করা যায়, সেটাই খুব স্বাভাবিক, কিন্তু আমি কখনো সহজ হতে পারি না।

হঠাৎ মনে হলো, মেয়েটি বুঝি আরও ঝুঁকছে সামনের দিকে। হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দেবে। আমি দৌড়ে এসে।

এই রকম সময়ে বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত কম্পন হয়। বাতাস লাফিয়ে ওঠে, তোলপাড় শুরু হয়, যেন এক্ষুনি দম বন্ধ। আমি পৌঁছোবার আগেই যদি মেয়েটি—

দরজা থেকে সে অনেকটা ঝুঁকে ছিল, আমি দ্রুত এসে তার একটা হাত। সে বোধহয় টের পায় নি আমার উপস্থিতি আগে। তবু কোনো চমক ফোটে নি তার চোখে। সে তার নীরব মুখ আমার দিকে।

আমি ব্যস্তভাবে বলি, কি হচ্ছে কি?

মেয়েটি বললো, কি?

—এখানে,···দরজার সামনে···এখানে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

—এমনিই···কেন?

হয়তো সবটাই আমার ভুল। অতিরিক্ত কল্পনা। অন্যের জীবনের যে কোনো ঘটনাই আমি নাটকীয় ভাবে দেখতে। নাটকীয় শব্দটা স্বাভাবিক নয় এই অর্থেই কেন যে আমরা। অথচ কত নাটক জীবনের মতনই স্বাভাবিক।

মেয়েটির বদলে আমিই লজ্জা। আত্মহত্যায় উদ্যত একটি কিশোরীকে হঠাৎ

রক্ষা করায় আমার গর্বিত হওয়ার কথা। কিন্তু যদি আত্মহত্যার কোনো চিন্তাই ওর মনে না এসে থাকে, এমনিই দরজার কাছে।

আমার লজ্জাকে আমি ঈষৎ দায়িত্বপুর্ণ ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করে বলি, এত রাত্রে দরজার কাছে, এই সময় দরজা খোলা রাখা

—কেন, তাতে কি হয়েছে ?

আমি আগেই তার হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম, এই সময় সে সম্পূর্ণ আমার দিকে ফেরে। তার ভুরুতে একটু রাগের চিহ্ন।

আমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে বললাম, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি ভাবলাম

তৎক্ষণাৎ খেয়াল হলো, রাত দুপুরে কোনো কিশোরীর হাত ধরে এটা ক্ষমা চাইবার ভাষা নয়। এ অন্যরকম ভাষা। এক এক সময়, আমি যে ভালো, এটা প্রমাণ করাই কত যে শক্ত হয়ে ওঠে।

অগৌণে নিজেকে শুধ্‌রে নিয়ে আমি আবার তাড়াতাড়ি বললাম, দরজা খোলা দেখে আমি তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম।

মেয়েটি বললো, আমার ঘুম আসছিল না, খুব গরম

—তবু এখানে এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—হঠাৎ ঝাঁকুনিতে অনেক সময় বিপদ হয়। আমি তোমার জন্য ভয়···

—আমার জন্য ? কিসের ভয় ? আপনি কেন আমার জন্য ভয় পাবেন ?

—বাঃ, এ রকম অবস্থায় যে-কেউ···সত্যিই তোমার জন্য ভয় পেয়েছিলাম, তুমি এতখানি ঝুঁকে···

—আমার কিছু হবে না। তা ছাড়া আমি মরে গেলেই বা কার কি আসে যায় !

কৈশোরের এই অভিমান কি অপূর্ব সুশ্রী। একমাত্র এই বয়েসটাই পারে মৃত্যু নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে।

তখন আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমাকে তোমার বন্ধু করে নেবে ? আমাকে তোমার গোপন কথা ?

কিন্তু প্রকাশ্যে অচেনা কারুকে এরকমভাবে কথা বলার অভ্যেস নেই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি ?

যেন সে নাম জানাতে চায় না, এই রকম মুখের ভঙ্গি। একটু ইতস্তত। তারপর বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে, যেন হাওয়াকে উদ্দেশ্য করে বললো, অনুরাধা বসুমল্লিক

ওর ডাকনাম রমু শুনে আমি ভেবেছিলাম, ওর নাম রমলা বা রমা এই ধরনের। সব সময় এই অনুমান খাটে না। তবে, অনুরাধা নামটিও ওকে মানায় নি। অনুরাধা নামে যে আর দুটি মেয়েকে আমি চিনি, তারা বেশ নরম ও শান্ত। তারা মাঝরাতে একা ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়াবে না।

—তুমি এবার শুতে যাও

—যাচ্ছি

সত্যিই সে যখন ফিরে যেতে লাগলো তার বাঙ্কের দিকে, তখন আমি বেপরোয়াভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে একটা কথা···তুমি কাঁদছিলে কেন!

মেয়েটি স্থির হয়ে দাঁড়ালো। সোজাসুজি তাকালো আমার মুখের দিকে। অচঞ্চল দীপশিখার ন্যায় সেই বালিকা তেজের সঙ্গে বললো, আমি বলবো না। কেন সবাই জানতে চায়?

আমি আমার প্রাপ্য পেয়েছি। অন্যায্য কৌতূহলের জন্য। মেয়েটির চেয়ে বয়েসে অনেক বড় হয়েও আমি অপরাধীর মতন নত-মস্তকে।

সে তবু দাঁড়িয়েই রইলো। যেন আমাকে আরও শাস্তি। হ্যাঁ, আরও শাস্তি আমার প্রাপ্য। আমি একজনের পবিত্র গোপনকে উচ্ছিষ্ট করতে। অন্য কেউ যদি এরকমভাবে আমার। অবশ্য কান্না অনেক প্রশ্ন আনে। আনবেই।

মেয়েটি একটুক্ষণ থেমে, যেন আমার ওপরে দয়া করেই বললো, আমার খুব চেনা একজন পরশুদিন মারা গেছে।

আমি জানি, পৃথিবীর সবচেয়ে ভারি বোঝাটির নাম গোপনীয়তা। একা একা তা বেশীক্ষণ বহন করা যে কত কষ্টের। আমি চুপ করে।

—আজ তাকে পোড়াবার কথা। হয়তো এতক্ষণে—

তক্ষুনি সব ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। দুটি মাত্র কারণেই শুধু, মৃত্যুর দু'দিন পরে কারুকে পোড়াবার ব্যবস্থা হয়। আত্মহত্যা অথবা খুন। এ ক্ষেত্রে যে কোনটা, তাও বোঝা যায়, কণ্ঠস্বরে দুঃখের সঙ্গে ক্রোধ মিশে থাকার জন্য। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি। মেয়েটিকে ওর আত্মীয়-স্বজন জোর করে দূরে কোথাও। এই জন্যই সকলে এত গম্ভীর।

আমি বললাম, কে মেরেছে? পুলিস

—হ্যাঁ!

—ওর নাম কি?

—ওর নাম···না, বলবো না, আপনি কে? কেন এইসব কথা জানতে চাইছেন? আপনার কি আসে যায়?

ডিটেকটিভ, স্কুলমাস্টার আর লেখক—এই তিনজনই মানুষের চরিত্র সব চেয়ে ভালো বোঝে, কে যেন বলেছিলেন এই কথা? স্কুলমাস্টাররা বছরের পর বছর এত শিশুকে বড় হয়ে উঠতে দেখে যে মানুষের মোটামুটি সব-কটা টাইপ তার জানা। ডিটেকটিভ আর লেখকরা বেশী উঁকি দেয় মানুষের গোপন জীবনে। বাইরের মানুষ আর ভেতরের মানুষে যে তফাত তা তাদের চোখে অনেকটা।

ট্রেনের গতি আগেই মন্থর হয়ে এসেছিল, এই সময় একটা আলোঝলমল প্ল্যাটফর্মে। অনুরাধা আর কোনো কথা না বলে ফিরে গেল বাঙ্কের দিকে। আমি দরজার কাছেই একটুক্ষণ।

স্টেশনটা প্রায় জনহীন। সব-কটা আলো জ্বলছে, এর মধ্যে সব কিছুই ঘুমন্ত। আমি প্ল্যাটফর্মে নামি। দূরের একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে কেউ উঠছে বা নামছে। অনেক মালপত্র। যে দিকে তাকাও, মনে হবে জীবন কত স্বাভাবিক। মধ্যরাত্রির ট্রেন কোনো অখ্যাত স্টেশনে থামলে এরকমই দৃশ্য, প্ল্যাটফর্মে মানুষ ঘুমোয়, একটা কুকুর অনর্থক ছুটে যায়, ফু-র-র-র করে বেজে উঠলো গার্ডের হুইস্‌ল্—সবই ঠিকঠাক। আর এই সময় কলকাতার শ্মশানে একজন কেউ পুড়ে ছাই হচ্ছে অসময়ে, যে চেয়েছিল কিছু বদলাতে, আর অনেক দূরে, ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি মেয়ের হঠাৎ হঠাৎ কান্না—কান্না তাকে বিশুদ্ধ করবে, না জীবনটাই বদলে দেবে এমন এক দিকে।

চলন্ত গাড়িতে লাফিয়ে উঠে আমি দরজাটা খুব শক্ত করে বন্ধ। সতর্কভাবে চারিদিকে দেখে নিই। কেউ জাগে নি। সাঁওতাল বধূটির মাথা হেলে পড়েছে তার স্বামীর কাঁধে। স্বামীটির মুখ ঘুমের মধ্যেও বেশ দায়িত্ববান।

মেয়েটি শুয়ে আছে দেয়ালের দিকে মুখ। আমি তার বাঙ্কের কাছে দাঁড়ালাম। খুব কাছে। যেন আমি একবার তার কপালে হাত। যদি সে মুখ ফেরাতো, আমি তাকে আরও দু'একটি কথা। এরকমভাবে দাঁড়ানো মোটেই। অন্য কেউ দেখলে। কিন্তু অনুরাধা আমার উপস্থিতি টের পেলেও মুখ ফেরাচ্ছে না। আমি অগত্যা নিজের বাঙ্কে বেশ সশব্দেই। তবু ওর মুখ অন্যদিকে। ওর সঙ্গে আমার খুব চেনা হয়ে গেল আজ থেকে।

ঘুম যখন ভাঙলো, তখন সকালের আলো এসেছে জানলা দিয়ে। খুব গাঢ় আলো নয়, শহরে নিজের বাড়িতে শুয়ে থেকে এরকম সকাল আমি চোখে দেখি না।

অনুরাধা ও তার সঙ্গী দু'জন বিছানা গুটিয়ে পরিষ্কার। পরবর্তী স্টেশনের জন্য প্রস্তুত। আমার প্রথম আকাঙ্ক্ষা হয়, আমিও ওদের সঙ্গে। মেয়েটির

সম্পূর্ণ গোপনীয়তা হরণ করার জন্য আমার ভেতরে একটা দুর্দমনীয় চোরের মতন।-
কেনই বা নামবো না। আমি তো যেখানে খুশী।

কিন্তু মেয়েটি যদি ভাবে আমি ওকে অনুসরণ ক'রে। ভাবে ভাবুক। অন্যের সামান্য একটু ভাবনার জন্য আমি কি নিজের। এক কামরার লোক অনেক সময় কি একই স্টেশনে নামে না? তবে, মুশকিল হচ্ছে এই, আমি কাল অরবিন্দ ভৌমিককে বলেছিলাম ডেহরি-অন-শোনেই—। ওরাও শুনেছে নিশ্চয়ই।

অনুরাধা এখন নিচের বাঙ্কে বধূটির পাশে বসে আছে, আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হবার সম্ভাবনা নেই। দিনের আলোতে বুঝতে পাবি, সঙ্গের যুবক ও বধূটির মুখও খুব বিমর্ষ।

ট্রেনের গতি মন্দ হয়ে আসে, তবু আমি মন স্থির করতে না পেরে। অরবিন্দ ভৌমিকও জেগে উঠে মিটিমিটি তাকালো আমার দিকে। আমি এই স্টেশনে নামতে গেলেই নির্ঘাত চেঁচিয়ে নানা রকম প্রশ্ন। কেন যে কিছু না ভেবেচিন্তে লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করতে!

গাড়ি একেবারে থামবার আগেই ওবা দরজাব কাছে গিয়ে। থামলো, দরজা খুললো, আরও কয়েকজনের সঙ্গে ওরাও প্ল্যাটফর্মে। ওদেব আব আমি দেখতে পেলামনা। এই স্টেশনে বেশ চ্যাঁচামেচি। আমি ব্যস্ত হয়ে নেমে পড়লাম বাঙ্ক থেকে।

অরবিন্দ ভৌমিক অবধারিতভাবে প্রশ্ন করলো, কোথায় যাচ্ছেন?

—চা খেতে!

নিচে নেমে এসে ওদের আর কোথাও কোনোদিকেই। ভিড়ে মিলিয়ে গেছে। এখনো আমি ইচ্ছে করলে হ্যাণ্ডব্যাগটা নিয়ে এসে। ভিতরের দোলাচল কিছুতেই সিদ্ধান্ত নিতে দেয় না। যাক স্টেশনের নামটা জানা রইলো, দু' একদিনের মধ্যেই আমি আবার।

ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিয়ে একটু শান্তি এলো। বেশ ভালো চা। টাকা ভাঙিয়ে পরপর দু'ভাঁড়। তারপর কি মনে হলো, আরও এক ভাঁড় হাতে নিয়ে উঠে এলাম কামরায়, সেটা অরবিন্দ ভৌমিকের মুখের সামনে।

অরবিন্দ ভৌমিক বললো, একি, আপনি আবার কষ্ট করে আমার জন্য

—আপনার মায়ের জন্য আনবো কি?

—না, না. উনি বাইরে কিছু খান না

আমি আবার নেমে এলাম প্ল্যাটফর্মে। ইঞ্জিনে জল ভরছে। দেরি হবে। একটু পায়চারি করার জন্য পা বাড়াতেই। আমাদের কামরাতেই অন্য একটি

জানলার পাশে সেই মুসলমান রমণী। কালো সিল্কের বোরখাটা এখন থেকে নামানো। আমার বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা। কী অসম্ভব রূপ। ভোরবেলায় ফোটা পিশির ধোওয়ায় কোনো সাদা ফুলের সঙ্গে এর তুলনা চলবে না। কারণ, ফুলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশী সুন্দর হতে পারে, তা আমি কয়েকবার। মুখ-খানা দেখলেই মনে হয়, অন্তত এক যুগ এঁর কোনো অসুখ হয় নি।

নারীটিকে কয়েক পলক দেখে আমি সামনের দিকে পা চালিয়ে। আমার একটু একটু মনখারাপ। তখন বুঝতে পারি, কোনো কোনো সুন্দর জিনিস দেখলে কষ্ট হয়, কবিরা কেন একথা। এ এক অনির্বচনীয় কষ্ট, শিলিগুড়ি শহর থেকে জীবনে প্রথম তুষারমৌলি দেখে আমার অনেকটা এ রকম। পর্বতশৃঙ্গ কিংবা সমুদ্রের চেয়েও যে নারীর রূপ তুলনার অধিক পাওয়া যায়, কাপুরুষরা একথা স্বীকার করতে পারে না। আমার ইচ্ছে হয় প্রণাম জানাতে। আমি এই সুন্দরের অংশভাগ।

পরক্ষণেই মনে মনে একটু অনুতাপ বোধ। আমার মন এত বিক্ষিপ্ত! একটু আগেই আমি একটি কিশোরীর দুঃখের জন্য, আর এখন আমি আবার নির্লজ্জ-ভাবে অপর নারীর রূপ। অনুতাপ থেকে ক্রোধ জন্মায়। অনুরাধার কান্নার জন্য সমস্ত পৃথিবী দায়ী। এর শোধ তুলতে হবে। অনুরাধা, নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে আবার আমার।

এই স্টেশনে অনেকক্ষণ ট্রেন। এখনো ইচ্ছে করলে ব্যাগ নামিয়ে এনে। ছোট শহরে হয়তো মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যাবে—কিন্তু ওর দুঃখের শোধ তোলার জন্য কি করতে পারি। শুধু লুকোবার জন্য আমি দশদিককে অন্ধ হতে বলি।

পুনরায় আমি গতি মেলাই ট্রেনের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে। ডেহরি-অন-শোন-এ এসে আমি বিনা আড়ম্বরে বিদায় নিই অরবিন্দ ভৌমিকের কাছ থেকে। তার সব রকম সাহায্যের আহ্বান আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান। আমার প্রথম কাজ নদীর ঘাটে। স্বপ্নটার সঙ্গে মিলিয়ে না দেখলে।

সিঁড়ি একটা আছে ঠিকই। কিন্তু সেই সিঁড়ির প্রত্যেকটি ধাপে তন্নতন্ন করে খুঁজেও আমি কোনো রক্তের দাগ খুঁজে তো। অথচ, তন্দ্রার মধ্যে কেন দেখে-ছিলাম দু'তিনটি সিঁড়িতে লেগে আছে পুরোনো রক্তের ছোপ। কী এর মানে? দু'তিনবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেও। হয়তো অন্য কোনো রক্ত, আমার স্বপ্নের মধ্যে—স্বপ্ন অনেক রকম কোলাজ্ সৃষ্টি করে।

বিশাল সেতু, সেই তুলনায় নদীটি এখন একটু ছোট। আমি একেবারে

ধারে নেমে গিয়ে নদীর জলেই চোখ মুখ। এমনভাবে কোনোদিন প্রক্ষালন করি নি। বেশ ঠাণ্ডা জল। স্নানটাও সেরে নিলে। জামা, প্যাণ্ট খুলে ফেললাম, কেউ তো দেখবার নেই, ব্যাগ থেকে তোয়ালেটা বার করে। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর একেবারে বেশী জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে। আরে বেশ স্রোতের টান আছে তো! দু'একবার হাত ছুঁড়ে সাঁতার কাটতেই জড়তা কাটে। সাঁতার আর সাইকেল একবার শিখলে আর কেউ ভোলে না, প্রমাণিত হলো এবার। ব্যাপারটা পুরো ঠিক নয় যদিও! চাইবাসায় একটা সাইকেল পেয়ে, বছর দশেক অনভ্যাসের পরও অতি উৎসাহে চড়তে গিয়ে আমি প্রথমবার এক আছাড়।

কয়েকটা ডুব দিয়ে ঘাটের দিকে মুখ ফেরাতেই দেখি আমার ব্যাগ ও জামা কাপড়ের কাছে একটি ন-দশ বছরের বাচ্চা ছেলে উবু হয়ে। ছেলেটিকে তো একটু আগেও দেখি নি, যেন অন্তরীক্ষ থেকে হঠাৎ টুপ করে। বেশ চতুর চোখ মুখ। ছোঁড়াটা যদি আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে পিঠটান দেয়, আমি কি সাঁতরে পাড়ে গিয়ে দৌড়ে ওকে ধরতে? আমি জাঙ্গিয়া পরা অবস্থায় ভেজা গায়ে একটা বাচ্চা ছেলের পেছনে ছুটছি, এই দৃশ্য।

ছেলেটির দিকে চোখ রেখে আমি চিত ও ডুবে নানা রকম সাঁতারের কসরত দেখাই। তারপর পাড়ের দিকে। সিঁড়িতে এসে বসার পর বেশ অবসন্ন লাগে। সাঁতারে দুরন্ত ব্যায়াম। অনেকদিনের অনভ্যাস। যদিও আবার ইচ্ছে হয় জলে নামতে।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে আমি জিজ্ঞেস করি, এই, তোর নাম কি?

সে আমার চোখে চোখ রেখে চুপ করে থাকে। বাচ্চা ছেলেদের একটা ব্যাপার আছে, তারা কখন কোন কথায় উত্তর দেবে না-দেবে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার ওপর নির্ভর।

পরে মনে হলো, এটা বাংলায় প্রশ্ন করার জায়গা নয়। সুতরাং।

—কেয়া নাম হ্যায় তুমহারা।

—ছোটেলাল।

—ঘর কাঁহা হ্যায়?

—নেহি হ্যায়

—কেয়া, ঘর নেহি হ্যায়?

—নেহি হ্যায়

অবাক হতে গিয়েও সামলে নিই। দেশের পঞ্চান্ন কোটি লোকের প্রত্যেকেরই

যে ঘর থাকে না, এ নতুন কথা ? ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ। ঠিকই ধরেছিলাম, ছেলেটা আমার ব্যাগটা চুরি করে পালাতেও।

—কাঁহা রয়তা হ্যায় ?

ছেলেটি রেলস্টেশনের দিকে হাত দেখিয়ে বলে, উধার। বুঝলাম রেল-স্টেশনের পরগাছা। প্রায় প্রত্যেক রেলস্টেশনেই কিছু কুকুর ও কিছু বেওয়ারিশ বাচ্চা থাকে।

জামা-প্যাণ্ট পরে নিতে নিতেই বেশ খিদে চন্‌চন ক'রে। স্নান করলেই তৎক্ষণাৎ আমার এরকম খিদে। দিনের যে-কোনো সময়েই হোক।

ব্যাগ হাতড়ে দেখলাম, চিরুনি আনতে ভুলে। বাঁ হাতের আঙুলগুলো চুলের মধ্যে চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করি, আচ্ছা ছোটেলালজী, হিয়াঁ খানা মিলতা হ্যায় ?

—হাঁ, মিলতা

—কাঁহা ?

—বহুৎসা হোটাল হ্যায়

আমার এই প্রশ্নগুলি অবান্তর। যে ছেলেটা নিজে রোজ খেতে পায় কিনা সন্দেহ, সেও হোটেলের খোঁজ রাখে। এবং আমি তাকে।

ব্যাগটা তুলে নিয়ে আমি তার মাথায় একটা আলতো চাঁটি মেরে জিজ্ঞেস করি, হিয়াঁ পর কিঁউ আয়া ?

সে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার দরকার মনে করে না। আমি তবু হিন্দী বলার উৎসাহে আবার বলি, তুমহারা পিতা মাতা কোই হ্যায় ?

আমার এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি তার ইজেরটা খুলে ফেলে। কোমরে একটা ঘুনসি বাঁধা। তরতর করে দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জলে এবং জলের পোকার মতন সাঁতার কাটে। সে যে আমার চেয়ে অনেক ভালো সাঁতার জানে, এটা দেখানোই যেন তার। এক একবার ভুস করে মাথা তুলছে আর হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। প্রথম নজরে দেখেই বুঝেছিলাম, অতি পাজী ছেলে।

ওকে জব্দ করার একমাত্র উপায়, ওর দিকে নজর না-দেওয়া। আমি মুখ ফিরিয়ে সিঁড়ির ওপারের দিকে। ছেলেটা চেঁচিয়ে কি যেন বলে। আমি শুনতে চাই না। ও যদি গালাগালও করে আমাকে, বিনা কারণেই, আমার সাধ্য নেই ওকে শাস্তি দেবার! হঠাৎ আমার সামনেই কি রকম অবলীলাক্রমে ইজেরটা!

হোটেল খুঁজে দু'খানা চাপাটি আর এক প্লেট পাঁঠার মাংস নিয়ে মাংসটা এমনই ঝাল আর মুখরোচক যে আর এক প্লেট না নিয়ে পারি না। সঙ্গে লেবুর

আচার। জীবনে এর থেকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ আর কী? ঝালের চোটে উঃ আঃ করতে করতে বেরিয়ে আসি বাইরে। সেখান থেকেই দেখা যায় ছেলেটা এখনো জলে দাপাদাপি। ওকে বকবার কেউ নেই। এত কম বয়েসের এমন স্বাধীন ছেলে আগে দেখি নি কখনো।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে কয়েকটা নৈরাশ্যজনক খবর। শোন্ নদীর ধারে অপূর্ব সুন্দর ডাকবাংলোটিতে থাকবার জায়গা নেই। হোটেলগুলির চেহারা সুবিধের নয়, তাছাড়া হোটেলে থেকে বিলাসিতা করার মতন পয়সা।

ফিরে এসে রেলস্টেশনের বেঞ্চিতে। যে-কোনো দিকের ট্রেন এলেই। কুলির কাছ থেকে জানা গেল, ডাল্টনগঞ্জের দিকে ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেনই সবচেয়ে কাছাকাছি সময়ে। ডাল্টনগঞ্জই বা খারাপ কী? ওখানে পরিতোষ থাকে না? ঠিকানা জানি না অবশ্য, তবে স্থানীয় বাঙালীদের কাছে।

ডাল্টনগঞ্জের মত যোগারূঢ় নামের জায়গাগুলি চাক্ষুষ দেখার আগে কিছু বিস্ময় রেখে দেয়। হয়তো জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে আছে ইওরোপের একটা টুকরো। সার সার ঢালু ছাদওয়ালা বাংলো।

পৌঁছে দেখলাম, সে সব কিছুই না। ধুলোয় ভরা রাস্তা, কুদৃশ্য বাড়ি, বিহারের সমতলভূমির যে-কোনো এলেবেলে শহরের মতন। এইসব শহরের চেয়ে শহরতলি অনেক সুন্দর হয়, যেখানে ভূমি স্পর্শ করে দিগন্ত, একটা অচেনা নামের ছোট নদী, মকাই খেতের পাশে মোষের পিঠে বালক, তন্বী রমণীর মাথায় সোনার মতন উজ্জ্বল পেতলের কলসী।

শহরের মধ্যে টায়ার সারাবার দোকান আর কচৌরি মিঠাই, ডাক্তারখানার শো-কেসে মদের বোতল। একটি ছোট রেডিওর দোকানের মালিককে বাঙালী বলে চিনতে পারা যায়। তিনিও চেনেন পরিতোষকে। পরিতোষের স্ত্রী পুজোর সময় ষোড়শী নাটকে নাম ভূমিকায়। রেডিও দোকানের মালিকই একটা সাইকেল রিক্‌শাকে ডেকে।

স্থানীয় জেলখানা পেরিয়ে এসে সাইকেল রিক্‌শা একটা বাড়ির সামনে। সদর দরজায় মস্তবড় তালা। পাশের বাড়ির অপর সরকারী অফিসার, মাদ্রাজী, জানালেন, পরিতোষ দু'দিন আগে সফরে বেরিয়েছে, স্ত্রীকেও সঙ্গে।

এখন রাত প্রায় সাড়ে আটটা, একটা কোনো থাকার জায়গা না পেলে।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক সরু চোখে আমার আপাদমস্তক। উনি লুঙ্গির ওপর হাওয়াই

শার্ট পরে আছেন, মাথার চুল অবিকল শিশুদের মতন পাশ থেকে সিঁথি কাটা। অপরের কৌতূহলী দৃষ্টি আমার সহ্য হয় না। আমি মাটি থেকে আমার ঝোলাটা। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি কিছু ন-ড-এ মেশানো ইংরেজি শোনার জন্য।

—আর ইউ মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়'জ ইয়াংগার ব্রাদার ?

অপ্রত্যাশিত রকম বিশুদ্ধ উচ্চারণ। ব্যানার্জি না বলে বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, উচ্চশিক্ষিত হলেও দক্ষিণ ভারতীয়রাই সবচেয়ে কম সাহেবীয়ানা অভ্যেস করে।

না, আমি পরিতোষের ছোট ভাই নই। গত রাত্রে আমি ট্রেনে অশেষ মজুমদার। আজ আবার অন্য পরিচয়, ক্ষণতরে লোভ হয়, তবু কোনোক্রমে নিজেকে সংবরণ।

—না, কেন বলুন তো ?

—মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়েব ছোট ভাইয়ের বেড়াতে আসার কথা ছিল। তাই আমাদের কাছে ঘরের চাবি রেখে গেছেন।

—আমি পরিতোষের বন্ধু। এবং আমার আসার কোনো কথা ছিল না।

—বন্ধু ? মানে উনি কি জানেন, আপনি হঠাৎ এসে পড়তে পারেন ?

অধিকাংশ মানুষেরই কোনো পরিচয়পত্র থাকে না। উনি যদি জেরা করেন, আমি পরিতোষের কতদিনের বন্ধু, কতখানি ঘনিষ্ঠতা, কী ভাবে তার প্রমাণ ? হঠাৎ এসেছি খবর না দিয়ে, পরিতোষ গেছে সফরে, সরকারি অফিসাররা তো এরকম প্রায়ই। উনি আমাকে ঘরের চাবিটা দেবেন কিনা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। আজকাল কতরকম তঞ্চক-বঞ্চক।

হঠাৎ আমার মাথায় বিদ্যুতের মতন একটা। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, পরিতোষ কখনো কফিতে চিনি খায় না!

মাদ্রাজী ভদ্রলোক সজোরে হেসে উঠলেন। ঠিক-বুঝতে। উনি হয়তো আমাকে জেরা করতে (চেয়েছিলেন কিংবা চান নি)।

তৎক্ষণাৎ নিজের ঘর থেকে চাবি এনে। নিজেই চাবি ঘুরিয়ে তালা। আলোর সুইচ। তারপর আমার দিকে ফিরেই বললেন, আপনার বন্ধু দু'দিন বাদেই ফিরবেন।

আমার রাত্রে থাকার একটা জায়গার দরকার ছিল। আমি ওঁকে তিনবার ধন্যবাদ।

উনি চলে যেতেই আমি দরজা ভেজিয়ে সোজা ঝপাং করে পরিতোষের

বিছানায়। নিভাঁজ চাদরপাতা এরকম বিছানা দেখলেই আমার। একটা সিগারেট ধরিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম, ইট মাস্ট বী ওয়াণ্ডারফুল টু বী অ্যালাইভ! কেন একথাটা আমি ইংরেজিতে বললাম, আমি নিজেও জানি না? অনেক সময় একা একাও ইংরেজিতে। অকস্মাৎ পাহাড়ের বাঁক পেরিয়ে একটা বন্য নদীর মতন খাসা দৃশ্য দেখেও আমরা বলি, বিউটিফুল! বেশ জোর দিয়ে।

একটু পরেই দরজায় শব্দ ও সামান্য ফাঁক হলো। সেই ভদ্রলোক। একটু আগেই আমি ওর নাম শুনেছি এবং ইতিমধ্যেই ভুলে। শেষটা যেন মনে হয়েছিল নেডুচেনঝিয়ান! এরকম কোনো নাম হয়? কিংবা ভুল শুনেছি। প্রথম নামটা কি যেন? খুব অন্যায় নাম ভুলে যাওয়া।

ভদ্রলোক আমাকে রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করলেন ওঁদের বাড়িতে। আমি ভয়ে শিউরে। ভয়টা আসলে অভদ্রতার। ভদ্রলোক সত্যি অতি ভদ্র, কণ্ঠস্বরে তা বোঝা যায়। কি করে এঁকে প্রত্যাখ্যান।

দক্ষিণ ভারতীয়দের আর সব কিছুই আমি ভালবাসি, সঙ্গীত পর্যন্ত, কিন্তু ওদের রান্না খাওয়ার কথা ভাবলেই আমার গায়ে জ্বর। আগাগোড়া নিরামিষ খাদ্য আমার দু'চক্ষের বিষ। পৃথিবীর সমস্ত নিরামিষ জিনিসের মধ্যে আমি একমাত্র পছন্দ করি বিধবা নারীদের।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমি তো খেয়ে এসেছি।

—খেয়ে এসেছেন? তাতে কি। আর একবার খাবেন, আমাদের সঙ্গে। ভেরি লাইট ফুড। আমার ওয়াইফ বললেন।

—না, সত্যিই আজ আর কিছু খেতে পারবো না। একদম পেট ভরা

—তা হলে আসুন, এক কাপ কফি খাবেন অন্তত।

এর পর আর না বলা যায় না। ওরা ভাবছেন, আমি একলা একলা ঘরের মধ্যে, সেই জন্যই কিছু অন্তত ভদ্রতা না করলে। সহকর্মীর বন্ধু, খানিকটা সৌজন্য তার প্রাপ্য।

উনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি স্নান করতে চাই, গরম জল লাগবে কিনা। তা হলে ওর বাড়ি থেকে।

—না, না, না।

—খুব সহজেই অ্যারেঞ্জ করা যায়। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনি ওয়াস করে তার পর আসুন। ডোন্ট হেজিটেট টু আস্ক ফর এনিথিং—

অনেকের অভ্যেস আছে সন্ধের পর স্নানের।

বিশেষ করে ট্রেন জার্নির পর। আমি অনেকটা গাঁজাখোরের মতন বেশী

স্নান-টান এড়িয়ে। দিনে একবারই যথেষ্ট। বিশেষত আজ সকালেই শোন্ নদীতে সাঁতার কেটে।

এক হাঁড়ি গরম জলে ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে আমি কোনোক্রমে মুখে হাতে। ঘাড়ে। বাকি জলটা গড়িয়ে ফেলে দিলাম। তারপরও পাঁচ সাত মিনিট বাথরুমে চুপ করে দাঁড়িয়ে, স্নান করতে যতটা সময়।

এইসবগুলো সত্যিই মজার ব্যাপার। কেউ কি সত্যি দেখছে আমি বাথরুমের মধ্যে স্নান করছি কি না? তবু আমি স্নানের অভিনয়। অকারণেই পরিতোষের আফটার শেভ লোশান থেকে খানিকটা গালে। বাথরুমে পরিতোষের স্ত্রী শ্রীলেখার ব্যবহার্য কোনো জিনিসই নেই। মেয়েলি গন্ধও না। সিনেমা হলে গিয়ে কতবার আমার মেয়েদের বাথরুমটার ভেতরটা দেখতে ইচ্ছে।

উনি বাইরের দরজার কাছেই। জিজ্ঞেস করলেন, ফিলিং ফ্রেশ? আমি অমায়িক হাস্যে উত্তর।

পাশাপাশি দুটি ছোট একতলা হুবহু এক রকম। কিন্তু পরিতোষের তুলনায় মিঃ নেডুচেনঝিয়ানের (?) বাড়ি কত ঝকঝকে পরিষ্কার। মেঝে তেল চকচকে। মঙ্গোলিয়ান ও আর্যদেব তুলনায় দ্রাবিড়দের পরিচ্ছন্নতাবোধ অনেক বেশী। এ ছাড়াও অবাক হবার মতন একটা জিনিস।

কফি প্রস্তুত। বসবার ঘরে নিচু খাটের ওপর নক্শা-কাটা মাদুর। তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট লাল মখমলের তাকিয়া। পাশে একটি টেবিল। কিন্তু সবচেয়ে যা দেখে আমি প্রথমে খুব অবাক, তা হলো দোলনায় বসা একটি নারী। ঘরের ঠিক মাঝখানেই ঝুলছে দুটি দোলনা। বসবার ঘরে এরকম দোলনা আমরা আশা করি না। বাচ্চাদের জন্য নয়, রীতিমতন বড়দের। পরে মনে পড়লো, মহারাষ্ট্রে কোনো কোনো বাড়িতে এমন দেখেছি। চেয়ার টেবিলের চেয়ে ব্যবস্থাটা খারাপ নয়।

দোলনায় বসেছিলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। ঘাগরা ধরনের লাল শাড়ি, গাঢ় নীল ফুল কাটা পাড়। কাঞ্জিভরম শাড়ির নাম বিজ্ঞাপনে দেখেছি, এইটাই? মহিলার গায়ের রং তেঁতুল বিচির মতন বেগুনি-কালো, সেই রকমই মসৃণ। অত্যন্ত সুশ্রী মুখখানি আরো লাবণ্যময়ী হয়েছে একটি নাকছাবিতে। কতদিন পর একজন নাকছাবি পরা নারীর সঙ্গে কথা বলবো সামনা-সামনি।

আমি বললাম, নমস্কার।

দোলনা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, বসুন!

পরিষ্কার বাংলা। মেয়েরা অনেক চটপট ভাষা শিখতে। ভদ্রলোক বাংলা

একেবারেই। ইস্‌, এঁর নাম নেডুচেনঝিয়ান কিংবা ঐ টাইপের কিছু না হয়ে নাইডু বা রামস্বামী জাতীয় সহজ কিছু হতে পারতো না? কিংবা কোনো ক্রিকেট খেলোয়াড়ের নামে, তা হলে মনে রাখা।

মহিলাটির নাম, স্বামী বললেন পদ্‌মা, উনি নিজে বললেন, পদ্মা। কোথায় পদ্মা নদী, এখন বিদেশে, আর কোথায় দক্ষিণ ভারতে সেই নাম। অবশ্য বাংলা-দেশেও তো কাবেরী নামে। নদীর নামে নামের মেয়েরা স্বভাবতই একটু উচ্ছল। এই নারীটির সারা শরীরে বাজনা।

পদ্মার স্বামী আর আমি দোলনায় বসলাম। টেবিলের ওপর কফি পট আর বীয়ার মগের মতন বড় বড কফির কাপ। কিছু চানাচুর ও সেমুই ভাজা। যা ভেবেছিলাম তাই, সারা বাড়িতে নিরামিষ গন্ধ। নিরামিষ খেয়েও এদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে কি করে? নিরামিষ খেয়েও নারীরা রূপসী হয়। আর্যরা ছিল প্রায় সর্বভুক এবং অতি মাংসাশী, অথচ ভারতের বেশীর ভাগ মানুষই নিরামিষাশী। আসলে সাহেব ও আরবরাই খাঁটি আর্য।

আমরা যেমন বেশীর ভাগ সময় চা, এরা তেমনি কফি। কারণ খুব সাধারণ। যে-কারণে উত্তর ভারতে বেশী অ্যামবাসেডর গাড়ি, দক্ষিণ ভারতে ফিয়াট। কিন্তু উত্তর ভারতের লোকেরা বেশী মাছ খেলেও এরা।

দোলনায় দুলতে দুলতে কফি। এবার কলকাতায় ফিরেই বসবার ঘরে একটা দোলনা, বেশ জোরে জোরে দুলতে লাগলাম, কফি উছলে পড়ছে না। খাটের ওপর বসে আছেন পদ্মা, হাতে চানাচুরের প্লেট। আমি দুলে সেখানে গিয়ে খপ্‌ করে এক মুঠো চানাচুর তুলেই আবার। সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি। ইস্‌, এখানে না এলে এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে।

পদ্মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এখানে কোনো কাজে এসেছেন?

—না, এমনিই। বেড়াতে।

—বেড়াতে? এখানে বেড়াতে?

পদ্মা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। এর মধ্যে আবার হাসির কী আছে রে বাবা!

স্বামীটি বললেন, এখানে কেউ বেড়াতে আসে? কি আছে দেখবার? তবু যদি ম্যাকক্লাস্কিগঞ্জে যেতেন; কিংবা যদি রিজার্ভ ফরেস্ট যেতে চান—

—কেন, জায়গাটা খারাপ?

পদ্মাই আবার বললেন, খুব বাজে। খুব বাজে! আমার বিচ্ছিরি লাগে। অবাঙালী নারীর মুখে বাংলা বেশ মিষ্টি। বিচ্ছিরি শব্দটাও সুন্দর।

আমি হেসে বললাম, কেন এখানে তো কোয়েল নদী আছে।

পদ্মা তাঁর ঠোঁট ওল্টালেন অবজ্ঞায়। এই ভঙ্গিটি দেখতে বেশ চমৎকার লাগে। কিন্তু আমি বেশী বেশী না দেখে। জানি না, ব্যবহারে কোথায় কি ভুল হয়ে। নিজেদের জন্মস্থান থেকে এত দূরে, মাতৃভাষায় কথা বলার একটিও লোক নেই, বিহারে এই ক্ষুদ্র শহরে নেই কোনো উত্তেজনা, ওদের ভালো না লাগবারই তো। পছন্দ মতন খাদ্যও কি। এখানে কি ক্যাপসি কাম পাওয়া যায়? শুধু কোয়েল নদী দিয়ে কি ধুয়ে খাবে?

স্বামীটি, এর নাম আমি রাখলাম স্বামীনাথন, বললেন—সন্ধের পর এখানে কিছুই করার নেই। মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়রা থাকলে তবু একটু আড্ডা হয়। কিন্তু ওঁরা প্রায়ই বাইরে বাইরে।

পদ্মা বললেন, অন্য সময়ে আমরা কি করি জানেন, দু'জনে মিলে তাস খেলি।

সত্যিই এটাকে আনন্দের জীবন বলা যায় না। শুধু চাকরির জন্য দুটি স্বাস্থ্যবান নারী পুরুষ দিন দিন শাকচচ্চড়ি হয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে এঁদের কোনো সন্তান। বাড়িতে নেই কোনো শিশুর শব্দ কিংবা ভাঙা খেলনা।

স্বামীনাথন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী সার্ভিসে আছেন?

—সার্ভিস?

—গভর্নমেণ্ট না পাবলিক এণ্টার প্রাইজে? কিংবা বোধহয় নিজের বিজনেস

এক মুখ হেসে বললাম, বেকার।

স্বামীনাথন বললেন, বাঃ! এর চেয়ে সুখের জীবন আর কী হতে পারে!

কিন্তু শ্রীমতী পদ্মা আমার বেকার থাকার কথাটা তেমন পছন্দ করলেন না। বোধহয় ভাবলেন, বাঙালীরা বড্ড বেশী বেকার থাকে। বাঙালীদের উদ্যম নেই। শুধু রাজনীতি

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন এখনো সার্ভিস নেন নি কেন?

পাছে আমি বিব্রত বোধ করি, তাই স্বামীনাথন তাড়াতাড়ি বললেন, হী মাস্ট বী ইয়াংগার থ্যান মী, এখনো অনেক সময় আছে, যতদিন ফ্রি থাকা যায়

এবার আমি পদ্মার দিকে তাকিয়ে বেশ গুরুত্ব দিয়ে বললাম, আমি একজন রাইটার

—রাইটার? আপনি কি লিখেন!

—পোয়েট্রি

স্বামী স্ত্রী একবার চোখাচোখি। আশাই করেন নি। এরকম নির্লজ্জভাবে। যেন কেউ বলছে আমি বেকার, কিন্তু মাঝে মাঝে চুরি করি।

পদ্মা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি গান করেন ?

তেমনি সহাস্য মুখে আমি, না।

—তবে কবিতা লিখে কি করেন ?

—কাগজে ছাপা হয়। কেউ কেউ পড়ে

—একটা শোনান না।

—বাংলা

—তা হোক। তবু শোনান

ছেলেবেলায় রবীন্দ্রনাথের 'দুঃসময়' কবিতাটা আবৃত্তি করতাম, 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে—' ইত্যাদি লাইন আষ্টেক এখনো মুখস্থ আছে, শুনিয়ে দিলাম। একই কথা।

স্বামীনাথন বললেন, এবারে মনে পড়ছে, আপনার কথা আমি মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি। তার এক বন্ধু পোয়েট্রি লেখে, খুব বোহেমিয়ান!

বুঝলাম, আমি নয় পরিতোষ নিশ্চয়ই শক্তির কথা। প্রতিবাদ না করে, মৃদু মৃদু হাসি মুখে চুপ করে তাকিয়ে। দোলনায় জোরে জোরে দোলা।

এরপর কিছুক্ষণ পরিতোষ আর শ্রীলেখার কথা। আমিও সোৎসাহে। আমি যে ওদের বন্ধু তার নির্ভুল প্রমাণ।

দু'কাপ কফি খাওয়া হয়ে গেছে, এবার ওঠা উচিত। দোলনা থেকে নামতেই পদ্মা বললেন, আপনি তাস খেলতে জানেন ?

আমি অন্তত সাত আট রকম তাসের খেলা, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে নতুন কিছু খেলা আছে কিনা জানি না।

—কী খেলা ?

—ফিস, রামি ?

—জানি।

—খেলবেন ?

—এখন ? অনেক রাত হয়ে গেছে না! এমনই আপনাদের অনেক কষ্ট দিলাম

স্বামীনাথন বললেন, ইফ ইউ ডোন্ট ফিল স্লিপি—আমরা অনেক রাত পর্যন্ত

—আমার আপত্তি নেই

অবিলম্বে নিচু খাটের ওপর তাস খেলায়। ওঁরা ওঁদের রাত্তিরের খাবার দুটি প্লেটে সাজিয়ে পাশে নিয়েই। নিরামিষে এঁটো হয় না।

রামির তাস বিলি হতেই আমি বললাম, রামি খেলা তো স্টেক ছাড়া জমে না!

স্বামী-স্ত্রী ছু'জনেই বললেন, এগজ্যাক্টলি। রোজ আমরা ছু'জনে স্টেকেই খেলি, কিন্তু নিজেদের মধ্যে, এত বাজে লাগে…। আজ আমরা একজন পোয়েটকে পেয়েছি, তাকে হারাবো।

—লেট আস সি

একটুক্ষণের মধ্যেই তাস খেলা বেশ। ওঁরা ছু'জনেই পাকা খেলোয়াড়। মেয়েটিরই নেশা বেশী। গোড়ার দিকে বেশ কয়েকবার পুরো হাত হারলাম! মুশকিল হচ্ছে আমার পুঁজি কম। বেশী টাকা নিয়ে না বসলে বাজির খেলায় পৌরুষ দেখানো যায় না।

খেলতে খেলতে আমার একটা অদ্ভুত অনুভূতি। গতরাত্রে ছিলাম ট্রেনে, অচেনা লোকদের সঙ্গে। আজ আবার অচেনা মানুষের সঙ্গে তাস। আমার ডাল্টনগঞ্জে পরিতোষের কাছে আসার কোনো কথাই। কলকাতা ছেড়ে বেরুবার সময় ক্ষীণ ইচ্ছে ছিল চাইবাসায় সমীরের কাছে। কিন্তু এখানে না এলে এই দম্পতির সঙ্গে।

আমার ঠিক উল্টো দিকেই বসেছে পদ্মা, ডান পাশে স্বামীনাথন। পদ্মার চোখের পল্লবগুলি অনেক দীর্ঘ, হাতের আঙুলগুলি এত কোমল মনে হয়। পা ছুটো মুড়ে বসেছে বলে তার একটি সম্পূর্ণ উরু। কোনো স্বাস্থ্যবতীর মাংসল উরুর সঙ্গে কি পারস্যের ছুরির উপমা দেওয়া যায়? পাখির নীড়ের সঙ্গে যদি চোখের।

হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল অনুরাধার মুখ। একটা ছোট্ট স্টেশনে নেমে মিলিয়ে। বাড়ির লোক ওকে জোর করে কলকাতা থেকে দূরে কোথাও। ওর নীরবতা ও ছুঃখ আমার মধ্যে এমন একটা ছাপ ফেলেছে। যেন আমাকে যেতেই হবে ঐ ছোট্ট শহরটিতে, আবার দেখতে হবে ঐ কিশোরীকে যতক্ষণ না ওর গোপনীয়তা। অনুরাধা, আমি যাবো তোমার কাছে, তুমি আমাকে চিনতে পারবে না, তবুও।

একটু পরেই স্বামীনাথন হারতে লাগলেন। ভুলভাল তাস ফেলে ফেলে। তাঁর স্ত্রীর মৃদু বকুনি। আমি পরপর ছু'বার পদ্মাকে পুরো হাত সমেত হারিয়ে দিতেই সে বেশ উত্তেজিত। সে হারতে ভালবাসে না। তাকে রাগিয়ে দেবার জন্যই আমি প্রাণপণ মনোযোগে। তবু আমিই হারলাম। পরের বারও। পরাজয় উন্মুল করার জন্য আমি তার বুক ও নগ্নকোমরে কয়েকবার চোখ বুলিয়ে

খুশীতে উচ্ছল হয়ে সে আবার দ্রুত তাস বিলি। স্বামীকে বলে, নাও, নাও, তুমি এত স্লো।

এক মিনিট পরেই স্বামীনাথনের হাত থেকে তাসগুলি ঝরঝর করে। বসে থাকা অবস্থাতেই তার নাক ডাকে। তারপর মাথা হেলে পড়ে পাশে।

আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পদ্মার দিকে। পদ্মার চোখ। হাত। কাঁধের ডৌল। খসে পড়া আঁচল। পারস্যের ছুরি।

পদ্মা বললো, একি, আর খেলা হবে না?

আমি হাতের তাসগুলো উল্টে দিয়ে বললাম, আপনার স্বামী তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।

পদ্মা সেদিকে তাকিয়ে একটা বিরক্তির ভঙ্গি। পরক্ষণেই ঠোঁটে দুষ্টু হাসি। শাড়ির আঁচলটা পাকিয়ে সরু করে স্বামীনাথনের নাকের মধ্যে। আমার চোখে চোখ, যেন আমরা একই ষড়যন্ত্রের অংশীদার।

নাকে খোঁচা খেয়ে স্বামীনাথন ধড়মড় করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মাতৃভাষায় কি যেন, মনে হয় যেন বিরক্তিসূচকই। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মাপ চাইবার ভঙ্গিতে হিন্দীতে বললেন, সরি, ভেরি সরি, নিদ আ গয়া।

ঘুমের ঘোরে উনি ভুলে গেছেন আমি হিন্দীভাষী নই। বিহারে থাকার জন্য আচমকা ঐ ভাষাতেই।

আমি বললাম, আপনার ঘুম এসে গেছে, এখন খেলা বন্ধ থাক।

পদ্মা আদুরে অনুনাসিক গলায় বললো, না, রাত তো বেশি হয় নি, এর মধ্যেই ঘুম।

স্বামীনাথন চোখ কচলে বললেন, ঠিক আছে, আর একটু যদি খেলতে চাও।

হঠাৎ ঘুম থেকে উঠলে মানুষকে একটু দুর্বল। মানুষের মুখে বুদ্ধির ছাপটার নামই তো ব্যক্তিত্ব, ঘুমের সময় বুদ্ধি ছুটি নেয়।

স্বামীনাথন এক ফাঁকে উঠে বাথরুমে। পদ্মা আবার তাস বিলি করছে, আমি দেখছি ওর আঙুল, রক্তাভ নখে স্বাস্থ্যের আভা। নারীটি বেশ ছটফটে, এই মফস্বলের জীবন ওর জন্য নয়। যেমন—।

—আপনি সাউথ ইণ্ডিয়ায় কোথাও গেছেন?

পদ্মার এই প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠি, আমি তখন অন্য কথা। আমি এখানে ছিলাম না কয়েক মুহূর্তের জন্য। মুখ তুলে বললাম, হ্যাঁ, কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত।

—আপনি বুঝি খুব

—হ্যাঁ

—বেশ মজার তো ! ছেলেরা পারে, মেয়েরা পারে না।

—মেয়েরা আবার এমন অনেক কিছু পারে, যা ছেলেরা—

—কী রকম ?

উত্তর দেওয়া হলো না। স্বামীনাথন ফিরে এলেন। আমার একটা লঘু ইয়ার্কির কথা মনে এসেছিল, যা কোনো স্বামীর সামনে বলা যায় না। বললে কোনো দোষ নেই, কিন্তু আড়ালেই।

তাস তুলে নিলাম। আরও কিছুক্ষণ খেলা। কিন্তু আর ঠিক জমছে না। স্বামীনাথন বড় বড় হাই। বেচারাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। হারছেও খুব। স্বামীর ঘুম তাড়াবার জন্য একবার পদ্মা রেকর্ড প্লেয়ারে একটা গান চালিয়ে দিল, এম এস শুভলক্ষ্মী। তাতেও সুবিধে হলো না, যখন কারুকে ঘুমে পায়।

মাঝে মাঝে পদ্মা মৃদু ভৎর্সনা করছে স্বামীকে। তখন আমি নীরবে। চোখ চলে যায় পদ্মার দিকে ! ওর কোমর ও পেটের অনেকখানি নগ্ন। কোনো নারীর পোশাক যদি হ্রস্ব হয়, সেদিকে তাকানো কি অসমীচীন ? তাহলে পোশাক হ্রস্ব কেন ? আমি ঠিক বুঝতে পারি না। সুন্দরী বা স্বাস্থ্যবতী নারীদের কোমর আমার কাছে একটি অত্যন্ত প্রিয়দৃশ্য, আমি স্বীকার করছি, বারবার সেই দিকে চোখ।

স্বামীনাথন আর একবার ঢুলে পড়তেই আমি নিজেই বললাম, আর খেলতে ইচ্ছে করছে না, আমারও এবার।

স্বামীনাথন লজ্জিত ও কৃতজ্ঞভাবে আমার দিকে। আমি উঠে দাঁড়ালাম ! ওরা দু'জনেও।

পদ্মা বললো, আপনারও ঘুম পেয়েছে ?

—হ্যাঁ, মানে, খেলা আর জমছে না।

—আপনি বললেন না তো, মেয়েরা কি এমন পারে যা ছেলেরা পারে না ?

আমি এমনভাবে হাসলাম, যার তেষট্টি রকমের মানে হতে পারে। এমন কি চৌষট্টি রকমও। ওকে একটু ধাঁধায় রাখলে ক্ষতি কি।

বিদায় নেবার জন্য সময় না নিয়ে আমি দ্রুত দরজার কাছে। স্বামীনাথন জানালেন, কাল সকালে আমার কফি। রাত্রে কিছু দরকার হলে যে-কোনো সময়।

দরজার ওপরে একটা হাত তুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পদ্মা বললো, আমার মোটেই এত তাড়াতাড়ি ঘুমোতে ইচ্ছে করে না—

এ ব্যাপারে মীমাংসার ভার ওর স্বামীর ওপরে দিয়েই আমি বাইরে। আসলে

আমার পেট চুঁই-চুঁই করছে খিদেতে। ওদের বাড়ির নিরামিষ খাবার প্রত্যাখ্যান করে ভেবেছিলাম, রাতটা না খেয়েই। কিন্তু এখন দাউদাউ আগুন।

রাত দশটা বাজে। এখনো কোনো কোনো পাঞ্জাবীর হোটেল। দরজায় তালা দিয়ে রাস্তায়। বেশী দূর যেতে হলো না, পেট্রোল পাম্পটার পাশেই বৃদ্ধ সর্দারজী তাঁর দোকান খুলে বসে ছিলেন যেন শুধু আমারই প্রতীক্ষায়। ভাত নেই, কিন্তু রুটি। তরকা। আলুমটর, আলু-পনীর। না, ফিশ কারি, মাটন কারি, ফাউল কারি—সব শেষ। এখানেও নিরামিষ খেতে হবে? আজ রাতে আমার নিরামিষ ভবিতব্য? আণ্ডা হ্যায় তো? ঠিক হ্যায়, ভাজো। রুটির সঙ্গে তিন তিনটে ডিমভাজা। খাওয়ার পর শরীরে বেশ একটা।

ফেরা পথে নিস্তব্ধ রাস্তায় শুধু আমার জুতোর শব্দ। শরীরে আরাম দিচ্ছে মদালসা বাতাস। কোথাও একটা রাতপাখির ডাক। হঠাৎ ওপরে চোখ যায়। বিশাল উত্থান। এর নিচে আমি কী অসম্ভব ছোট ও একা। নিজের ক্ষুদ্রত্ব বোধে আমি যেন আরও চুপসে যাই। কিংবা যেন আমি আর নেই, অদৃশ্য হয়ে। রাস্তায় কেউ নেই, শূন্য, নির্জন, তার ওপরে মাতৃস্নেহের মতন জ্যোৎস্না। প্রথম যে চাঁদে পা দিয়েছিল তার নাম নীল আর্মস্ট্রং। আমার নামে নাম। মৃত্যুর আগে আমি বলে যাবো, আমিও সুন্দরকে।

খুব মন্থরভাবে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় বাড়ির কাছে। স্বামীনাথনদের দিকে তাকালাম। দরজা বন্ধ, আলো নিভে গেছে। এর মধ্যেই কি? পদ্মা বলেছিল। এখন আবার গিয়ে ডাকা যায়? কেনই বা ডাকবো? 'কী কথা তাহার সাথে, তার সাথে?'

আমার, অর্থাৎ পরিতোষের ঘরের দরজার কাছে একটা কুকুর। আগে তো ছিল না। চেহারাটা বেশ ভয়াবহ। এদিক ওদিক একটা ইঁটের টুকরোর জন্য। সেটা ছুঁড়ে মারতেই কুকুরটা প্রচণ্ড গলায় ঘাউঘাউ করে। বিশ্রীভাবে ভেঙে দিল রাত্রির নিস্তব্ধতা। এই সঙ্গে কি স্বামীনাথনরা জেগে উঠবে? কুকুরটাকে তাগাবার জন্য আমি আরও দু'বার পাথর ছুঁড়ে। ওটা আসলে ভীতু, তাই অত গলার জোর, ছুটে পালালো।

ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালিয়ে আরাম করে একটা সিগারেট। আমার চোখে ঘুমের চিহ্নমাত্র নেই। এখনো সামনে দীর্ঘ রাত। পরিতোষ কল্পনাও করতে পারবে না, এই সময় আমি তার বিছানায়। অনেক দিন আগে পরিতোষের কাছে যখন এসেছিলাম, তখন ওর ছোট খাট ছিল, সেবার আমাদের সঙ্গে

দীপকও, কত কষ্ট করে যে তিনজন সেই খাটে। এখন এত বড় বিছানায় তিন চার জন অনায়াসেই। বড় বিছানা বলেই আমার খুব একা একা লাগতে।

আমি জীবনে কী চাই! জীবন আমার কাছ থেকে কী? জানি না, জানি না, জানি না! কতগুলো বছর কেটে গেল, কিছুই জানি না। জানার কী খুব দরকার? আজ সকাল পর্যন্ত আমি কী চাই, তা জানতাম। আমি চেয়েছিলাম অনুরাধা নাম্নী একটি মেয়ের দুঃখের। কে অনুরাধা? ট্রেনে কিছুক্ষণের জন্য। অসম্ভব গভীর মনে হয়েছিল তার দুঃখ। ঐ মেয়েটির বদলে যদি একটি ছেলের দুঃখ? তা হলেও? সত্যি জানি না, জানি না, জানি না। জানার কি খুব?

পরিতোষের ঘরে বইটই বিশেষ নেই। রাত্রে একটা বইকে অন্তত সঙ্গী করে না শুলে। র‍্যাকের ওপরে দুটো সরু মোটা টাইম টেব্‌ল, কয়েকটা সিনেমার পত্রিকা। নিচের তাকে গীতবিতান, দুটি বাংলা উপন্যাস (পড়া), তিনখানা আমারই বন্ধুদের লেখা কবিতার বই, একটি রাশিয়ান উপন্যাসের অনুবাদ, কয়েকখানা ইংরেজী পেপারব্যাক, একটা ডায়েরি, সহজ সাঁওতালি ভাষা শিক্ষা। এর মধ্যে কোনো বইটাই ঠিক আকৃষ্ট। অথচ একটা বই চাই-ই। আমি চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে যে কোনো একটা।

গীতবিতানটিই উঠে এলো। গীতবিতান পড়তে পড়তে ঘুমের চর্চা! তবু পাতা উল্টে উল্টে। বইয়ের মাঝখানে গানের চেয়েও আকর্ষণীয় অন্য কিছু। টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া কাগজ। মনে হয় চিঠি। এত ছোট টুকরো করা হয়েছে মনে হয় হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার জন্যই। তবু যত্ন করে রাখা কেন বইয়ের ভাঁজে? চিঠিটা যে ছিঁড়েছে সে পরে নিশ্চয়ই মত বদলেছে। ছেঁড়া চিঠি বলেই মনে হয় অনেক কিছু গোপন। আমি টুকরোগুলো সাজাবার চেষ্টা করি। আমি ভুল···সেদিন বিকেলে···জানি কেউ···ভয় নেই···তোমার মু···ভারি তো এক··· আমার···ছো···বনের কিছুই···সেও তো দু···বর্ধমানে···তোমার বু···নেক আশা···

না, অসম্ভব, এ টুকরোগুলো মিলিয়ে পাঠ উদ্ধার। জেলখানার কোনো কয়েদীকে যদি এ কাজ দেওয়া যায় তার বেশ ভালোই সময় কেটে যাওয়ার। আমার আর ধৈর্যে। চিঠিটা কি শ্রীলেখার? সেগুলি গীতবিতানের মধ্যেই রেখে দিয়ে আর একটা বই। ইংরেজি পেপারব্যাক, মলাটে পুরোপুরি খোলামেলা মেয়ে, যারা রেল স্টেশনের বুক স্টল আলো করে থাকে। এটাই আপাতত।

মাঝে মাঝে খুটখাট শব্দ। ইঁদুর আছে নাকি! খাটের নিচে উঁকি মেরেও কিছু। হয়তো মূষিকরূপী চপল ইন্দ্রিয়। কী ভীষণ একা লাগছে। হোটেলের

ঘরে থাকলে একটা। আমার বইতে চোখ। মন্দ না, মেয়েটির নাম স্মৃতি, সে কারুকে ভালোবাসতে পারে না—

বাইরে কিসের যেন ছপছপ শব্দ। কেউ যেন জল ছেটাচ্ছে। বৃষ্টি নাকি? না তো, মাঝে মাঝে হাত দিয়ে জল ছেটানোর মতন, আমার ঘরটার ঠিক পাশেই। আমি পায়ে পায়ে বাইরে চলে এলাম, শব্দটা আসছে বাড়ির পেছন দিক থেকে। সেখানে একটা বাগান, ছোটখাট হলেও, অনেক ফুলগাছ।

সেই দিকে এসে অদ্ভুত দৃশ্য। জ্যোৎস্না যামিনী, সেই জ্যোৎস্নার বাগানে এক নারী, তার কাঁধে একটা জলভরা কলসী। আপন মনে ঘুরে ঘুরে জল ছেটাচ্ছে। প্রথমে গাটা ছমছম। অপ্রাকৃত মনে হয়। মানুষ, না অলীক? তবে ভয়েরও নেশা নেশা ভাব। আরও বেশী ভয় পেতে ইচ্ছে। আমি আরও একটু এগিয়ে গিয়ে অনুচ্চ স্বরে। কে?

নারীটির ভ্রূক্ষেপ নেই। গাছে গাছে জল-ছড়া দিতে দিতে। একবার সে আমার দিকে মুখ। হাসলো। কালো রঙের মুখে অত্যন্ত ফর্সা হাসি। পদ্মা।

—এ কি?

—আপনি ঘুমোন নি?

—না, শব্দ শুনে উঠে এলাম। কী করছেন?

—বলেছি তো আমার তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না।

—কী করছেন এখানে?

—গাছে জল দিচ্ছি?

—এত রাত্রে কেউ গাছে জল দেয়?

—দেয় না বুঝি?

—কখনো দেখি নি।

—আমি দিই। রোজ রাত্রে। তাই তো ফুলগুলো এমন।

—আপনার ভয় করে না?

পদ্মা উত্তর না দিয়ে কুলকুল করে হাসলো। আবার জল দিতে দিতে অন্য দিকে। আমি একদৃষ্টে। বাগানে জল দেবার জন্য ঝারি পাওয়া যায়, তার বদলে ওর কাঁখে কলসী। ঠিক কোনো গ্রাম্য মেয়ের মতন। ওর কোমরের গড়নটা কি অপূর্ব। ঠিক পাথর কেটে কোনারকের মূর্তিগুলি যেমন। আমি বড় কোমর-লোভী, দু'চোখ ভরে ওর কোমর। ঘাগরার ওপরে ব্লাউজ, উড়নিটা রেখে এসেছে।

জল ছড়াতে ছড়াতে ও আমার কাছেই। আমি দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে অঞ্জলিবদ্ধ করে বললাম, আমাকে একটু জল দেবে! আমার খুব তেষ্টা লেগেছে।

ও হেসে কি যেন উত্তর। মনে হলো, না।

আমি বললাম, একটু জল দেবে না? তুমি বুঝি শুধু গাছকেই জল দাও, মানুষকে দাও না?

ও এবার কলসীটা উপুড় করে দেখিয়ে বললো, নেই।

—আর নেই? আমার যে তেষ্টা পেয়েছে?

—খুব?

—হ্যাঁ।

আমাকে বিস্মিত হবার সুযোগ না দিয়ে ও বললো, এই নাও!

ততক্ষণে ও ব্লাউজের দুটো বোতাম খুলে ফেলেছে, বন্দী একটা বলের মতন বেরিয়ে এসেছে ওর স্তন।

আরও একটু কাছে এগিয়ে এসে ও খুব স্বাভাবিকভাবে বললো, এই নাও।

আমি সেই মুহূর্তে একটি শিশু। প্রথমে জিভ ছোঁয়ালাম ওর স্তনবৃন্তে। কী গরম। তারপর সম্পূর্ণ মুখটা চেপে। ও আমার মাথায় হাত। আমার শরীর কাঁপছে। সেই শক্ত অথচ কোমল, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণস্তনে আমার মুখ ও চোখ। ততক্ষণে শিশু থেকে পুরুষ, আমি দু'হাতে ওর কোমর। যেন ওকে কতদিন থেকে চিনি, অথচ আজই প্রথম শরীরের চেনা।

নিজেকে বিযুক্ত করে একবার ওকে দেখা। বৃষ্টির মতন জ্যোৎস্না ঝরে ঝরে পড়ছে ওর মাথায়। ওর সামনে পেছনে, দু'পাশে গুচ্ছ গুচ্ছ গোলাপ, ও দাঁড়িয়ে আছে ঋজু হয়ে, একটি স্তন শুধু অনাবৃত।

ও হাত বাড়িয়ে বললো, এসো। আমি ওর ঠোঁটের কাছে ঠোঁট নিতেই ও মুখটা সরিয়ে। আমার মাথাটাও জোর করে নিচের দিকে। ফের ওর বুকে। যেন আমি ওকে তৃষ্ণার কথা বলেছি বলে ও তৃষ্ণা মেটাতে চায়। কিন্তু পুরুষ-মানুষের তৃষ্ণা। আমি হাঁটু গেড়ে বসে বসে ওর দুই উরু জড়িয়ে ধরে ওর কোমরে এক লক্ষ চুম্বন। কিংবা এক লক্ষের থেকে একটা দুটো কম হতে পারে।

ও বললো, এখানে নয় আর। এসো।

দৌড়ে গেল আমারই ঘরের দিকে। আমিও পিছু পিছু। ঘর পেরিয়ে বাথরুমে। দাঁড়াও আসছি। আমি শুনলাম না। আমিও ভেতরে। বাথরুমের দরজার পাশে ও আমার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এমন চুম্বন আমি জীবনে আগে কখনো। আমি উর্বশীর ঠোঁট থেকে অমৃত নিচ্ছি। একবার দুবার তিনবার, আরো দাও, আরো দাও·

খুট খুট খুট খুট শব্দ। হাত থেকে বইটা মাটিতে। আলো জ্বালা, দরজা খোলা। আমি কোথাও যাই নি? পদ্মা কোথায়? সে যে এখানেই এই মাত্র ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তবে কি? কিন্তু আমার ঠোঁটে যে এখনো চুম্বনের। শরীরে সেই উষ্ণতা। তা হলে? আবার সেই খুট খুট খুট খুট। কিসের শব্দ? মূষিকরূপী ইন্দ্রিয়? কপালে ঘাম জমেছে। স্বপ্ন এত তীব্র হয়। আমি কি জল ছড়ানোর শব্দ শুনি নি।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বাইরে। ঘুরে পেছন দিকটায়। সত্যিই একটা বাগানের মতন আছে। বেশ কিছু গোলাপ গাছ। আমি তো এদিকটায় আগে আসি নি, বাগান দেখি নি, তাহলে কি করে স্বপ্নে? বাগানের মধ্যে ঢুকে আমি নিচু হয়ে মাটি পরীক্ষা করতে লাগলাম। মাটি ভিজে ভিজে। গোলাপগুলির পাপড়িতে ও পাতায় ফোঁটা-ফোঁটা জল। সত্যিই জল ছড়িয়েছে একটু আগে মনে হয়। তাহলে কোথায় সেই এক বুক খোলা নারী, যে এখানে দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে স্নান।

স্বামীনাথনদের বাড়ির দিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোনো জীবনের চিহ্ন নেই। একই সঙ্গে আমার লজ্জা ও দুঃখ। ব্যাপারটা সত্যি হলে আমি লজ্জিত বোধ করতাম। সত্যি নয় বলেই বিষম দুঃখ, বিষম দুঃখ।

ফিরে এলাম ঘরে। এখানেও কোনো চিহ্ন নেই। দরজা খোলাই ছিল যদিও। বাথরুমের মধ্যে। এখানেও কেউ। তখন আমি সেই বাথরুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে এক কাল্পনিক নারীকে তিনবার প্রগাঢ় চুম্বন। ওষ্ঠ থেকে অমিয়। তার উরু চেপে ধরে পায়ের কাছে। স্বপ্নের চেয়েও এই জেগে থাকা কাল্পনিক প্রণয়লীলা কম তীব্র হয় না। এর পরেও বিরাট অতৃপ্তি নিয়ে আমি ফিরে আসি বিছানায়। তারপর পাজামার দড়ি খুলে

পরদিন খুব ভোরেই আমার ঘুম। বিছানায় উঠে বসেই একটা গুরুতর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হয় আমাকে। আজ সারাদিন কীভাবে? পরিতোষ দু'তিন দিনের মধ্যে ফিরবে না। শ্রীলেখাকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে যখন। এই দু'তিন দিন আমি? এখানে থেকে যাওয়া যায় অবশ্য, কোনো অসুবিধে নেই, পরিতোষের ভাঁড়ারে চাল ডাল আছে, আমি নিজেই খিচুড়ি ফুটিয়ে। কিংবা কাছেই পাঞ্জাবী হোটেল। কিন্তু কী করবো একা একা? অথচ একা থাকতেই তো আসা, নইলে কলকাতা ছেড়ে। যেখানে হাজার পরিচিত মানুষ।

কালকের স্বপ্নটাই যত গণ্ডগোল। এরপর পদ্মার কাছে মুখ দেখাতে। সামান্য পরিচয়, তাতেই এমন অবৈধ। দুপুরে স্বামীনাথন অফিসে যাবে। তখন কি পদ্মা ঘুমোয়। সে সময় তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। হতে পারে না? যদি হয়? অনেক সময় অসম্ভবও তো। ওর হয়তো কোনো অতৃপ্তি আছে, যেরকম ছটফটে ভাব—। আসলে তা-ও নয়। যেটা ওর সারল্য, যেটা ওর পবিত্র মনের চঞ্চলতা, সেটাকেই আমি অতৃপ্তি ভেবে।

হঠাৎ নিজেকে আমার একটা লম্পটের মতন। সকালবেলা উঠেই এক নিরীহ দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোকের স্ত্রী সম্পর্কে। যেন কোনো মহিলা অপরের সঙ্গে একটু হেসে কথা বললেই ব্যভিচারে রাজি হবে। ইডিয়েট! আমি নিজের গালে ঠাস করে এক চড় কশালাম। তবু মনের মধ্যে একটু ছুঁকছুঁকে ভাব। তখন নিজেকে আরও শাস্তি দেবার জন্য সকালবেলা সিগারেট খাবোই না এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে। এবং আরও ঠিক করলাম স্বামীনাথন পদ্মার সঙ্গে দেখা না করেই।

পরিতোষরা গেছে ছিপাদহের দিকে। আমি ওদের খোঁজে অনায়াসেই। এদিককার পথঘাট আমার খুব অচেনা নয়। হিটারে গরমজল চাপিয়ে ততক্ষণে ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে। এত ভোরে বহুদিন দাড়ি কামাই নি।

সদর দরজাটায় তালা লাগিয়ে দাঁড়ালাম। মাত্র সাড়ে পাঁচটা। স্বামীনাথনরা এখনো। একটা খামের মধ্যে চাবিটা ভরে, সেই খামেরই গায়ে কয়েক লাইন লিখে সেটা ওদের লেটার বক্সে। যাক, নিশ্চিন্ত। এবার বড় রাস্তায়।

মনের মধ্যে একটা কাপুরুষ-কাপুরুষ ভাব। যেন আমি পালিয়ে, হেরে। কোথায় পালাচ্ছি? আত্মসংযমীকে বীরপুরুষ বলা উচিত না? কেউ তো ব্যাপারটা জানলো না। তা হলে হয়তো কিছু প্রশংসা। তার বদলে, মনে মনে বলছি, শালা, ভীতু কোথাকার—পদ্মা মেয়েটার ছলাকলা দেখেও।

বাস ছাড়তে এখনো দেরি আছে। একটা ট্রাক দাঁড় করিয়ে। যাবে বেতলায়, পথেই ছিপাদহ। দু'টাকায় রফা। আমি উঠে ড্রাইভারের পাশে।

ট্রাকটা বহুদূর থেকে আসছে, সারারাত ধ'রে। ড্রাইভারের চোখদুটো লাল। গলায় একটা মাফলার। তার পাশে বসে আছে ক্লীনার, একটা অসম্ভব রোগা ছেলে, দেখলে কিছুতেই ঠিক বয়েসটা। ক্লীনার শব্দটাই কি রকম রোগা-রোগা।

পেছনে দশ-বারো জন নারী-পুরুষ মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে বসেই ঢুলছে। ড্রাইভারের পেছনে একটা চৌকো ফুটো, সেখান দিয়ে আমি মাঝে মাঝে ওদের দিকে। দৃশ্যটা কি রকম যেন করুণ করুণ, ওরা সারা রাত্রি এইভাবে। ড্রাইভারের মুখখানা এমনই রুক্ষ, যেন মনে হয় দস্যুদলের সর্দার।

আর একটা অদ্ভুত জিনিস। অনেকগুলো মাছি ভনভন ভনভন। অসম্ভব দ্রুত চলছে ট্রাকটা, তবু মাছি। ড্রাইভার মাঝে মাঝে স্টিয়ারিং-এর ওপর থেকে হাত ছেড়ে, মুখের সামনের মাছিগুলিকে। ভয়-ভয় করে। যে-কোনো সময় অ্যাকসিডেণ্ট। এত মাছি কেন? তাড়ি-টাড়ি খেয়েছে নাকি? সেই গন্ধে মাছি? তা'হলে তো আরও সাঙ্ঘাতিক।

ক্লীনার ছেলেটাও ঘুম ঘুম। মাঝে মাঝে আমার কাঁধের ওপর। ছেলেটার কষে লালা। ক্রিমির দোষ আছে নিশ্চিত। আমি হাত দিয়ে ওকে সরিয়ে।

সবে আলো ফুটছে। দু'পাশে হালকা জঙ্গল। ল্যাজ গুটিয়ে একটা শিয়াল। বাঁ পাশে শিয়াল দেখা কিসের যেন লক্ষণ? শুভ না অশুভ? আমি দূরে চলে যাচ্ছি ক্রমশ। পদ্মাকে আর জীবনে কখনো হয়তো। কী সুন্দর কোমর! বাঁধিয়ে রাখার মতন। ঐ সৌন্দর্য দূরেই থাক। স্পর্শের বদলে চোখে।

একটা ছোট নদীর ওপর সরু ব্রীজ। ট্রাকের গতি ক্রমে কমে। ভোরের হালকা আলোয় ক্ষীণ নদীটি অপরূপ। এইসব অচেনা পাহাড়ী নদী দেখলেই আমার মনে হয়. এরা বড্ড একা। দিনের পর দিন চুপচাপ কাটিয়ে যাচ্ছে মাঠের মধ্যে। কেউ কি কখনো এখানে গাগরীতে জল ভরতে? দাপাদাপি করে না শিশুরা। বালির ওপর দিয়ে তিরতিরে জলধারা

নদীটি অবশ্য তখন একা ছিল না। ব্রীজের পাশে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। হাত উঁচু ক'রে। ট্রাকটা বেশ জোরে ব্রেকের শব্দ। লোকটি কাছে এগিয়ে এসে আমার দিকে সন্দেহজনক চোখে। তারপর দুর্বোধ্য হিন্দীতে ড্রাইভারকে কি যেন। ড্রাইভারও উত্তরে সেই রকম। তারপর লোকটি একতাড়া নোট। ড্রাইভার সেগুলো না গুণেই জেবের মধ্যে ভরে আমাকে বললো, একটু উঠুন তো বাবুজী।

উঠে দাঁড়ালাম। সিটের গদি সরাতেই ভেতরে একটা বাক্সের মতন। তাতে কয়েকটা পুঁটলি। ড্রাইভার দুটো পুঁটলি তুলে রাস্তার লোকটার হাতে। সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক মাছি সেই পুঁটলি দুটো অনুসরণ করে।

মনের মধ্যে একটা খটকা। কি এমন মাছি-ভনভনে বস্তু, যার বিনিময়ে অতগুলো টাকা? আমার কৌতূহলী চোখ একবার ড্রাইভারের দিকে, একবার সেই লোকটার।

আরও দু'একটা বাক্য বিনিময়ের পর ট্রাক আবার। এখনো কয়েকটা মাছি। কী যেন আমার মনে পড়বার কথা। কেউ একবার বলেছিল, ট্রাকে যদি মাছি থাকে।

উল্টো দিক থেকে একটা সরকারী জীপ। ট্রাক ড্রাইভার আমার দিকে একবার আড়চোখে। সেই দৃষ্টিতে অপরাধ। তৎক্ষণাৎ আমার মাথার মধ্যে চিড়িক করে। আফিং। নিশ্চিত আফিং। ধানবাদে সেই যে একবার। চৌধুরীদা ছিলেন একসাইজের লোক।

ট্রাকটা জীপটাকে পথ ছাড়লো না। নিজেই জোরে বেরিয়ে।

আমি আমার কাঁধ থেকে ক্লীনারের মাথাটা ঠেলে তুলে বিরক্তির সঙ্গে বললাম, এ লোকটাও আফিং খেয়েছে নাকি?

ড্রাইভার সচকিতভাবে জিজ্ঞেস করলো, কেয়া?

—মালুম হোতা হ্যায় কি ইয়ে ভি আফিং খায়া?

ক্লীনারটা চোখ খুলে মিটিমিটি হাসছে। বোধহয় আমার হিন্দী বলার কসরৎ দেখেই। আর একটু কৌতুকের জন্য আমি বললাম, আফিংকা কারবার মে কিৎনা নাফা হোতা হ্যায়?

ড্রাইভারের মুখটা সম্পূর্ণ ঘুরলো। রক্তচক্ষু। লোকটির কোনো কৌতুকবোধ! কর্কশ গলায় বললো, আফিং কা কেয়া বাৎ হ্যায়!

—ও চীজ কেয়া? আফিং নেহি?

—উও তো তামাক হ্যায়।

—ভোরবেলা রাস্তায় খাড়া হোকে, ইৎনা রুপিয়া দেকে আদমি লোক তামাক খরিদ করতা হ্যায়? তব ইৎনা মচ্ছর কাঁহে?

—মচ্ছর?

মচ্ছর মানে মশা না মাছি? বোধহয় মশা-ই। তা হলে মাছির হিন্দী কি? যেমন বোলতার হিন্দী জানি না। এই নিয়ে তারাপদর রসিকতা, আপলোক বোলতা কো বোলতা নেহি বোলতা হ্যায় তো কেয়া বোলতা হ্যায়?

সেই রসিকতাটা ওদের শোনাবো শোনাবো, তখন ক্লীনারটি হঠাৎ রেগে-মেগে এক চিৎকার, এই জন্যই বলছিলাম, বাঙালী বাবুদের কক্ষনো তুলতে নেই।

ড্রাইভারটি তাকে জানালো, সুরৎ দেখে আগে বুঝি নি যে এ বাঙালী।

সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক। উতার যাইয়ে।

—অ্যাঁ?

—উতার যাইয়ে।

বলে কি এরা? এই মাঠের মধ্যে নেমে যাবো? এরা আফিং চোরা চালান করে, তাতে আমার কি? আমি কি কোনো আপত্তি? শুধু একটু রসিকতার জন্য।

ড্রাইভারটির চোখ দেখে রীতিমতন ভয়ে গা ছমছম্। গুটিগুটি নেমে পড়তেই। ক্লীনারটি আমার হাত চেপে ধরে বললো, রুপিয়া?

কোনো তর্কের মধ্যে না যাওয়াই। দু' টাকাই ওদের। এবং বললাম, নমস্তে। বাকি সব টাকাও যে কেড়ে নেয় নি, সে তো ওদের দয়া। শুধু মাঝরাস্তায় এমনভাবে ফেলে।

একবার ভেবেছিলাম ট্রাকের নম্বরটা। পকেট থেকে কলম বার করেও মতবদল। পুলিসকে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। পুলিসকে না জানিয়ে কেউ কক্ষনো চোরা-কারবার করে নাকি! মাত্র দু'টাকা অতিরিক্ত লাভের জন্য যে আমাকেও এরা ট্রাকে জায়গা। অতিরিক্ত দুঃসাহসী না হলে।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সকালের প্রথম সিগারেট। ইচ্ছে করলে এখনো পরিতোষের বিছানায়। শুধু শুধু একটা স্বপ্নের জন্য।

কাছাকাছি বাড়িঘর কিছু নেই। বিরাট ফরাসের মতো মাঠ। পরবর্তী কোনো ট্রাক বা বাসের জন্য কতক্ষণ? তার চেয়ে বরং হাঁটতে হাঁটতেই। ছিপাদহ আর কতদূর?

আধঘণ্টা মতন হাঁটার পর দূরে একটা কালো গাড়ি। প্রায় মাঝ রাস্তাতেই হাত উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গ্রাহ্য করলো না গাড়িটা, একরাশ ধুলো উড়িয়ে। শেষ মুহূর্তে আমি সরে না দাঁড়ালে হয়তো চাপা দিয়েই। আমার চেহারাটা কি যথেষ্ট বিপন্ন এবং বিশ্বাসযোগ্য নয়?

আবার হেঁটে হেঁটে এক-দিগন্ত মাঠ পার হবার পর দ্বিতীয় দিগন্তে কিছু ঘরবাড়ি। খাপরার চাল। ছোট একটি গ্রাম। যদি ওখানে চা। স্বামীনাথন কফি খাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, চমৎকার মানুষ। ওরা দুজনেই চমৎকার। শুধু আমারই দুর্ভাগ্য।

একটি ঘরের দাওয়ায় একজন বৃদ্ধ। মাথার চুলগুলি এত সাদা যে মনে হয় ওর বয়েস অন্তত দু'শো বছরের কম নয়। প্রথমে তাকে আমি কপালে হাত ছুঁইয়ে নমস্কার। তার মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। ঘরের দেয়ালে পরিবার পরিকল্পনার সরকারী বিজ্ঞাপন।

জিজ্ঞেস করলাম, কাছাকাছি চায়ের দোকান আছে?

বৃদ্ধটি নির্বিকার। নিরুত্তর।

দু'তিনবার প্রশ্ন করে একই। তখন জানতে চাইলাম, ছিপাদহ কতদূর।

বুড়োটা নিশ্চয়ই কালা। কিংবা কোনো উত্তর দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। তুচ্ছাই, এত বুড়ো-ফুড়ো দিয়ে কোনো কাজ হয় না। বাড়িতে কি আর কেউ নেই? উঁকিঝুঁকি দিয়েও আর কারুকে।

খানিকটা দূরে আর একটা বাড়ি। শালিক পাখির মতন ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে দুটি শিশু। একজন মাঝবয়সী লোক পেঁয়াজের ক্ষেতে কোদাল দিয়ে। পাশেই একটি চালার নিচে একটি গরু বাঁধা। যথারীতি খড়ের বাছুর। একজন স্ত্রীলোক মাটির হাঁড়ি নিয়ে সেই দিকে।

অল্প খানিকটা জমিতে নধর পেঁয়াজকলি। আমি সেখানে। পুরুষটি একবার শুধু মুখ তুলে। কিন্তু কোনো প্রশ্ন না করে আবার। তার পাঁজরার হাড়গুলো বেরিয়ে আছে। কত গ্রামে গ্রামে ঘুরলাম, কিন্তু একটিও স্বাস্থ্যবান পুরুষ দেখি না।

—ইধার চা-কা দুকান হ্যায় ?

লোকটি সিধে হয়ে আমার দিকে ভালোভাবে। কোদালের ফলাটা কি চকচকে !

—আপনি কোথা থেকে আসছেন ? (হিন্দীতে)

—এইসাই ঘুমতা হ্যায়

—ঘুমতা হ্যায় ?

লোকটির বিস্ময়ের কারণ আমি বুঝতে পারি। সদ্য সকালে একজন ফিটফাট বাবু চেহারার লোক এই গ্রামে। সচরাচর তো।

—এদিকে চায়ের দোকান নেই ?

—না, বাবু।

—আপলোগ চা নেই পিতা ?

—হাটে গেলে কোনো কোনো দিন খাই। এদিকে তো কোনো দোকান নেই।

অনেকখানি হেঁটে আমি একটু ক্লান্ত। সকালবেলা চায়ের জন্য বুকের ভেতরটা টাস্ টাস্। চা না খেলে সিগারেট জমে না।

চ্যা—চোঁ—চ্যাক—চ্যাক আওয়াজে দৃষ্টি ফিরিয়ে ! স্ত্রীলোকটি দুধ দুইছে। গরুটি শান্তভাবে। মুখে জাবর, ডান উরুতে দুটি মাছি, সেই জায়গার চামড়াটা কুঁচকে কুঁচকে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুধ দোয়া দেখতে বেশ। স্ত্রীলোকটি এ কাজে বেশ নিপুণা। এই জন্যেই মেয়েদের আর এক নাম দুহিতা। অনেকদিন আমি এ-রকম কাছে থেকে দুধ দোয়া।

হাঁড়িটা প্রায় ভরো ভরো। অনেকটা দুধ তো। এরা গরীব হলেও বেশ একটা ভালো গরু।

—আপলোগ ইতনা দুধ কেয়া করতা হ্যায় ? বেচতা হ্যায় ?

—হ্যাঁ বাবু, বিক্রি করি

—কাঁহা ?

—ছিপাদহে

—ছিপাদহ কিৎনা দূর হ্যায় হিয়াঁসে ?

লোকটি হাত তুলে বললো, কাছেই।

সে দেখালো দূরের এক ধুধু'র দিকে। এদের 'কাছেই' মানে অন্তত দু'তিন মাইল। কিন্তু আর উপায় কি ?

মধুর শব্দে দুধ দোয়া তখনো। হঠাৎ শেষ হলো। স্ত্রীলোকটি উঠে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে শিশু দুটিকে। শিশু দুটি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে। স্ত্রীলোকটি একটা পোয়ামাপের কাঁসার গেলাস হাঁড়ির মধ্যে ডুবিয়ে ওদের একজন একজন করে। বাচ্চা দুটি চোখের নিমেষে। স্ত্রীলোকটি তারপর এক গেলাস পুরুষমানুষটিকে। আমি খুবই অবাক হয়ে। এরকমভাবে কাঁচা দুধ খেতে কারুকে দেখি নি। তাও গেলাসটা কলসীর মধ্যে ডুবিয়ে। স্বাস্থ্য বইয়ের লেখকরা এ দৃশ্য দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে !

পুরুষটি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করলো, বাবুজী, আপনি কি একটু দুধ খাবেন ? লাল রঙের গরু, এর দুধ খেলে খুব তাগৎ হয়।

আমি শশব্যস্তে বললাম নেহি, নেহি, বহুৎ মেহেরবাণী আপকা—

লোকটি তখন খুবই পেড়াপেড়ি। স্ত্রীলোকটি ততক্ষণে আর এক গেলাস। আমি বারবার আপত্তি জানিয়েও।

একটা খাটিয়া আনা হলো আমার জন্য। আমি গেলাসটা হাতে করে একটু-ক্ষণ। বলতে পারতাম, দুধটা যদি একটু গরম করে। সঙ্কোচ হলো। এরা যদি কাঁচা দুধ খেতে পারে তাহলে আমিই বা।

আস্তে আস্তে চুমুক। প্রথমে একটু বুনো বুনো গন্ধ। কিংবা কাল্পনিক। তারপর আস্তে আস্তে ভালো লেগে যায়। স্ত্রীলোকটি ব্যগ্রভাবে আমাকে।

স্ত্রীলোকটির বয়েস বছর চল্লিশেক কিংবা পঁচিশ-ছাব্বিশও ঠিক বোঝা শক্ত। স্বাস্থ্যটি দৃঢ় কিন্তু মুখে অনেক দুঃখ, অনেক অভিজ্ঞতা এবং সংগ্রাম। চোখ দুটিতে বিস্ময় এবং স্নেহ এখনো তবু।

হঠাৎ আমার চোখে জল এসে যায়। এক অভূতপূর্ব মমতাময় ভালো লাগার স্পর্শ। কোথায় একটা অচেনা গ্রামে, একটা অচেনা বাড়িতে, জীবনে প্রথম টাটকা কাঁচা গরুর দুধ ঠোঁট দিয়ে ছুঁয়ে। এদের এত আন্তরিকতা। এতটা

কি আমার পাওনা ছিল? আমি কার জন্য কি করেছি? যদি কখনো অন্য কারুর জন্য। যদি কখনো অনুরাধাকে।

অনুরাধার কথা মনে পড়তেই বুকের মধ্যে টনটন। আর কি কখনো দেখা? ভোরবেলায় স্টেশনে নেমে সে কোথায় হারিয়ে। কেন তাকে আমি এমনভাবে হারাতে। সে যে আমার খুবই আপন।

দুধটার জন্য পয়সা দেবো কিনা এই নিয়ে মনের মধ্যে। ভারতীয় আতিথ্য বলে একটা কথা আছে। দারিদ্র্য তার চেয়ে আরও অনেক বেশী ভারতীয়। একটুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর বলি, এক অনজানে মেহমান কে লিয়ে আপলোগ কা বহুৎসা দুধ খরচা হো গিয়া—

আমার হিন্দী শুনে এরা হাসে না—ভাষা নিয়ে এদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কথাটা সবটা বুঝতে না পারলে দু'এক পলক মুখের দিকে।

লোকটি একটু পরে জানালো যে, ওর ভাবী তো এক্ষুনি ছিপাদহে যাবে দুধ বেচতে, সুতরাং আমিও তার সঙ্গে। আমাকে রাস্তা চিনিয়ে।

এতক্ষণ বাদে আমি ওর নামটা। আশ্চর্য, ওর নাম সাহেবরাম। দু'তিনবার শুনেও বুঝতে পারি নি। সাহেবরাম? কি আশ্চর্য মিলন। এখনো ঠাকুর-দেবতার নামেই এদের নাম রাখার রেওয়াজ। এর এক সঙ্গে দুই দেবতা।

আমি তার মাটি-রঙা পিঠে আমার একটা হাত। কি ঠাণ্ডা! এদের গা এত ঠাণ্ডা হয় কেন?

স্ত্রীলোকটি আঁচলটা গাছকোমর। হাঁড়ির মাথায় একটা পাতলা কাপড় বেঁধে বললো, চলুন।

সে মাঠের মাঝখান দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথ চেনে। আমি তার পিছু পিছু। দুজনেই নিঃশব্দ। সে এত দ্রুত যায় যে আমাকেও হনহন ক'রে।

একটা ছোট্ট ডোবার পাশে দুটি তালগাছ। অল্প ছিরছিরে জল। তালগাছ দুটি যেন দুই প্রহরী। কিংবা বন্ধু। চিরকাল জল দেখলেই আমার। একবার অন্তত দৌড়ে গিয়ে পা ডুবিয়ে।

—মায়ি, একটু দাঁড়াবে?

স্ত্রীলোকটি দাঁড়ালো ঠিকই, ভুরুতে বিরক্তির রেখা। হয়তো ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে দুধ। হঠাৎ একটা কথা মনে এলো। এ তো দুধে জল মেশালো না? আমার সামনেই তো সবকিছু। দুধে জল মেশাতে জানে না। শিখিয়ে দেবো? এই ডোবার জলই বা মন্দ কি? হাসি পেল! এসব বাঙালী-চিন্তা।

ডোবার জলে পা ছোঁয়াতেই খুব আরাম। কাছেই দু'তিনটে ব্যাঙ। যেন এদের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ছিল, দেখা না করে চলে গেলে খুবই। সেই জন্যই তো তোমার কাছে। পা দিয়ে জল ছলচ্ছল শিশুর মতন। অনেকক্ষণ খেলা করে সময় কাটানো যেত। তবু উঠে আসতে।

আবার যাত্রা। এর মধ্যেই মাইলখানেক অন্তত। সারাটা পথ কোনো কথা না বলে কি?

—মায়ি, তুমি রোজ দুধ নিয়ে যাও?

—জী

—কখন ফেরো?

—তিন বাড়িতে দুধ মেপে দিয়ে ফিরে আসি।

—যেদিন বৃষ্টি হয়? সকালে যদি বৃষ্টি হয়?

সে আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন আমি ওকে অকারণে ধাঁধা জিজ্ঞেস করছি। ছেলেমানুষি।

কিন্তু আকাশ হঠাৎ কালো। কোথা থেকে মেঘ। যদি হঠাৎ এক্ষুনি বৃষ্টি নামে, আমরা দু'জন কোথায়? কাছাকাছি আর বড় গাছও নেই। সেই ডোবাটার কাছেই ফিরে যেতে। দু'জনে দুটো তালগাছে হেলান দিয়ে। ছবিটা চোখের সামনে ভাসে।

বৃষ্টি এলো না। মাঠ ভেঙে আমরা বড় রাস্তায়। অদূরে কিছু কিছু বাড়ি-ঘর। এবং চায়ের দোকান। আর আমি চা না খেয়ে এক পা-ও। আমার পথ-প্রদর্শিকাকে কি এক কাপ চা?

—মায়ি, চা খাবে?

এবার মুখটা পাশের দিকে ফিরিয়ে সে অদ্ভুত লজ্জার সঙ্গে হাসি চেপে। মুহূর্তে সে খুকীর মতন। এই মুখখানা যদি কোনো ছবিতে।

ফুলুরি ভাজছে। চায়ের সঙ্গে বেশ। এখন যদি আমার পথের সঙ্গিনীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসে চা ও বিশ্রম্ভালাপ। জানি. তা হয় না। শহরে জন্মায় নি বলেই এই নারী ইহজীবনে কোনো চায়ের দোকানে।

আমার কাছ থেকে কোনো রকম বিদায় না নিয়েই সে হনহনিয়ে. এটাই স্বাভাবিক। আমি ওর নাম জিজ্ঞেস করি নি। এই নাম-না-জানা রমণীর কাছে আমার কৃতজ্ঞতাটুকু সারা জীবনের জন্য।

পর পর দু' গেলাস চা। ছোট ছোট গেলাস, ঠিক জমে না। ফুলুরিও বিস্বাদ, সম্ভবত তিল তেলে। দোকানে আমিই একমাত্র। উনুনে বড্ড ধোঁয়া।

সরকারী বিশ্রাম ভবনের সন্ধান জেনে উঠে দাঁড়িয়ে। বেশী দূর নয়। এখানে অনেকেই কাঠের কারবাবী। কয়েকটা বেশ ভালো বাড়ি। সার সার ট্রাক বিশ্রামরত। শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধ। আমার ক্লান্ত পা।

বাংলোটা একদম উঁচুতে। কাঠেব গেটের পরে খানিকটা বাগান। তারপর চওড়া বাবান্দা, সেখানে পবিতোষ আর তাব স্ত্রী, সামনে চায়ের সরঞ্জাম। চমকে দিতে হবে। নিঃশব্দে কাঠের গেট খুলে আমি গুটিগুটি।

হয়তো পিঠে কিল মেরেই বসতাম, তার আগেই। পরিতোষ তো নয়। অচেনা স্বামী-স্ত্রী। কোনো সাডা শব্দ না করে এতটা কাছে চলে আসা খুবই। আমি অপ্রস্তুতেব একশেষ।

লোকটি কোনো প্রশ্ন কবার আগেই আমি পরিতোষের নাম।

লোকটি স্নায়ু শিথিল করে ইংরেজীতে জানালো, মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস ব্যানার্জি তো একটু আগেই…

কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে পরিতোষের সম্পর্কে। আজ সকালেই ওরা গেছে বেতলা। সেখানেও থাকতে পাবে, অথবা। আমি কি এখন পরিতোষের খোঁজে বেতলায় ? বেতলায় চমৎকার জঙ্গল। জীপ নিয়ে ঘুরলে হরিণের পাল, কখনো বাঘ কিংবা হাতি ও দারুণ ব্যাপার। কিন্তু যদি সেখানেও গিয়ে দেখি পরিতোষ ইতিমধ্যে আবার ? এখন এইভাবেই পরিতোষকে খুঁজতে খুঁজতে আমাব সারা জীবন।

একটু হাসি পায়। ঠিক যেন গেছোবাবা। আমি যাই উত্তরে তো সে দক্ষিণে। আমি টালা গেলে সে চেতলায়। তা ছাড়া আমি পবিতোষকে এত খুঁজছিই বা কেন ? কলকাতা থেকে বেরুবার সময তো।

মনস্থির করে ফেলি। এবার ফেরার পালা।

অচেনা দম্পতি ভদ্রতা-মেশানো চা আমার জন্য। আমি প্রত্যাখ্যান। আমি ওঁদের কাছে এমন ভাব দেখালাম যেন আমায় এখনই পরিতোষেব খোঁজে।

বাংলো ছেড়ে হেঁটে এসে রাস্তার ওপরে। আর ট্রাক নয়। এদিক দিয়ে বাস যায় জানি। একঘণ্টা—দু'ঘণ্টা পর পর।

একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েই অনেকক্ষণ। ঘড়ি নেই, কতটা সময় কাটলো জানি না। কটা সিগারেট খরচ হলো সেই অনুযায়ী সময়। এক প্যাকেটে যদি দু'ঘণ্টা চলে তাহলে সেই হিসেবে সাতটা সিগারেটে প্রায় দেড ঘণ্টা। একা থাকলে অবশ্য একটু বেশি ঘন ঘন।

যেন আমার জীবনের দেড় ঘণ্টা আয়ু ছিপাদহের এক গাছতলায় খরচ করার কথা ছিল। ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে ঝগড়ায় মত্ত এক ঝাঁক ছাতারে পাখি। এই দৃশ্যটিও নির্দিষ্ট আমারই জন্য। পর পর তিনটি নারীচরিত্র বর্জিত মোটরগাড়ির ঠিক এই সময়েই এই রাস্তা দিয়েই।

একটু একটু বিরক্তির ভাব আসতেই আমি তাড়াতাড়ি সতর্ক। না বিরক্ত হলে চলবে না তো। পদ্মপাতায় টলটল করছে জল, কখন গড়িয়ে পড়বে তার ঠিক নেই, এর মধ্যে আবার বিরক্তির সময় নষ্ট? তার বদলে গুনগুন করে একটা গান। ধারে কাছে কেউ না থাকলেই আমি ভরসা করে একটু গান গাইতে।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটি কিশোরী মেয়ের অভিমানী মুখ। কেন এই মুখটা ভুলতে পারছি না? ট্রেনে মাত্র কয়েকঘণ্টার জন্য। এরকম তো আরও কতবার। অনুরাধা, শুধু এই নামটা জানি, আর ওর সম্পর্কে কিছুই না। হলুদ ফ্রক পরে শুয়েছিল বাংকের ওপর, চোখের পাশ দিয়ে জলের রেখা। ওর সঙ্গে জীবনে আর আমার দেখা হবার কথাই নয়। তবু যদি এখনো। হয়তো এখনো।

বহুদূরে বাসের চেহারা। আমি চাঙ্গা হয়ে সোজা হয়ে। তখন চোখে পড়লো, খুব কাছেই, উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে কলসী মাথায় সেই স্ত্রীলোকটি। সাহেবরামের ভাবী। দুধ বিক্রি শেষ। দু'একবার আমার দিকে চোখ। কোনো কথা নেই।

আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি মায়ি, ঘর যা রহা হ্যায়?

যেন কতকালের চেনা। সে নিঃশব্দে ঘাড় হেলিয়ে। আমি তার গাম্ভীর্য ভাঙার চেষ্টা করি। হালকা গলায় আবার বলি, সব দুধ খতম? থোড়া সে দেওনা হামকো?

সে এবারও কথা বলে না। তবে হাসে। একটা হাত ঘুরিয়ে ইঙ্গিতে জানায়, নেই, নেই!

ওর সঙ্গে ওদের গ্রামে আবার ফিরে গেলে কেমন হয়? থেকে যাবো সাহেবরামদের বাড়িতে। খাটবো সবজি ক্ষেতে। সকালবেলা কাঁচা দুধ। বিকেলে মহুয়া। একটা ইস্কুল খুলে মাস্টারবাবু হয়ে বাকি জীবনটা?

বাস এসে ওকে আড়াল করে দাঁড়ায়। আমি আর কিছু চিন্তা না করে লাফিয়ে। কলকাতার ছেলে আবার কলকাতায়। এই গ্রামে তিন দিনের বেশী চারদিন থাকতে হলেই পাগল হয়ে। ওসব কল্পনাতেই।

আঃ, বাসটা কি এইসময় একটু খালি থাকতে পারতো না? একটা বসবার জায়গা? গিস্‌গিসে ভিড়। এত লোক সকালে উঠেই কোথায় যায়? আমি দেড়ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ভিড়ের মধ্যে তীব্র মানুষ-মানুষ গন্ধ। যদি রাক্ষস হতাম, সব কটাকে।

ওই ভিড়ের মধ্যেই একজোড়া বরবধূ। বউটি বসবার জায়গা পেয়েছে, বর দাঁড়িয়ে। বরের কপালে তখনো চন্দনের ফোঁটা। যেন বাসরশয্যা থেকে সোজা উঠে এসে। দৃশ্যটার মধ্যে খানিকটা যেন ট্র্যাজিক সুর মেশা। নতুন বউয়ের মুখটা অবিকল নতুন বউয়ের মতন। হয়তো পরশু দিন পর্যন্তও ছিল কুলি-রমণী, আবার কাল পরশু থেকে। মাঝখানে এই একটা দুটো দিন ওর মুখটা একেবারে আলাদা। ওদের জন্য একটা ঘোড়ায় টানা রথ অর্থাৎ অন্তত একটা টাঙ্গা যদি। শুধু আজকের জন্য। আজ ওদের খানিকটা আলাদা সম্মান। তবু কেন বাসে? হয়তো দূরত্ব আরও বেশি।

ডালটনগঞ্জ আসতেই নেমে। এখান থেকে আবার ট্রেন। বেশ গরম। একবার স্নান করতে পারলে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে একটা কলে দু'জন লোক। আমি লোকজনের চোখের সামনে কিছুতেই।

চট করে পরিতোষের বাড়িতে গিয়ে? স্বামীনাথনরা যে রকম সহৃদয়, আমাকে আবার দেখলে নিশ্চয়ই খুব খাতির যত্ন। অনায়াসে ওখানে স্নানটান করে, খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে।

সেদিকে পা বাড়িয়েও ছিলাম। আবার থমকে। এখন দুপুর! স্বামীনাথন নিশ্চয়ই অফিসে। দুপুরবেলা একা পদ্মা। শরীরে আলতো বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে খেলে। হয়তো মেয়েটি খুবই ভালো, সেটা হওয়াই তো স্বাভাবিক, শুধু শুধু আমার লোভ। নির্জন দুপুরে একটি ভালো মেয়েকেও আমি।

ফিরে এলাম। কয়েক মিনিট বাদে আবার। মনটা চঞ্চল হয়ে অবাধ্য। গেলে ক্ষতি কি? মেয়েটি বড্ড সুন্দর। শুধু চোখে দেখতেও। কিন্তু তা হয় না। চোখ অস্থির গর্জন করবে। শরীর যেন চুম্বক, কিছুতেই কাছাকাছি না এসে।

অতিকষ্টে নিজেকে দমন করতেই। একটা যেন দারুণ বীরত্ব। আমার বন্ধুর বাড়ি, যেখানে যাওয়ার আমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, সেখানেও।

স্নান হলো না। একটা দোকানে খেয়ে নিয়ে ট্রেনের কামরায় বসে লম্বা ঘুম।

ডেহরি-অন-শোন-এ পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত। এক্ষুনি বম্বে মেল। টিকিট কেটে উঠলেই সোজা কলকাতা। এবারের মতন ভ্রমণ শেষ।

কিন্তু আমার বুকের মধ্যে একটা ঝনঝন শব্দ। আমাকে অন্য কোথায় যেন। না গিয়ে উপায় নেই, যেতে হবেই হবেই, হবেই হবেই। কথা দেওয়া আছে। কার কাছে? নিজের কাছেই, আবার কার?

একটা শেয়ারের ট্যাক্সি তখনই ঔরঙ্গাবাদের দিকে। উঠে জায়গা করে। চোখ খর করে সব সময় বাইরে। পেরিয়ে না যায়। জায়গাটা ঠিক যদি চিনতে না পারি। না চিনলে আর আপসোসের। সুলেমানপুরে আসতেই চেঁচিয়ে উঠলাম, রোখকে, রোখকে।

কেউ জানে না কেন আমি সুলেমানপুরে। অন্য লোকরাও অবাক। একজন জিজ্ঞেস করলো, এখানে কার কাছে যাবেন? উত্তর দিলাম না। মুখ দিয়ে শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ করে।

ট্যাক্সিটা দূরে মিলিয়ে। আর কোনো উপায় নেই। এবার আমি একা।

ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। এ জায়গায় আগে কখনো আমি। কারুকে চিনি না। শুধু একটা নাম জানি, অনুরাধা। এই নামটা শুধু সম্বল করে কোথায় যাবো, কোথায়?

তবু এখানেই।

ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে।

এই শহরে এখন কে আমাকে আশ্রয়? কোথাও কোনো হোটেল কিংবা। রাত্তিরটা অন্তত।

যে-কোনো একটা বাড়িতে গিয়ে কি? যদি বলি, আমি পথিক, যদি আমাকে একটু। সেসব দিন এখন আর নেই। অচেনা লোককে কেউ অতিথি করে না। শুধু তারাই আশ্রয় দেয় যারা পয়সা নেয়। রূপকথার গল্পের মতন কোনো বাড়ির জানলা থেকে এখন কেউ যদি আমাকে হাতছানি দিয়ে।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর রাস্তার দু'ধারে সারি সারি বন্ধ দোকান। সম্ভবত বাজার। একটা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ, কিন্তু ভেতরে ক্ষীণ আলো। টুকরো টুকরো কথাবার্তা।

—শুনছেন! এই যে, শুনছেন!

প্রথমে কেউ সাড়া দেয় না। কথাবার্তা থেমে। আমি আবার টিনের দরজায় ঢকঢক শব্দ।

—কে?

—একটু খুলবেন?

দরজা সামান্য ফাঁক। এটা একটা ভাতের হোটেল। টেবিলের ওপর চেয়ার-

গুলো ওল্টানো। এক কোণে নিজেদের লোকেরা খাবার-টাবার নিয়ে—

—কি চাই ?

—কিছু খাবার পাওয়া যাবে ?

—না, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে।

—শুনুন না, একটু খুলুন—

একটি মহিষাকৃতি লোক এগিয়ে এসে বললো, কি, বলছেন কি ?

সেই বিরাট লোকটির সামনে আমি প্রায় চুপসে। কোনো রকমে মিনমিন করে বললাম, আমি একটু থাকা আর খাওয়ার জায়গা খুঁজছিলাম।

—কোথা থেকে আসছেন ?

—এমনিই ঘুরতে ঘুরতে। এখানে আর কোনো হোটেল নেই ?

—না। ঔরঙ্গাবাদে চলে যান।

—সে তো অনেক দূর। আপনার এখানে একটু থাকার জায়গা।

লোকটি রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে আমার দিকে খুব ভালোভাবে। সন্দেহাকুল চোখ। অধিকরাত্রে অজ্ঞাতকুলশীল।

—এখানে কি জন্য এসেছেন ?

চট করে উত্তর দিতে পারি না। সম্বল মাত্র একটি নাম। অনুরাধা বসুমল্লিক।

একটি কিশোরীর নাম করে কি কোনো খোঁজ ?

—এদিকে জমির খোঁজে এসেছিলাম।

—জমি ?

—হ্যাঁ। শুনেছিলাম এদিকে সস্তায় জমি পাওয়া যাচ্ছে। ট্যাক্সি ব্রেকডাউন হয়েছিল, পৌঁছোতে দেরি হয়ে গেল।

আমাকে দেখলে কি জমি-কেনা মানুষ ব'লে ? তবু যদি ওরা ভাবে আমার সঙ্গে অনেক টাকা। বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য আমি আবার বলি, জমি কিনে একটা ফ্যাকটরি হবে, আমার মামার, তিনিই পাঠিয়েছেন।

—জাঠমলের কাছে খোঁজ করুন

—কিন্তু রাত্তিরটা কোথায় থাকা যায় ? আপনার হোটেলে ঘর নেই ?

—এটা থাকার হোটেল নয়, শুধু খাওয়ার।

দু'জন অল্পবয়েসী বেয়ারাও বাইরে এসে। একজন বললো, ডাকবাংলোতে যান।

—কত দূরে ?

—দু' আড়াই মাইল

—এত রাত্রে সেখানে যাবো কি করে? গিয়েও যদি জায়গা না পাই? আপনার ওই টেবিল দুটোর ওপরে যদি শুয়ে থাকি?

ভবিষ্যৎ ফ্যাক্টরি মালিকের ভাগ্নের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব প্রত্যাশা করা যায় কিনা, ওরা সেটা ঠিক বুঝতে। এ ওর মুখের দিকে। দীর্ঘকায় লোকটি বললো, ওটার ওপরে এই ছোকরা শোয়।

—আর কোনো জায়গা নেই? যদি একটু সাহায্য করেন!

ওরা নীরব। আমি যেন বেশী বাড়াবাড়ি। সামান্য রাত্রে ঘুমোবার জন্য! বৃষ্টি নেই, মাঠে-ঘাটে গাছতলাতেই তো। আমার তো নেই বাটপাড়ের ভয়! আসলে হয়তো, এই রিকেটি হোটেলের নড়বড়ে কাঠের টেবিলে শোওয়ার জন্যই আমার লোভ। ওই জায়গাটাই আমার চাই। এ-রকম অসঙ্গত লোভ আমার মাঝে মাঝেই। যেন ওই জায়গাটা না পেলে কিছুতেই আজ আমার ঘুম।

ছেলে দুটি স্থানচ্যুত হতে চায় না। একজন বললো, পদমজীর বাড়িতে ইরিগেশানের বাবুরা ছিল কিছুদিন

—দ্যাখ তো সেখানে ঘর খালি আছে কিনা

একটি ছেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে। বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের মধ্য দিয়ে। পদে পদে হোঁচট খাওয়ার ভয়। কোথা থেকে কোথায়। কাল রাত্রে কোথায় ছিলাম। আর আজ। সুখের বিছানা ছেড়ে এই মাঠের মধ্যে। এই অনিশ্চয়তায় আমার দারুণ আরাম।

একটা লম্বা স্কুলবাড়ির মতন। অনেক ডাকাডাকি করে পদমজীকে। টকটকে লাল চোখ। আশু মুখুজ্যের মতন গোঁফ। বোঝা যায় সন্ধে থেকেই গাঁজা।

ছোট ছেলেটি আমার সমস্যা বুঝিয়ে বলায় সে কোনো রকম বিস্ময় দেখায় না। তৎক্ষণাৎ হাত বাড়িয়ে বললো, তিনরুপিয়া চার আনা রোজ।

রেট যথেষ্ট বেশী। সাধারণ হোটেলেই চার টাকা। তবু দরাদরি না করে আমি একটা দশ টাকার নোট। এবং কিছু চিন্তা না করে বললাম, তিন রোজকা।

ঘরটা বিস্ময়কর রকমের পরিষ্কার। ধপধপে সাদা দেয়াল, মাঝখানে একটি খাটিয়া। সব মিলিয়ে বেশ একটা শুকনো টাটকা ভাব। এতটা আশা করি নি।

ছেলেটাকে বিদায় দিয়ে আমি অবিলম্বে শুয়ে। আজ রাতের মতন পেটে কিল মেরে!

কোথায় কখন থাকি, তার ঠিক নেই। তবু এই ঘরটা কেন তিন দিনের জন্য? যেন এখানে একটা চুম্বক আছে। আমাকে টেনে রাখছে।

রাত্রে ঘুমের মধ্যে অস্পষ্ট গোলমাল। গাঁজাখোরদের হল্লা। কখনো একটি স্ত্রীলোকের সরু কণ্ঠস্বর। তবু আমি না উঠে। অচেনা জায়গায় বেশী কৌতূহল দেখানো ভালো নয়।

সকালে উঠেই চায়ের জন্য। এখানে চা পাওয়া যায় না। যেতে হবে বাজারে। একবারেই বেরিয়ে পড়া যাক। মুখ-টুক ধুয়ে নিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে।

চা খাওয়ার পর আমার কর্মপদ্ধতি ঠিক করে ফেলি। শুধু একটা নাম। ওতে কোনো লাভ নেই। যুবকটিরও পদবী যদি। সুতরাং সারা শহরটা টহল মেরে। যদি হঠাৎ।

শহরটা ছোট। বাজার আর কিছু খুচরো দোকান, ছড়ানো ছেটানো বাড়ি। একটা তিরতিরে নদী। রেল স্টেশন ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই।

মন্থরভাবে প্রতিটি রাস্তা দিয়ে। প্রতিটি বাড়ির দিকে সতর্ক চোখ। দরজার দিকে, জানলার দিকে। বাড়ির পেছনের উঠোনে। যে-কেউ আমাকে ভাবতে পারে পুলিসের লোক।

কেন আমি এ-রকম করছি? কেন ঐ মেয়েটিকে? নিজেই জানি না। মেয়েটিকে খুঁজে পেলেই বা কি লাভ? জানি না। আমি তাকে কি বলবো? জানি না। হঠাৎ কেউ আমার গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন করলে কি উত্তর? জানি না।

অন্তত তিনবার গোটা শহরটা চষে ফেলে। এখানে বাঙালীই প্রায় চোখে পড়ে না। এমন হতে পারে ওরা এর মধ্যে এ জায়গা ছেড়ে। কিংবা এই রেল স্টেশনে নেমে দূরের কোনো গ্রামে। তাহলে আমি এখানে কি করছি? তিন দিনের জন্য ঘর ভাড়া।

একটা বাড়ির দিকে আমার বারবার চোখ। পুরোনো বাড়ি। চারদিকে দেয়াল, দেয়ালে আইভি লতা। বাড়িটার গেটে বাংলা অক্ষরে লেখা 'চৌধুরী কুঠী'। এরা বাঙালী। সুতরাং এখান থেকে কোনো রকম খবর হয়তো। কিন্তু চৌধুরীদের সঙ্গে বসুমল্লিকদের কি আত্মীয়তা? জানি না। একজন প্রৌঢ় লোককে সে বাড়ির সামনে কয়েকবার। বেশ রাশভারী চেহারা। বাড়িটার পেছনে ঘন ঘন মুর্গীর ডাক। বেশ কয়েকটা মুর্গী আছে বোধহয়।

প্রৌঢ় লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে? কিন্তু কি জিজ্ঞেস? একটি মেয়ের নাম? সে আমার কে হয়? যদি আমাকে লম্পট হিসেবে? মহা মুশকিল দেখছি!

সকালটা বৃথা গেল। দুপুরে বাজারের দোকানে। খেয়ে পদমজীর ঘরে

ঘুম। কিন্তু গাঢ় ঘুম হয় না। অনেক রকম স্বপ্ন, এলোমেলো। একবার অনুরাধাকেও। সেই দুঃখ ও রাগ মেশানো মুখ। অনুরাধার সঙ্গে দেখা হলেও ও কি আমাকে চিনতে? কি জানি, ভয় হয়। কেনই বা চিনবে? আমি ওর কে? এমনকি ভালো মতন আলাপ তো।

বিকেলে আবার। জানি পণ্ডশ্রম, তবুও নেশার মতন। পৃথিবীতে আমার এখন একমাত্র কাজ অনুরাধা বসুমল্লিককে খুঁজে বার করা। না হয় শুধু একবার তাকে দেখেই। হয়তো সে এখানে নেই। তবু এখানে সে ট্রেন থেকে নেমেছিল, সেই জন্যই শহরটা চুম্বকের মত।

ঠিক সন্ধের আগে আমি যুবকটিকে হঠাৎ। সে একটা ডাক্তারখানা থেকে বেরুচ্ছিল। আমি তাকে এক পলক দেখেই। কিন্তু সেও কি আমাকে? আমি চট করে মুখটা ফিরিয়ে।

আমার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে দুমদুম্ যেন বাইরের লোকও শুনতে। সারা-দিন ঘোরাঘুরি করে নিরাশ হবার ঠিক পরেই এই আশাতীত। এত বেশী আনন্দ যে অনেকটা ভয়ের মতন। দারুণ ভয় ও দারুণ আনন্দের প্রতিক্রিয়া যেন একই রকম।

ডাক্তারখানায় কেন? কার অসুখ? অনুরাধার? তা হলে সে বিছানায় শুয়ে নিশ্চয়ই। কিছুতেই দেখা হবে না। আমি যদি ডাক্তার হতাম, ইস্!

ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে যুবকটি আবার একটি দোকানে। আমি খানিকটা দূরে। বেশ একটা উত্তেজনার ভাব। যেন গল্পের বইয়ের গোয়েন্দা। সিগারেট ধরিয়ে বারবার আড়চোখে।

যুবকটি সেই দোকান থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করতেই, আমিও তার পেছন পেছন। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে। হয়তো যুবকটি আমাকে দেখলেও। ট্রেনের কামরার সঙ্গীদের কে মনে রাখে। আমি রেখেছি, আমি তো রাখবোই!

আসলে আমি সারাদিন খুবই বোকামি। একটি মেয়ের বদলে একটি ছেলেকে খুঁজে বার করা অনেক সহজ! আমি যদি ছেলেটিকেই কোনো না কোনো দোকানে। কিংবা বাজারে। একটা ছেলে তো আর সারাদিন বাড়িতে। আসলে ছেলেটির কথা আগে আমার মনেই। সব সময় অনুরাধার মুখ।

শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে যুবকটি যে বাড়ির সামনে আসে, সেই বাড়ির কাছ দিয়ে আমি আগে অন্তত পাঁচ ছ' বার। এই তো সেই বাড়িটা! সেই চৌধুরী কুঠী। কুকুরের মতন শুঁকে শুঁকে আমি তাহলে ঠিক বাড়িতেই। ইস্ একটা বেলা শুধু শুধু।

বাড়িটা হলুদ রঙের একতলা। সামনে ছোট বাগান। বেশ পুরোনো আমলের বাড়ি, মোটা মোটা থাম। গেটটা ভাঙা। রাত্তিরে যে-কোনো চোর অনায়াসেই। বাড়িটার চারপাশে অবশ্য দেওয়াল।

সামনেই রাস্তার ওপাশে মাঠটা ঢালু হয়ে। একটা বিরাট তেঁতুল গাছ। সেই তেঁতুল গাছের ওপাশে হেলান দিয়ে একজন মানুষ যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। আমার পা ব্যথা করে। অস্বস্তি ও লজ্জা।

অন্ধকারে কোনো দৃশ্য নেই। চোখের সামনে শুধু পাতলা বা গাঢ়। মাঠের দিকে চেয়ে থাকার কোনোই মানে। শুধু বাড়িটাতেই আমার। বাড়িটা নিস্তব্ধ এবং বাইরের দিকে আলো নেভানো। কতক্ষণ আর কতক্ষণ এইখানে। এবং কি ভাবে? কি ভাবে আমি অনুরাধাকে? কোনো উপায়ও তো চোখে। অস্বস্তিতে শরীরটা কেন কাঁপার মতন। বুকের মধ্যে ব্যথার মতন, গলার কাছে বাষ্পের মতন।

অস্বস্তি কাটাবার জন্য আমি আরও বেপরোয়া হয়ে। সন্তর্পণে চোরের মতন গেট খুলে বাগান পেরিয়ে। সারা বাড়ি শব্দহীন। এ বাড়ির লোকেরা কি, সন্ধেবেলাতেও কেউ বেড়াতে বেরোয় না?

রীতিমত অন্ধকার, তার মধ্যে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ির পেছন দিকে। পায়ে কিছু একটা লাগলে আমি নিজেই চমকে। যদি ধরা পড়ি তা হলে কি? আমি অনুরাধার গোপনীয়তার ভাগ নিতে।

দাঁড়িয়ে থাকি, নিশ্বাসও প্রায় বন্ধ। সত্যিই এখন গা কাঁপছে। ফিরে যাবো, ফিরে যাওয়াই বুদ্ধিমানের মত কাজ। আমার পক্ষে এর চেয়ে বেশী সাহস। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বিরাট শব্দ করে দরজা খুলে একজন কেউ বাইরে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কেউ কি কোনো রকম সন্দেহ?

ভারী গলায় একজন বললো, এই, দুটো চেয়ার দিয়ে যা তো বাইরে! জয়ন্ত, জয়ন্ত, এদিকে এসো!

—আসছি কাকাবাবু!

—এখানে বসা যাক। বেশ হাওয়া দিয়েছে!

আমি প্রায় মড়ার মতন। লোক দুটো বাইরে দাঁড়িয়ে। এখন আমি কি করে? বাড়িটার চারদিক পাঁচিল ঘেরা। পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করলে যদি শব্দ-টব্দ।

বাড়ির দেওয়ালে হাত দিলে ঠাণ্ডা লাগে। পুরোনো দিনের নোনাধরা দেওয়াল। ইচ্ছে করে গালটা ছোঁয়াই এবং কাঁদি। এরকম বোকামি কি কেউ? যদি এ বাড়িতে কুকুর?

লোক দুটি বাইরে বসে সশব্দে গল্প। অপরজন জয়ন্তর কাকা। তারই বাড়ি বোধহয়। তিনি জয়ন্তকে মুর্গীপালন বিষয়ে কিছু। অনেকদিন পোলট্রি করেছেন মনে হয়। জয়ন্তর হুঁ হাঁ শুনলে বোঝা যায় তার কোনোই আগ্রহ।

যাক, তা হলে এখনো সন্দেহ করে নি কিছু। আমাকে অপেক্ষা করতে হবে, যতক্ষণ না ওরা আবার ভেতরে। সে কতক্ষণে কে জানে।

খানিকটা দূরে একটা জানলায় আলো। আমি পা টিপে টিপে সেই দিকে। জানলার নিচের দিকটা বন্ধ, ওপরের দিকটা খোলা। আমার মাথার চেয়েও উঁচুতে। ডিঙি মেরেও কিছুতেই। অথবা যদি দেওয়াল বেয়ে। না, না, তাতে ঝুঁকি অনেক বেশী। একটা ইঁট যোগাড় করতে পারলেও।

ভাঙা দেওয়ালে অনেক আলগা ইঁট। অন্ধকারের মধ্যে খুব সাবধানে একটা। তারপর সেই ইঁটের ওপর পা দিয়ে।

এক পলক দেখেই নিচু করে নিই মাথা। খাটের ওপর সেই মেয়েটি। অনুরাধা। সত্যি? না স্বপ্ন? খুব কাছে গিয়ে, চোখ যথাসম্ভব বিস্ফারিত করে। তারপরেই আবার সরে। চোখ বুজে একটুক্ষণ হৃদয়ঙ্গম। হ্যাঁ, সত্যিই তো অনুরাধা। অসুস্থ কিনা জানি না। বুকের ওপর বই খোলা। আজ ফ্রক নয়, শাড়ি। কী অসম্ভব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে! যেন শাড়িতে মোড়া এক গুচ্ছ চাঁপা ফুল। ওই এক ঝলকেই আমি দেখেছি তার কোমর। বিলিতি ছবির মতন। যতটা সুন্দর ভেবেছিলাম, তার চেয়েও সুন্দর অনুরাধা।

এখানে আমি চোরের মতন। সত্যিই কি চোর? কিছু তো নিতে আসি নি। আমাকে রূপচোর যদি বলে। সেটা কি দোষের। জানি না। ওকে আর একবার দেখার জন্য আমার বুকের মধ্যে সাংঘাতিক।

আকাশ হালকা মেঘে ঢাকা ছিল। হঠাৎ এই সময় তা ভেদ করে বেরিয়ে এলো লক্ষ্মীছাড়া চাঁদ। অন্ধকার ফিকে হতেই আমার ভয়। এতক্ষণ হাত-পাগুলো অন্ধকারের মধ্যে। এখন নিজেকেই নিজে দেখতে পাই।

কোথায় লুকোবো? যদিও এখনো আর কেউ। একটা ব্যাপার বুঝে গেছি, এ বাড়িতে কুকুর-টুকুর অন্তত। উঃ, যদি কুকুর থাকতো, তাহলে এতক্ষণ আমাকে সাধারণ চোরের মতন।

অদূরে বারান্দায় লোকদুটি এখনো কথাবার্তায়। এখন বিদ্যাসাগর সম্পর্কে। কী করে যে মুর্গীপালন থেকে বিদ্যাসাগরমশাই প্রসঙ্গে? অ্যাট্রোশাস! জয়ন্তর কাকা বোঝাচ্ছেন, কার্মাটারে বিদ্যাসাগরমশাই সাঁওতালদের কাছ থেকে ভুট্টা

কিনে আবার তাদেরই সেইগুলো খাওয়ার জন্য। সেই সময় একদিন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে···উঃ। কী ভুল! দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার কার্মাটারে। আমি চেঁচিয়ে ওনার ভুল শুধরে? তাহলে হয়েছে আর কি!

আরও কিছুক্ষণ নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে। আলো জ্বালা জানলার ওপাশেই অনুরাধা। ওর সঙ্গেও কোনো কথা। আমার অধিকার নেই। দেখার? আবার পা টিপে টিপে জানলার কাছে। ইঁটের ওপর আঙুলের ভব দিয়ে। জানলার শিক ধরতে সাহস হয় না। দেওয়ালে।

অনুরাধার কি অসুখ? নীল শাড়ি, অনাবৃত বাহু, পায়ের দুটি পাতা, কোমরের কাছে খানিকটা নগ্ন। বুকে ঢেকে রাখা দুটি স্থলপদ্ম। আমি চোখ দিয়ে শুধু এই সৌন্দর্য নয়, এর মধ্যে যে বিষাদ। ট্রেনে আমি ওকে শয়ান অবস্থায় কাঁদতে। একটি কিশোরীর চাপা দুঃখের মতন এমন তীব্র, মধুর, স্পর্শকাতর আর কী আছে পৃথিবীতে? কিশোর বয়সে আমারও এরকম কতবার।

দারুণ লোভ হচ্ছে ওর সঙ্গে একটু কথা বলতে। জানি, তা সম্ভব নয়। তবু লোভ। জানলা দিয়ে যদি ওর নাম ধরে? নিশ্চয়ই চমকে উঠে, ভয় পেয়ে। তা ছাড়া আমি ওর কে? ও আমার এত আপন।

নিশ্বাসও বন্ধ করে থাকি। যাতে কোনোরকম শব্দ। দেখে দেখে আশ মেটে না। যদি একবার পাশ ফিরতো, তাহলে মুখখানা আরও ভালো করে। ওর মাথা জানলাব দিকে। আঙুলগুলো সোনাব মতন, ওই আঙুলে হাজারবার ঠোঁট বুলোলেও।

অনুবাধা বইয়ের একটা পাতা ওল্টালো। অর্থাৎ জেগেই। তাহলে এখন কাঁদছে না। বই পড়তে পড়তে এখনো প্রায়ই আমাব চোখ দিয়ে জল। সে অন্যরকম কান্না।

পায়ের তলা থেকে ইটটা পিছলে। একটা বিশ্রী শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে আমি মাথা নিচু করে বসে পড়ার জন্য। তারপরই প্রায় উ করে চেঁচিয়ে। কোনো রকমে মুখ চেপে। খানিকটা কাঁটা তার, এমন খোঁচা মেরেছে উরুতে। আস্তে আস্তে তারটা সরিয়ে।

অনুরাধা শব্দ শুনেছে। স্পষ্ট বুঝলাম খাট থেকে ও। তারপর জানলার কাছে। আলোর মাঝখানে ওর সিলুয়েট। সামনের দেওয়ালটা যেন স্ক্রিন জানলার শিকগুলোর জন্য হঠাৎ মনে হয় কারাগারে এক বন্দিনী। ও কি চিৎকার করে? তা হলেই তো আমি। না, না, অনুরাধা, আমি চোর নই, আমি তোমার শত্রু নই, তুমি আমাকে।

একটুক্ষণ ও স্থিরভাবে দাঁড়িয়েই। চুলগুলো খোলা। হাত দিয়ে কপালের চুল। চিৎকার করে উঠলো না শেষ পর্যন্ত। আসলে রাত তো বেশী হয় নি, এই সময় কেউ সাধারণত চোরের কথা।

আবার সরে গেল জানলা থেকে। আর না। এবার আমাকে পালাতেই। আর বেশী ঝুঁকি নিলে।

কিন্তু কি করে? সামনে এখনো লোকদুটি। সামনে দিয়ে যাওয়া অসম্ভব।

জয়ন্তর কাকা চেঁচিয়ে উঠলেন, রঘু, জল দিয়ে যা!

জল? সন্ধেবেলা জল? শুধু জল? তাহলে তো আরও কতক্ষণ কে জানে!

সুতরাং পাঁচিল টপকেই। খুব বেশি উঁচু নয়। আমার মাথা-সমান। মাঝে মাঝে আইভি লতা। শব্দ না করে কোনোক্রমে। খুব আস্তে আস্তে অনুরাধার জানলার কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে। পাঁচিলে ধরবার মতন কিছুই নেই।

এক হতে পারে, বাড়ির পেছন দিকে যদি কোনো খালি জায়গা। আমি পাঁচিলের গা ঘেঁষে ঘেঁষে। বাড়ির পেছন দিকেও প্রশস্ত বারান্দা। একপাশে রান্নাঘর। ভাগ্যিস আমার উল্টোদিকে। রান্নাঘরে আলো, সেখানেও এক রমণী। বারান্দায় দুটি জ্বলজ্বলে চোখ। ভয়ের কিছু নেই, একটা বেড়াল। বেড়াল তো আর মানুষ দেখলে কুকুরের মতন।

সেই জায়গাটা দ্রুত পেরিয়ে। এবার পায়ের নিচে মাটি নরম। চটিজোড়া খুলে আগেই হাতে। এখন যদি এক দৌড়ে। সামনের দিকটা ফাঁকা মতন।

একটু দৌড়োতে গিয়েই আবার পায়ে কি যেন। নিচু হয়ে দেখলাম গোলাপ কাঁটা। এবং অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় একটা বাগান। অনেক গোলাপ ও বেলফুলের চারা। অনেক ফুল এখানে। গোলাপের রঙও সাদা। কিংবা জ্যোৎস্নায় রঙ বদলেছে। একটা গন্ধের ঢেউ।

কাঁটাটা না বার করলে। হঠাৎ আমি কীরকম বিহ্বল হয়ে পড়ি। ফুলের বাগানে এক চোর। তার পায়ে কাঁটা। আকাশ থেকে জ্যোৎস্না পড়ছে তার মাথায়। কোন্ নিয়তি আমাকে এখানে? আমি কি এর যোগ্য? আমার চোখ জ্বালা করে ওঠে। আমার জীবনে কত ব্যর্থতা, কত কিছুই পাই নি, তবু কেন এই অপরূপ কুসুমগন্ধ!

কাঁটাটা খানিকটা ভেঙে গিয়ে ভেতরে। একটা গোল মুখওয়ালা চাবি পাওয়া গেলে; যাই হোক, এখন আর কি করা! এইভাবে এখানে কতক্ষণ? একটা বেলফুলের গায়ে টোকা দিয়ে তার শিশির। একটা গোলাপের পাপড়িতে হাত বুলিয়ে যেন কারুর ঠোঁট।

উঠে দাঁড়াতেই দেখি উল্টো দিক থেকে একটা লোক। খালি গা, মালকোঁচা ধুতি।

—কে ?

এক মুহূর্ত আমি চুপ করে। বাগানের ওপাশে কয়েকটা ছোট ছোট ঘর। একপাশে একটা বাঁশের গেট। খোলা। ঐখানে আমার মুক্তি।

—কে, কে ওখানে ?

উত্তর না দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড।

—আবার এসেছে। দাদাবাবু! দাদাবাবু!

লোকটাও দৌড়ে গিয়ে গেটের কাছে। আমি ডান দিকে বেঁকে। যদি আর কোনো ফাঁকা জায়গা।

—দাদাবাবু, দাদাবাবু। হারামজাদা আবার এসেছে!

আমাকে পালাতেই হবে। একটা ঘরের পাশ দিয়ে যেতেই একঝাঁক মুর্গী, একসঙ্গে কঁক্ কঁক্ করে। চমকাবারও সময় নেই। ওদিকে জয়ন্ত আর তার কাকাও। হাতে লাঠি আছে কি ?

—ধর, ধর ব্যাটাকে !

খালি-গা লোকটা এর মধ্যে কোথা থেকে একটা ডাণ্ডা। ওদিকে আর কোনো সুবিধে হবে না। আমি একদম মার সহ্য করতে পারি না। ভীষণ খারাপ লাগে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে।

অতএব সামনের দিক দিয়েই আবার ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে। যত ইচ্ছে কাঁটা ফুটুক। পায়ের নিচে কি দু'একটা গাছের চারা ? তোমরা আমাকে ক্ষমা করো।

জয়ন্ত আর কাকা দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাকে ধরার জন্য। খালি হাত। ওদের যে-কোনো একজনকে এক ধাক্কা দিয়ে। এখন বারান্দাতে অনুরাধাকে।

যেন একটা ইঁদুরকে তিনটে বিড়াল। আমি এদিক ওদিক ছুটেও ফাঁক পাচ্ছি না। অনুরাধাই একটা দরজার খিল এনে জয়ন্তর দিকে।

আমি হঠাৎ বাগানের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, আমাকে মারবেন না! আমি চোর নই!

সঙ্গে সঙ্গে, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য ঐ কথাই আবার ইংরেজীতে। আবার শ্রেষ্ঠ উচ্চারণে।

জয়ন্তর কাকাই সাহস করে এগিয়ে এসে আমার কলারে হাত। খুব রাগী মুখ। যদি চড় মারে, সেইজন্য আমি সাবধান হয়ে।

—কে তুমি ? এখানে কী করছো ?

—বলছি, বলছি।

একটু হাঁপাচ্ছিলাম। দম নেবার জন্য একটু সময়।

—দয়া করে আমাকে ভেতরে নিয়ে চলুন !

—কে তুমি ?

—ভেতরে গিয়ে বলবো !

ভেতরে নয়, বারান্দা পর্যন্ত। রান্নাঘর থেকে মহিলাটি, ভেতর থেকে আরও একজন মহিলা। খালি-গা লোকটা ডাণ্ডা হাতে আমার পাশে। সে জানালো, এ তো সে হারামজাদা নয়।

আরও একজন নিয়মিত চোর আছে। ওদের বোঝানো দরকার, আমি জীবনে এই প্রথম। জয়ন্ত আমাকে চিনতে পারে নি। অনুরাধা এখনো আমার মুখটা ভালো করে। ও কি চিনতে পারবে না ?

চটিজোড়া হাত থেকে নামিয়ে আমি জয়ন্তর কাকাকে খানিকটা হুকুমের সুরেই, জামাটা ছেড়ে দিন !

জয়ন্ত জিজ্ঞেস করে, কে আপনি ?

তুমি থেকে আপনিতে। এটা নিশ্চয়ই ইংরিজির জন্য।

—দয়া করে জোরে কথা বলবেন না ! আমি ইচ্ছে করেই আপনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। একটু বাদে চলে যাবো।

—ইচ্ছে করে ? এটা কি বাজার ?

—আপনারা বাঙালী বলেই

—বাঙালী তো কি হয়েছে ?

—বলছি, একটু সময় দিন !

—সময় দিতে হবে ? তুমি কোন্ লাট সাহেব ?

জয়ন্তর কাকা আবার মারমুখী। ইনি আমার ইংরিজি শুনেও তেমন গুরুত্ব। ছেলে ছোকরাদের কেউই আজকাল। বয়সটাই অপরাধ।

—এখানে ঢুকেছো কেন ?

—পুলিসের হাত থেকে বাঁচবার জন্য। একটু আগে আপনাদের বাড়ির দু'খানা বাড়ি আগে দোতলা বাড়ি থেকে একটা লোককে বেরুতে দেখেছি। আই বি'র লোক। আমাকে দেখলেই ধরবে। তবে আপনাদের আগেই বলে রাখছি, আমি চোর বা ডাকাত নই।

অনুরাধা এবার আমার দিকে খানিকটা এগিয়ে। মুখটা ভালো করে দেখে, ওঃ

আমি সামান্য হেসে, হ্যাঁ, ট্রেনে দেখা হয়েছিল।

জয়ন্ত অবাক হয়ে, ট্রেনে! কবে? রমু, তুই একে চিনিস?

অনুরাধা ঘাড় নেড়ে এবং মুখে স্পষ্ট উচ্চারণ করে জানালো, না।

আমার শেষ আশাও। চিনতে পারলো না? অথচ আমি যে ওকে সারা জীবনের মতন। আমার ভয় পাবার কথা ছিল, তার বদলে অভিমান।

জয়ন্ত আমার দিকে ফিরতেই আমি হাত তুলে। তাকে আর কথা বলতে দিই না।

—এক গেলাস জল পেতে পারি? খুব তেষ্টা পেয়েছে।

জয়ন্তর কাকা বললেন. রঘু, জল এনে দে।

—আমি কলকাতা থেকে পালিয়ে এসেছি!

একথায় জয়ন্ত যেন একটু চমকে। আবার আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর জিজ্ঞেস, আপনার নাম কী?

—অশেষ মজুমদার।

পায়ে কাঁটাটার ব্যথা। একটু বসতে পারলে। রঘু জল এনে সামনে উঁচু করে। শুধু একটা ঘটি। গেলাস নেই, উঁচু করে আলগোছে খেতে হবে নাকি, ভিখিরিরা লোকের বাড়িতে এসে যেমনভাবে। সেই রকমভাবে খেতে গিয়ে জামা-টামা একেবারে ভিজিয়ে।

খুড়োমশাই এবার রঘুকে ধমক, গেলাস আনতে পারিস নি!

—ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে।

তবু খুব তৃষ্ণার্তের মতন অনুরাধার দিকে একবার। ওর চোখে চোখ। ঐ চোখের গভীরে? মানুষ এখনো কি শিখেছে চোখের প্রকৃত ভাষা!

—আপনি পালাবার চেষ্টা করছিলেন কেন?

—আমি ভয় পেয়েছিলাম। রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, আই বি'র লোকটিকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে এ বাড়িতে ঢুকে পড়ি। ভেবেছিলাম খানিকক্ষণ লুকিয়ে থেকে

—কোন দিক দিয়ে এলেন

আমি বাগানের দিকে গেটের দিকে আঙুল।

—ওদিকে তো রাস্তা নেই, ওদিকে তো মাঠ

—পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরে এসে। সামনের বারান্দায় আপনারা বসেছিলেন তো।

—কতক্ষণ আগে?

—মিনিট পনেরো। পায়ে কাঁটা না ফুটলে এতক্ষণে হয়তো চলেই যেতাম।

কাঁটা ফোটার কথাটা কেউই গ্রাহ্য। জয়ন্ত আর তার কাকা চোখাচোখি। যেন আরও কিছু প্রশ্ন। মহিলাটি এবার সেটা।

—দেখে তো মনে হয় ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের ছেলে পুলিসের ভয়ে পালাবে কেন?

কাকা বললেন, আমিও তো সেইটাই বুঝতে পারছি না।

কাকাকে উত্তর না দিয়েই আমি ভদ্রমহিলার দিকেই। তাঁর মুখে খানিকটা রাগ। আমি কণ্ঠস্বরে অভিমান মিশিয়ে, আপনি জানেন না। কেন ছেলেরা পালায়? এটা উনিশ শো সত্তর সাল, তাও একথা জিজ্ঞেস করছেন? কলকাতায় থাকলে আমি এতদিনে মরে যেতাম!

অনুরাধা এবার জিজ্ঞেস, আপনি তপন আচার্যকে চেনেন?

—চিনতাম। সে মারা গেছে।

—কবে?

মনে মনে খানিকটা হিসেব। কবে কলকাতা থেকে ট্রেনে? তার আগের পরশুদিন।

—১৪ই মা.। ওর গুলি লেগেছিল

অনুরাধার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, শরীরে জর। এর জন্যই ওষুধ আনতে জয়ন্ত। অনুরাধা এক পায়ের আঙুল দিয়ে আর এক পায়ের আঙুল চেপে ধরেছে।

—তপন আমার চেয়ে বয়েসে ছোট হলেও আমার বন্ধুর মতন ছিল। চমৎকার ছেলে। হীরের টুকরো ছেলে—

জয়ন্ত আমাকে থামিয়ে অনুরাধাকে, এই রমু, তুই ঘরে যা—।

—না, কেন?

—তোর এখনো গায়ে জর, শুয়ে থাক, উঠে এসেছিস কেন?

—কিছু হবে না।

জয়ন্ত এবার আমাকে, আসুন, ভেতরে এসে বসুন!

ওদের শোওয়ার ঘরের মধ্য দিয়ে ঢুকে তারপর বসবার ঘরে। জয়ন্তর কাকা চাইছিলেন বাইরের বারান্দায়। আমি কৃত্রিম ভয় দেখিয়ে। রাস্তা থেকে বারান্দাটা স্পষ্ট।

অনুরাধা এ- ঘরে আসে.নি। তিনজন তিনটে চেয়ারে। জয়ন্তর কাকা বাইরের বারান্দা থেকে তাঁর গেলাসটা। গেলাসে শুধু জল নয়।

—আপনি চা খাবেন!

—খেতে পারি!

—তখন আচার্য আমাদের বিশেষ চেনা ছিল।

এখন আমার পক্ষে নীরব থাকাই। মনে মনে আমি তপন আচার্যর চেহারাটা। হীরের টুকরো হওয়াই স্বাভাবিক। অনুরাধার মতন মেয়ে যখন তার জন্য।

জয়ন্তর কাকা খানিকটা আফসোসের সঙ্গে, কেন যে ছেলেরা এরকম পাগলামি শুরু করেছে? এরকমভাবে কি দেশটা বদলানো যায়?

জয়ন্ত, আমারও মনে হয় এটা সম্পূর্ণ ভুল পথ। শুধু শুধু কতকগুলো ভালো ভালো ছেলে

আমি তখনও নীরব। আমি অপরাধী। আমি ওরকম পাগলামিও তো। আমাকে পুলিস কখনো। তবু আমি আন্তরিকভাবে তপনের বন্ধু হয়ে যেতে।

শুধু চা নয়, সঙ্গে মিষ্টি। সেই রাগী মহিলাই।

জয়ন্ত আবার আমাকে, এখানে কোথায় উঠেছেন?

—কোথাও না।

—তাহলে হঠাৎ কীভাবে?

—ডেহরি-অন-শোনে ছিলাম। সেখানে একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, মনে হলো, যদি কলকাতায় খবর চলে যায়। আজ বিকেলেই এখানে এসে পৌঁছেছি। তারপরেই আই বি লোকটাকে রাস্তায় —ও যে আই বি'র লোক সে ব্যাপারে আমি ডেফিনিট, কলকাতায় দেখেছি, মুখ চেনা

—আপনি এখানে থাকতে পারেন

—না, না, ঐ লোকটা যখন এখানে আছে, আমাকে এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতেই হবে।

—আপনি তখন বললেন, ট্রেনে আগে দেখা হয়েছিল

—হ্যাঁ। আপনারা যখন কলকাতা থেকে আসছিলেন, আমিও সেই কামরায় ছিলাম। আমি ঐ মেয়েটিকে, বোধহয়, আপনার বোন, ওকে হঠাৎ কেঁদে উঠতে দেখেছিলাম

একটা সত্যি কথা বললে অনেক মিথ্যের পাপই। কথাটা বলতে পেরে আমি অনেকটা হালকা। আমি অনুরাধাকে আগে দেখেছিলাম, সেই জন্যই দ্বিতীয়বার। আমার যা পাবার ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী।

যেন পুরানো পরিচয় বেরিয়ে পড়ল, তাই আড়ষ্টতা অনেকখানি। জলের গেলাস হাতে মহিলা তখনো দাঁড়িয়ে। তিনি, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আপনি ওপরের বাঙ্কে ছিলেন। আপনার সঙ্গে আরও যেন কারা

—ওরা আমার কেউ নয়

জয়ন্ত এবার ঈষৎ হাস্তে, রঘু আপনার মাথায় এক ঘা ডাণ্ডা বসালেই হয়েছিল আর কি !

জয়ন্তর কাকা ঠোঁট থেকে গেলাস নামিয়ে, এক ব্যাটা চোর যে এখানে প্রায়ই আসে। মুর্গী চুরি করে

—আমাকে দেখে কি মুর্গীচোর

—হাঃ হাঃ হাঃ, না, না, তবে অন্ধকারের মধ্যে তো বোঝা যায় না

আরও একটু পরে জয়ন্ত, আমার দিকে তাকিয়ে, এখান থেকে আপনি কোথায় যাবেন ?

—জানি না

যেন আমি চির-পলাতক। এটা আমার ছদ্মবেশ। তবু মনে মনে আমি সেই রকমই। এক এক দিন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়

—কিসে যাবেন ?

—ট্রেনে। রাত্তিরে কখন ট্রেন আছে ?

জয়ন্তর কাকা ফতুয়ার পকেট থেকে গোল ঘড়ি বার ক'রে। অনেকদিন আমি এ-রকম ঘড়ি। কাকার বদলে ওঁর ঠাকুর্দা হওয়া উচিত ছিল।

—একটা তো রাত্তির সাড়ে আটটায়। আর মাত্র কুড়ি মিনিট পরেই ! অবশ্য এই ট্রেনটা প্রত্যেক দিনই লেট করে ! আর একটা ট্রেন রাত তিনটেয়

আমি তৎক্ষণাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে। আর বেশীক্ষণ এদের আতিথেয়তা।

—আমি সাড়ে আটটার ট্রেনেই যাবো।

—কেন, রাতটা থেকে যান এখানে। বাড়ির মধ্যে কেউ আসবে না। এখানে এখনও অতটা—হয় নি। নিরিবিলি জায়গা

—না, আমার পক্ষে রাত্রে যাওয়াই সুবিধে

—বসুন, কিছু খাবার-টাবার খেয়ে যাবেন। বললাম তো, ট্রেনটা লেট করে।

—এই তো চা মিষ্টি খেলাম।

—ভাত হয়ে গেছে বোধহয়।

—না, ক্ষমা করুন। আপনাদের যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো ! আমাকে যেতেই হবে।

—তপন দেড় মাস বাড়ি-ছাড়া ছিল। কখন কী যে খেয়েছে না খেয়েছে

—আমি জানি, তপন মরার সময় একটুও কষ্ট পায় নি। এক সেকেণ্ডেই

—রমুর খুব বন্ধু ছিল। ওর মনে এমন ধাক্কা লেগেছে

—আমি এখন যাই।

দরজার কাছে অনুরাধা। আগের কথাগুলো কি ও?

অনুরাধার হাতে খানিকটা তুলো ও একবাটি গরম জল। অন্য দু'জন অবাক চোখে। অনুরাধা আমাকে, আপনার পায়ের কাঁটাটা বেরিয়েছে?

আর কেউ মনে রাখে নি। শুধু অনুরাধাই।

—না, খানিকটা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেছে!

—কই দেখি? আমি বার করে দিচ্ছি।

আমি একেবারে আঁতকে। তা হয় কখনো? আমার পায়ে অন্য কারুর হাত।

—না, না, তার কিছু দরকার নেই। পরে আপনি আপনি বেরিয়ে আসবে।

অনুরাধা ততক্ষণে বসে পড়েছে মাটিতে। আমার দিকে চোখ তুলে দেখলো একবার। তারপর আবার মুখ নিচু করে, অনেকটা আপন মনে, গোলাপের কাঁটা আপনি আপনি বেরোয় না।

অন্য পুরুষ দু'জন একটু অস্বস্তিতে। ঠিক কী করা উচিত! তারপর জয়ন্তই উঠে এসে, দেখি, আমাকে দেখান তো, কোথায় কাঁটা ফুটেছে!

যাতে সেটা মিথ্যে না ভাবে, সেই জন্যই আমাকে সেটা তুলে। ঠিক মাঝখানে কাঁটার মুখটা।

জয়ন্তই সেটা তুলে দেবার চেষ্টা করার জন্য। তাকে বাধা দিয়ে অনুরাধা, তুমি সরো ছোড়দা, আমি তুলে দিচ্ছি।

—রমু, তুই ঠাণ্ডার মধ্যে মাটিতে বসলি কেন? এই টুলটা নে না

—কিছু হবে না। দেখি, আপনি ওই চেয়ারে বসুন।

এটা আমার প্রতি হুকুম। আমি তখনও দ্বিধাগ্রস্ত। জয়ন্তর কাকা তখন। বসুন না। কাঁটাটা তুলে ফেলাই ভালো। ভেতরে থাকলে নির্ঘাত ঘা হবে।

এবার আমাকে চেয়ারে বসতেই। আমার বাঁ পা থেকে চটি খুলে। অনুরাধা তার নরম নবনী-হাতে আমার বিশ্রী ধুলো মাখা পায়ের পাতা তুলে নেয়। খুব মনোযোগ দিয়ে। গরম তুলো ভিজিয়ে পায়ের তলাটা মুছতে মুছতে জানতে চায়, ব্যথা লাগছে?

এই যদি ব্যথা হয়। তবে সুখ কার নাম?

তবু আমি চোরের চেয়েও বেশী আড়ষ্ট মুখ করে। এবার সত্যিই আমি কিছু চুরি। এ তো আমার পাওনা নয়।

পরম যত্নে অনুরাধা আমার পা-টা রেখেছে ওর কোলে। তারপর মুখ ঝুঁকিয়ে

কাঁটাটা। আমি শুধু ওকে দেখতে এসেছিলাম। তার বদলে এই স্পর্শ। কী মসৃণ চিবুক, গভীর নদীর স্রোতের মতন কাঁধ, পিঠের ওপর লুটানো বর্ষার মেঘের মতন চুল। সম্পূর্ণ দৃশ্যটাই কি অলীক ? আমি কি সত্যিই এখানে ? এই ঘরে ?

কাঁটাটার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। অনুরাধার মুখ দেখলে মনে হয় ঐ কাঁটা যদি আজ সারা রাতেও না ওঠে, তা হ'লেও।

আমি আত্মা মানি না। তপন আচার্য কি একেবারেই হারিয়ে ? কোথাও কি তার আত্মা ? তপন, তুমি কি কোথাও আছো ? তাহলে এসো, দেখে যাও, এই সেবা। এই সেবা আমার জন্য নয়। তপনের কোনো বন্ধুর জন্য, আসলে তপনের জন্য। অনুরাধা যার পা থেকে কাঁটা তুলছে, সে ঠিক তোমারই মতন আর একজন, আমি নয়, আমি ছদ্মবেশী।

—এই যে উঠেছে !

অনুরাধার মুখে যে হাসি ফুটেছে, তার তুলনা কিসে ? ঐ ওষ্ঠের ঐ হাসিটুকু আমাকে চিরকালের জন্য দেবে ? আমি ছবির মতো বাঁধিয়ে।

ওর চোখে চোখ রেখে আমি নীরব প্রশ্ন, তুমি আমাকে ট্রেনে দেখেছিলে, চিনতে পারো নি ? মধ্যরাত্রে তুমি দরজা খুলে।

অনুরাধা নীরব চোখে উত্তর, হাঁ, পেরেছি।

—তখুনি আমি হাত বাড়িয়ে, দাও, কাঁটাটা আমাকে দাও।

সেটা হাতের তালুতে নিয়ে। বেশ ধারালো। একটা কাগজে মুড়ে সেটা বুক পকেটে।

উঠে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ফেলে, বাঃ একটুও ব্যথা নেই। দৌড়তে পারবো। আমি চলি

ওই রকম সেবা নেওয়ার পর আর বেশিক্ষণ থাকতে আরও লজ্জা। যদি ছদ্মবেশটা হঠাৎ। চিরপলাতক তো এক জায়গায় এতক্ষণ সময় কখনো।

অনুরাধা অবাক হয়ে, এক্ষুনি যাবেন ?

—হ্যাঁ, যেতেই হবে।

জয়ন্তর কাকা, যদি অবশ্য সাড়ে আটটার ট্রেন ধরতেই হয়

—হ্যাঁ যাই

—সামনের রাস্তা দিয়ে যাবেন ?

—যদি পেছনের দিক দিয়ে যাই ?

—তাহলে অবশ্য একটা মাঠ পেরুলেই বাজার পেয়ে যাবেন

দরজার কাছে গিয়ে আবার আমি দাঁড়িয়ে শুধু অনুরাধার দিকে। ওকে যে

কথাটা বলার জন্য এসেছিলাম। এই তো সেই মুহূর্ত। আমি অবিচল কণ্ঠে, আপনাদের একটা কথা জানা দরকার। আমি তপন আচার্যকে খুব ভালো করে চিনি। শেষ সময়েও তার খুব কাছাকাছি ছিলাম। মৃত্যুর আগেও সে একটুও ভয় পায় নি। একবারও ভেঙে পড়ে নি। সে ছিল বীর। তার পথটা ভুল বা ঠিক যাই হোক। সে ছিল খাঁটি আদর্শবাদী। সে মানুষের ভালো চেয়েছিল। তার জন্য সকলের গর্ব হওয়া উচিত। আমি যখনই তার কথা ভাবি···।

কথা শেষ হলো না, অনুরাধা এর মধ্যেই কান্নায়। শরীরটা কেঁপে কেঁপে। কী অসম্ভব কাতর কণ্ঠস্বর। তবু বোধহয় এর মধ্যে একটু আনন্দও। আমার এই সামান্য মিথ্যের জন্য যত পাপ হয় হোক। আর না। এবার যেতেই হবে, এক্ষুনি।

ওরা এলো আমাকে এগিয়ে দিতে। আবার ফুলবাগান পেরিয়ে। জোৎস্নার আদর খাচ্ছিলো বাগানটা। এবার আমি খুব সাবধানে প্রত্যেকটা গাছ বাঁচিয়ে।

গেটের কাছে এসে জয়ন্তর কাকা অন্ধকার মাঠের একদিকে হাতটা বাড়িয়ে।

—এই কোনাকুনি চলে যান

—আচ্ছা, চলি—

সত্যিকারের পলাতকের মতন আমি সঙ্গে সঙ্গে দৌড়োতে। অনুরাধার কণ্ঠস্বর আমাকে পেছন দিক থেকে ছুঁলো। সাবধান! সাবধানে যাবেন কিন্তু!

একটু বাদেই আমি অন্ধকারে ওদের চোখের আড়ালে। বেশ কয়েকবার আমি পেছন ফিরে ফিরে ওদের। বাঁশের গেটের কাছে তিনজন। আমি শুধু অনুরাধাকেই। একটু বাদে আর কিছুই।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে আমি একসময় আবার একা। এরপর যেন আমি অনবরত ছুটতে ছুটতে। আমি পলাতক। সে কখনো থাকে না। তাকে অন্ধকার মাঠ ঘাট ভেঙে অনবরত। মাঝখানের এই একটা ঘণ্টা কি স্বপ্ন? পকেট থেকে কাঁটাটা আবার। একটু আগে এই কাঁটাটা আমার শরীরের মধ্যে। কাঁটাটি তো সত্যি। ফুলের কাঁটা! কাঁটা আছে, ফুলও ছিল।

———